আবার যেখানে মানুষের মন জৈবিক ক্রিয়ায় বিশেষ রূপে আকৃষ্ট থাকে, মনের স্বতঃ ক্রিয়া—তাহার নিজ শক্তির বিকাশ হয় না—সেই খানেই মানুষ নিকৃষ্ট জীব।* তাহারা হয়ত Respiration, Digestion প্রভৃতি লইয়াই ব্যস্ত,—না হয় মনের নিম্ন-তর বৃত্তি গুলির দ্বারাই ক্রিয়াশীল। আরও এক কথা বলিয়াছি, সাধারণত মানব-শরীরে এত অধিক পরিমাণ গতি জড়ের সহিত অভিভূত থাকে যে, মনুষ্যশরীর উদ্ভিদে পরিণত হইলে তাহার শরীরায়তন বিশগুণ অপেক্ষা অধিক হইবে। অতএব মানুষে অত্যন্ত অধিক পরিমাণ গতি জড়ের সহিত মিলিত থাকে। যদি এই গতির অংশ অল্প হয়, জড়ের ভাগ অধিক হয়, তাহা হইলে সে লোকের ক্রিয়া শক্তি অল্প হইয়া যায়। জড়ত্বের বেশী আধিক্য হইলে, তাহার, "নিদ্রা, তন্দ্রা, ভয়, আলস্য, দীর্ঘ সূত্রতা প্রভৃতি দোষ হয়।† এই জন্য কোন ফরাসী নভেল-লেখক বলিয়াছেন—

"God lends the soul to the body it is true. But it is no less true that during the time the soul animates the body, there is a union between the two—an influence of one over the other—a supremacy of matter over mind, or mind over matter, according as for some purpose hidden from us. God permits either the body or the soul to be the ruling power." Dumas' Memoir of a Physician.

অতএব জগতের যেখানে যে পদার্থই আমরা প্রত্যক্ষ করি, তাহার মূলে এই তিনটী মূলতত্ত্ব আমরা দেখিতে পাই—সেগুলি, মন (বা Intelligence) গতি (Motion) এবং জড়। ইহার মধ্যে জড় ও গতিতে (এবং অল্প মাত্রা মনের দ্বারাও) ভৌতিক জগত, গতি ও মনে (এবং জড়ে) জৈবিক জগত। আর মন ও গতি ও জড়ে মানুষ হইতে সমস্ত জীবজগত সৃষ্টি হইয়াছে।*

অবশেষে আর একবার বলিয়া রাখি যে, মনই বল, আর গতিই বল, আর জড়ই বল, সকলের মূলেই শক্তি নিহিত আছে, সকলেই শক্তির বিকার মাত্র। এই শক্তিরই একরূপ পরিণামে মন, আর একরূপ পরিণামে গতি, এবং আর একরূপ পরিণামে জড় সৃষ্টি হইয়াছে। এই তিন শক্তিক্রিয়ার বিনাশ নাই, ইহারা অবিনশ্বর, কারণ, ইহা-

---

* এই স্থলে বলিয়া রাখি যে, আমরা আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শনের কথা অনুশীলন করিতে গিয়া প্রাচীন আর্য্যঋষিরা যে সত্য আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন, তাহাই প্রমাণ করিয়া ফেলিলাম। যে লোকের মন ক্রিয়া শক্তি ও জড়কে অভিভূত করিয়া স্বয়ং প্রকাশিত হয়, সেই সাত্ত্বিক লোক। যাহার মন, ক্রিয়া শক্তির সহিত, জৈবিক শক্তির সহিত একীভূত, সেই রাজসিক লোক। আর যাহার জড় ভাগ অধিক ক্রিয়া শক্তি অল্প এবং ইহার দ্বারা তাহার মন অপেক্ষাকৃত অভিভূত থাকে, সেই তামসিক লোক।

† "Wherever powers of the sort which can be named *vital* are at work, in the body, all doctors are agreed, the first condition of complete health is, that each organ perform its functions unconsciously, unheeded. * * The beginning of inquiry is disease."

Carlyle's Essay of Characteristics.

* এস্থলেও আমরা অজ্ঞাতসারে আর্য্যপণ্ডিতদিগের ত্রিগুণে আসিয়া পড়িলাম। সত্ত্ব গুণে মন, রজো গুণে গতি, আর তমো গুণে জড় (Inert matter) বুঝিতে হইবে। ইহার রজঃ ও তমো গুণে ভূত সৃষ্টি; রজঃ আধিক্য সত্ত্ব গুণে জৈবনিক সৃষ্টি, এবং সত্ত্বাধিক্য রজোগুণে মনুষ্য সৃষ্টি। একথা নবজীবনে দেখান যাইবে।

তের মূলে যে আদিশক্তি রহিয়াছে, তাহারও বিনাশ নাই, কারণ

"By indistructibility of matter (motion and mind†) we mean the persistence of force (by which they are caused) এবং by persistence of force we really mean the persistence of some Cause which transends our knowledge and conception."

H. Spencer.

শুধু তাহাই নহে, এই তিনটী শক্তির পরস্পর এরূপ সম্বন্ধ (Correlation) আছে যে, একটী আর একটীতে পরিণত হইতে পারে, কিন্তু এরূপ পরিণাম জ্ঞানের বিষয়ীভূত নহে। অথবা জড়, গতি ও মনের স্বতন্ত্র সত্তা আমরা প্রত্যক্ষ করি না, এই তিনেই মিশামিশি, তিনেই মাখামাখি। অতএব যে মূল আদিশক্তি হইতে এই তিন পরিণাম হইয়াছে, তাহার এই তিন বিভিন্ন বিকাশও আমরা বিভিন্নরূপে প্রত্যক্ষ করিতে পারি না। আমরা এই মূল আদি শক্তির স্বরূপ জানিব কি, তাহার প্রথম যে বিকাশ প্রত্যক্ষ হয়, তাহারও আমরা স্বরূপ বুঝি না। এই আদিশক্তি অনন্ত, অজ্ঞেয়, সর্ব্বব্যাপী, নিগুণ (Absolute) ইহা সমস্ত বিশ্বই ব্যাপিয়া রহিয়াছে। ইহাই ব্রহ্মের সৃষ্টি শক্তি বা প্রকৃতি। এমন জড়বাদী কে আছে, এমন নাস্তিক কে আছে—যে উন্নত বিজ্ঞানের সাহায্যে মুক্ত কণ্ঠে না বলিবে—"Without postulating Absolute Being—existence independent of the conditions of the process of knowing—we can frame no theory whatever, either of internal or of external phenomena." আবার দর্শন ও বিজ্ঞানের চরম সীমায় দাঁড়াইয়া কে না স্বীকার করিবে যে, "We find the continued existence of the Unknowable, as the necessary correlative of the knowable." H. Spencer, First Principles p 192d.

আমরা ক্ষুদ্র, সীমাবদ্ধ, বালুকণা সদৃশ মানুষ—আমরা সেই মূল আদিশক্তির অতি সামান্যতম বিকাশ—অতি ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গমাত্র—আমরা তাহার জড় তত্ত্ব কিরূপে বুঝিব?—

"We the whole species of Mankind and our whole existence and history are but a floating speck in the illimitable ocean of the All."

T. Carlyle.

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

হিন্দু-সমাজে জাতিভেদ।

মনু, পরাশর, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি শাস্ত্রকারগণ প্রত্যেকেই বিজ্ঞ সমাজ-সংস্কারক ছিলেন। কিন্তু সকল বিষয়ে সকলের মীমাংসার সামঞ্জস্য দেখা যায় না; বরং বিস্তর বিষয়ে মতভেদই দৃষ্ট হইয়া থাকে। পরাশর বিধবাগণের বিবাহের ব্যবস্থা করিলেন; কিন্তু মনু বলিলেন যে, স্ত্রী বিধবা হইলে কঠোর ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন করিবেন। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে আমরা অবশ্য এ কথা বলিতে পারি না যে, একের বিধি দোষযুক্ত, অপরের বিধি দোষশূন্য। যদি একের বিধি দোষযুক্ত হইবে, তবে দুই জন নহে, দশ জন নহে, সহস্র জন নহে, সমস্ত হিন্দু-সমাজ তাহা মান্য করিয়া চলিল

† মনঃশক্তি যে অবিনশ্বর, ইহা আপাতত নূতন বোধ হইতে পারে। কিন্তু বিজ্ঞানের ও দর্শনের অভ্রান্ত যুক্তি বলে আমরা দেখাইলাম যে, মনঃশক্তিকে কখনই বিনশ্বর বলা যায় না। ইহার অধিক বিশদ করিয়া বুঝাই, এরূপ স্থান নাই।

কেন? আর, অপরের বিধি যদি দোষ শূন্য, তবে তাহা তিরোহিত হইয়া তাহার স্থানে নূতন বিধি প্রচলিত হইল কেন? আমাদিগের বিবেচনায় সকল বিধিই দোষ শূন্য এবং সমাজের উপযোগী। কেবল প্রভেদ এই যে, ভিন্ন ভিন্ন সমাজ-সংস্কারকেরা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়া তদানীন্তন কালের সমাজের উপযোগী করিয়া ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। সমাজ একভাবে চিরকাল চলিতেছে না, ও চলিতে পারে না; সুতরাং অদ্য যে বিধি সমাজের উপযোগী, কল্য আর তাহা তদ্রূপ নাই। যখন লোক সংখ্যা অল্প, তখন বিবাহ বিশেষ প্রয়োজনীয়; কিন্তু লোকাধিক্য হইলে বিবাহ অবশ্য কর্ত্তব্য বলা যায় না। মনুষ্য-শরীরের ন্যায় সমাজ-শরীরও অনুদিন পরিবর্ত্তনের অধীন। অদ্য যে সমাজের বাল্যাবস্থা, কল্য তাহার যৌবনাবস্থা, পরশ্ব তাহার বার্দ্ধক্য। সমাজের যতই বয়ঃক্রম বৃদ্ধি হইতেছে, তাহার শরীরে ততই পরিবর্ত্তনের চিহ্ন লক্ষিত হইতেছে এবং এই পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার বিধি ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনও অবশ্য প্রয়োজনীয় বলিয়া প্রতীত হইতেছে। যুবার পক্ষে পান ভোজনের যে নিয়ম, বৃদ্ধের পক্ষে সে নিয়ম নহে—বৃদ্ধের পক্ষে যে নিয়ম, যুবা সে নিয়ম অনুসারে চলিতে পারে না। শক্তি অবস্থাগত; অবস্থা শক্তিগত নহে। যাহার যখন যে অবস্থা, সে তখন সেই অবস্থার উপযুক্ত শক্তিরই অধিকারী হইয়া থাকে; ভিন্ন অবস্থার শক্তি তাহাতে প্রকাশ পাইবার সম্ভাবনা কোথায়? বৃদ্ধের পরিপাক শক্তি অল্প, সে কখনই অধিক ভোজন করিয়া জীর্ণ করিতে পারে না। কিন্তু যদি বলপূর্ব্বক তাহার উদরে প্রচুর আহার প্রবিষ্ট করান যায়, তাহা হইলে অবশ্যই তাহার অজীর্ণ পীড়া উপস্থিত হইবে।

এই প্রকার বিশেষ বিশেষ সমাজের অবস্থার পক্ষে বিশেষ বিশেষ বিধিই প্রয়োজনীয়—এক বিধি সকল অবস্থাতেই প্রযুজ্য হইতে পারে না। সমাজের অবস্থার দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া যাঁহারা কোন অযোগ্য বিধি প্রচলিত করিতে বাসনা করেন, তাঁহাদিগকে ভ্রান্ত না বলিয়া আর কি বলিব? তাঁহাদিগের বাসনা কোন ক্রমেই সফল হইবার নহে—সমাজ অযোগ্য ব্যবস্থার চির বিরোধী। সমাজভুক্ত কোন কোন ব্যক্তি অনুপযোগী ব্যবস্থার বশবর্ত্তী হইয়া চলিবে সত্য, কিন্তু আপনার উন্নতির পথে কণ্টক নিক্ষেপ না করিয়া নহে। যদি এই সকল লোকের সংখ্যা অধিক হয়, তাহা হইলে উল্লঙ্ঘনকারীগণ প্রথমে ইহাদিগকে লুকাইয়া অনুপযোগী নিয়মের মস্তকে পদাঘাত করিবে, কিন্তু তাঁহাদিগের সংখ্যা অধিক হইলে আর তাঁহাদিগের কার্য্য প্রকাশ্যে সম্পাদন করিবার কোন বাধা থাকিবে না। আবার যাহাদিগের সাহস অধিক, তাহারা সকল অবস্থাতেই প্রকাশ্য ভাবে অযোগ্য বিধি পরিহার করিয়া আপনাদিগের জন্য নূতন উপযোগী বিধির ব্যবস্থা করিবে।

যেমন বিন্দু বিন্দু বারি লইয়া মহাসমুদ্র, তেমনই এক একটী মনুষ্য লইয়া সমাজ। যাহাতে সমাজের এক একটী মনুষ্যের উপকার, বা অপকার, তাহাতেই সমগ্র সমাজের উপকার, বা অপকার। যাহাতে ব্যক্তিবিশেষের উপকার সে তাহারই অনু-

সরণ করে এবং অধিকাংশ লোকে আপন আপন হিতানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া কোন কার্য্য করিবার ব্যবস্থা স্থাপন করিলে, তাহাই সামাজিক নিয়ম রূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই প্রকারে, সাধারণের পক্ষে আপনাদিগের ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়া লইতে অনেক সময় লাগে; কেন না এক কালেই কোন এক বিধিকে সকলে আপনার হিতকর বলিয়া বুঝিতে পারে না। লোক মধ্যে বুদ্ধির তারতম্য অনুসারে উন্নতির অগ্র পশ্চাৎ হইয়া থাকে। যাহারা অধিক বুদ্ধিমান, তাহারাই অগ্রে উন্নত হইয়া কোন বিধি বিশেষকে আপনার হিতকর বলিয়া বুঝিতে পারে, অপরে যতদিন না তাহাদিগের ন্যায় উন্নত হয়, ততদিন সে বিধির উপকারিতা বুঝিতে সক্ষম হয় না। যদি এই অনুন্নত ব্যক্তিদিগকে, উন্নত হইয়া, আপনাদিগের হিতকর বিধির ব্যবস্থা নিজেই করিয়া লইতে হয়, তাহা হইলে অনেক দিন পর্য্যন্ত তাহাদিগকে উন্নত ব্যক্তিদিগের পশ্চাতে পড়িয়া থাকিতে হয়, এবং ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় যেমন ভিন্ন ভিন্ন সময়ে উন্নত হইতে থাকে, সমাজকেও তেমনই ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে হয়। এমত অবস্থায় সমাজ একটী পূর্ণ রাশি না হইয়া একটী রাশির সহস্র ভগ্নাংশে পর্য্যবসিত হয়। এই ভগ্নাংশতা ও বিভিন্নতা নিবারণ করিয়া সমাজকে একটী অক্ষুণ্ণ রাশিতে পরিণত ও রক্ষিত করাই সমাজসংস্কারকের কার্য্য। যাঁহারা সাধারণ লোকমণ্ডলী অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান ও পরিণামদর্শী এবং জন সাধারণের ক্লেশে যাঁহারা ক্লিষ্ট, সাধারণের উন্নতি স্রোতের গতি লক্ষ্য করিয়া তাঁহারা এমন সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ করেন যে, উন্নতানুন্নত নির্ব্বিশেষে সকলেই সেই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া চলিতে পারে, এবং অনুন্নত ব্যক্তি সেই নিয়মের অধীন হইলেই উন্নত ব্যক্তির সহিত সমান ফলভোগে সক্ষম হয়। সমাজভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিরই যাহাতে উন্নতি, তাহাই সংস্কারকের আলোচ্য বিষয়। নতুবা ব্যক্তি বিশেষের বা শ্রেণী বিশেষের উন্নতিকে তাঁহার আলোচ্য বিষয় করিলে সমাজ শরীরের এক অঙ্গ পরিপুষ্ট হইবে ও অপর অঙ্গ শীর্ণ হইয়া অচিরে বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে। সমাজভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির মঙ্গল, সুতরাং সমগ্র সমাজেরই মঙ্গল তাঁহার লক্ষ্য হওয়া আবশ্যক— পক্ষাপক্ষ ভেদ করিলে সমাজ চলে না। সাম্যনীতি প্রবর্ত্তিত করিতে না পারিলে সমাজের মঙ্গল সাধন করিতে পারা যায় না।

সংসারে মনুষ্যের অবস্থা এমনই সুন্দর যে, প্রত্যেকেই স্বাধীন হইয়া অন্যের অধীন—ক্ষুদ্র মহতের অধীন, মহৎ ক্ষুদ্রের অধীন। সুতরাং সমাজে কোন বিভিন্নতা নাই, সমাজে মহৎ ক্ষুদ্র নাই, সমাজে ব্রাহ্মণ শূদ্র নাই। সমাজ মধ্যে সকলেরই প্রয়োজনীয়তা সমান, এক জনকে উচ্ছেদ করিয়া সমাজ চলে না। শূদ্র না থাকিলে ব্রাহ্মণ এক দিনও তিষ্ঠিতে পারে না, ব্রাহ্মণ না থাকিলে শূদ্রও বিলুপ্ত হইয়া যায়। সমাজের পক্ষে ব্রাহ্মণের ও শূদ্রের প্রয়োজনীয়তা সমান; সুতরাং সমাজে ক্ষুদ্রত্ব ও মহত্ত্ব নাই। যখন সমাজ শরীরের পুষ্টির জন্য সকল অঙ্গেরই প্রয়োজন, তখন আর ইতর বিশেষ কোথায়? যে সমাজে ইতর বিশেষ নাই, সেই সমাজই যথাযোগ্য পরিপুষ্ট, সবল ও উন্নত হইতে পারে। যথা পথে উন্নতির গতি পরিচালিত হইলেই

সমাজ নিরোগী হইয়া বহুকাল জীবিত থাকিতে পারে। সমাজ সংস্কারকেরা যদি সমাজের অবস্থার পরিবর্ত্তনোপযোগী প্রকৃষ্ট ব্যবস্থা দ্বারা তাহার গতি সৎপথে পরিচালিত করেন, তাহা হইলে সমাজ লয় পাইবে কেন, তাহা আমরা বুঝি না। সমাজের ধ্বংশ কেবল অনুপযোগী ব্যবস্থার দোষেই ঘটিয়া থাকে, অন্য কারণে নহে।

আর্য্যসমাজের যখন যে প্রকার পীড়া উপস্থিত হইয়াছে, মনু, পরাশরাদি সমাজসংস্কারকেরা কেবল তাহারই চিকিৎসা করিয়া সমাজকে সবল রাখিয়াছিলেন মাত্র। কিন্তু নরশরীর যেমন ব্যাধিমন্দির, সমাজশরীরও সেইরূপ। বর্ত্তমানকালে সমাজের আবার ব্যাধি উপস্থিত হইয়াছে। যে দিন হইতে ইউরোপীয় পশ্চিম বায়ু হিন্দু সমাজের গাত্র স্পর্শ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, সেই দিন হইতে এই পীড়ার আরম্ভ। এক্ষণে পীড়ার কোপ যোল আনা বলিতে হইবে—রোগীও ক্রমে বিকারগ্রস্ত হইতেছে। কিন্তু বড় আক্ষেপের বিষয় যে; উপযুক্ত চিকিৎসক মিলিতেছে না;—সংস্কারকেরা এক্ষণে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। কেহ কেহ পুরাতন বিধি আমূল ভাঙ্গিয়া তাহার স্থলে নূতন বিধি প্রবর্ত্তিত করিতে, অর্থাৎ সমাজশরীরকে নূতন করিয়া গড়িতে চাহেন; কেহ কেহ সমাজের গাত্রে একেবারেই হস্ত দিতে চাহেন না, অর্থাৎ তাঁহাদিগের অভিপ্রায় যে, পুরাতন বিধিই প্রচলিত থাকে; এবং অপরে, পুরাতনে নূতন মিশ্রিত করিয়া, বর্ত্তমান সমাজের অবস্থার উপযোগী করিয়া বাবস্থা প্রণয়ন করিতে চাহেন। আমরা এক্ষণে কাহার কথা শুনি? কুল ছাড়িলে কলঙ্কিনী হইতে হয়; কিন্তু আবার কুল রাখিতে গিয়া শ্যামকে হারাই। এমত অবস্থায় যে শ্যাম ও কুল উভয়ই বজায় করিতে পারে, তাহার বাক্যই শিরোধার্য্য হওয়া উচিৎ নহে কি? জাতিভেদ সম্বন্ধে কি প্রকারে উভয় পক্ষকে সামঞ্জস্য করা যাইতে পারে, একবার বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক।

আর্য্যসমাজ প্রথমে চারিভাগে বিভক্ত ছিল। আজও সেই প্রধান চারি ভাগ আছে সত্য; কিন্তু প্রত্যেক ভাগ আবার বিস্তর করিয়া উপবিভাগে বিভক্ত হইয়াছে। যদি সেই সকল উপবিভাগকে এক একটী শাখা বলিয়া গণনা করা যায়, তাহা হইলে সমাজ-বৃক্ষের শাখার সংখ্যা করা বড় সহজ কথা নহে—সমস্ত ভারতের ভিন্ন ভিন্ন দেশে যে কত ভিন্ন ভিন্ন শাখা দেখিতে পাওয়া যাইবে, তাহার স্থিরতা হয় না। এই সকল বিভাগ অবশ্য সমাজের প্রথম অবস্থায় ছিল না, ব্রহ্মার চারি অঙ্গ হইতে চারি বর্ণও সমাজের আদিম কালে নিশ্চয়ই উৎপন্ন হয় নাই। আদিম অবস্থায় অবশ্যই সমাজে জাতিভেদ ছিল না এবং থাকিতেও পারে না। ক্রমে যখন সমাজের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গকে একত্রিত করিয়া সমাজ শরীর সংগঠিত হইল, তখন হইতেই অঙ্গবিশেষের ক্ষমতা অনুসারে কার্য্য নিরূপিত হইল। জ্ঞান শিক্ষা, রীতি নীতি, আচার ব্যবহার, বল বীর্য্য প্রভৃতি যাহাতে যেমন দৃষ্ট হইল, তদনুসারে তাহার কার্য্যও নির্দ্ধারিত হইল। সকল সমাজেই বস্তুত চারি প্রকার কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। চারি ভাগে বিভক্ত না হইলেও সমাজে প্রধানত চারি প্রকার কার্য্যেরই আবশ্যক। যে সমাজে জাতি-

ভেদ অধিক স্পষ্ট নহে, তাহারও কার্য্য সকলকে বিশ্লেষ করিলে চারি শ্রেণীর কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। এক শ্রেণীর কার্য্য জ্ঞান ও শিক্ষাদান, দ্বিতীয় শ্রেণীর কার্য্য দেশ রক্ষা, তৃতীয় শ্রেণীর কার্য্য আহার সংগ্রহ এবং চতুর্থ শ্রেণীর কার্য্য উপরোক্ত তিন শ্রেণীর সেবা। ইউরোপীয় সমাজে বিশেষ বিশেষ বংশের উপর বিশেষ বিশেষ কার্য্যের ভার ন্যস্ত না হইলেও, সমগ্র সমাজ-সমষ্টির কার্য্য সকল এই চারি প্রকার বলিতে হইবে। ভারত সমাজে যাহা, ইউরোপীয় সমাজেও তাহাই। ভারতে কেবল বিশেষত্ব এই যে, বিশেষ বিশেষ বংশের উপর বিশেষ বিশেষ কার্য্যভার অর্পিত হইয়াছে। কোন বিশেষ কার্য্য বিশেষ বংশের উপর অর্পিত হওয়াতে যে কি সুফল, তাহা প্রায় সকলেই বিদিত আছেন। সন্তান জন্মাবধি পিতার কার্য্য দেখিয়া যত শিখিবে এবং সেই কার্য্যে দক্ষ হইবে, অল্প দিবস মাত্র বিদ্যালয়ে শিক্ষা করিয়া তাহাতে নিশ্চয়ই তত পটু হইবে না। পিতার চিন্তাপ্রণালী পর্য্যন্ত যখন সন্তান উত্তরাধিকার করে, তখন পিতার ব্যবসায় সন্তান যেমন শিখিবে, অন্যে কখনই তেমন শিখিবে না। সুতরাং আমাদিগের বিবেচনায় সমাজের কার্য্য সকল বংশ পরম্পরার উপর অর্পিত হওয়াতে সমাজের উৎকর্ষ ব্যতীত অপকর্ষ সাধিত হয় না। পরন্তু এক প্রকার কার্য্য এক শ্রেণীর লোকেরই অন্তর্নিবিষ্ট থাকা উচিত এবং ইহাতেই সমাজের মঙ্গল। এক প্রকার কার্য্য করিবার অধিকার যদি সকলকেই প্রদত্ত হয়, তাহা হইলে মহান অনিষ্টের সম্ভাবনা। সকলকে সমান অধিকার প্রদত্ত হইলে, যদি কোন সময়ে সকল লোকেই আহার সংগ্রহে নিযুক্ত হয়, তাহা হইলে তৎকালে সাধারণকে শিক্ষা দান বা দেশ রক্ষা বা পরিচর্য্যা করে কে?

সমাজ সংগঠনে সমাজ-ভুক্ত সকল লোককে সমান অধিকার দেওয়া যাইতে পারে না। সমান অধিকার পাইলেই কি সকলে সমান হইতে পারে? স্বীয় স্বীয় শিক্ষা ও শক্তি অনুসারে অবশ্যই পরস্পর পৃথক্ হইয়া পড়িবে; সুতরাং সমান অধিকার বিড়ম্বনা ও বিপর্য্যয়ের কারণ হইয়া দাঁড়াইবে। যাঁহারা সাম্যতন্ত্রীর দ্বারা সমাজ শরীরকে বাঁধিতে চাহেন, তাঁহাদিগের জানা কর্ত্তব্য যে, সকল লোকেই যাগ যজ্ঞ করিতে বসিলে দেশ রক্ষা, আহার সংগ্রহ ও পরিচর্য্যা করিবার লোক মিলিবে না; সুতরাং এক দিনও যাগ যজ্ঞ চলিবে না। তদ্ভিন্ন সকল লোকেরই স্বাভাবিক শক্তি ও শিক্ষা যে সমান হইবে,তাহা আশা করা যায় না; সুতরাং সকলকে সমান অধিকার দিলেও সকলে কখনই সমান হইতে পারিবে না। তবে যদি স্বাভাবিক শক্তি ও শিক্ষা অনুসারে সকলের জন্যই সকল দ্বার উন্মুক্ত থাকে, তাহা হইলে সমাজকে সাম্য মন্ত্রে দীক্ষিত করা না হইয়া যোগ্যতা সূত্রে গ্রথিত করা হয়। কিন্তু যোগ্যতা সূত্রে সমাজ বাঁধিতে হইলে "যোগ্যতার উন্নতি" (Survival of the Fittest) নিয়মে এক অংশ উন্নত হইবে ও অপরাংশ অবনত এবং অবশেষে বিনষ্ট হইবে। এক অংশ বিনষ্ট হইবে তাহার কারণ এই যে, তাহাকে হীনবল করিতে না পারিলে অন্য অংশ বলবান হইতে পারে না। জীবিত থাকিবার জন্য সংসারে ইতর

প্রাণীগণ যে প্রকার প্রতিনিয়ত জীবন সংগ্রামে নিরত, যোগ্যতা অনুসারে সমাজ সংগঠিত হইলে মনুষ্য মধ্যেও সেই প্রকার জীবন সংগ্রাম বাধিবে এবং একে অন্যকে ক্রমশ হীনবল ও অবশেষে বিনষ্ট করিয়া স্বয়ং বলবান ও উন্নত হইবে। হিন্দু-সমাজ এ প্রকার সংগ্রামের সমাজ নহে। এ প্রকার সংগ্রামের সমাজের মধ্যে ইংরাজ সমাজ অগ্রগণ্য। ইংরাজ সমাজ সংগ্রামের সমাজ বলিয়াই ইংলণ্ডের উন্নত ব্যক্তি অনুন্নত অবস্থা লইতে এতদূর উঠিয়াছে যে, তথা হইতে অনুন্নতকে দেখা যায় না। কিন্তু হিন্দু সমাজের দুই শ্রেণীর দুই জনের মধ্যে কখনই তাদৃশ পার্থক্য লক্ষিত হইবে না। সুতরাং হিন্দু সমাজকে সাম্যের সমাজ বলিব, না ইংরাজ সমাজকে সাম্যের সমাজ বলিব?

আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, সাম্যকে লক্ষ্য করিয়া সমাজ গঠন সম্ভব নহে। সাম্য দ্বারা সমাজ বাঁধিতে পারিলে, অর্থাৎ সমাজস্থ সকল লোকের অবস্থা সমান করিতে পারিলে সমাজ বড় সুখের হইতে পারিত, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু সে প্রকার গঠন সম্ভব নহে। তবে হিন্দু সমাজে যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সাম্য নীতি প্রবর্ত্তিত আছে, তাহা কাহারও অস্বীকার করিবার ক্ষমতা নাই। এই সাম্যের অর্থ এমন নহে যে, প্রত্যেকেই এক প্রকার কার্য্য করিবে ও সকলেই এক প্রকার সুখ-সৌকার্য্যের অধিকারী হইবে। ইহার অর্থ এই যে, ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোক ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য করিবে, কিন্তু এক শ্রেণী সবল হইয়া অপরকে নিধন করিবে না। সকলেই আপন আপন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া আপনার জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে এবং পরস্পর এমনই বন্ধনে আবদ্ধ থাকিবে যে, কাহারও অভাবে কাহারও সংসার চলিবে না। এই প্রকার সাম্যকে মূল মন্ত্র করিলে সমাজ যে সুন্দর ও সুশৃঙ্খলে চলিতে পারে, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

এই ভাবেই হিন্দু সমাজ আবহমানকাল চলিয়া আসিয়াছে। আমরা এমন বলি না যে, জাতিভেদ সম্বন্ধে কোন পরিবর্ত্তন একেবারে আবশ্যক হয় নাই। যখন যেমন আবশ্যক হইয়াছে, সূক্ষ্মদর্শী সমাজ সংস্কারকেরা তখন তেমনই বিধি প্রচলিত করিয়া রুগ্ন সমাজকে আবার সবল ও সতেজ করিয়া প্রবল প্রতাপের সহিত জীবিত রাখিয়াছেন। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের উপর ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের ভার অতি প্রাচীন কালেই ন্যস্ত হইয়াছে, এবং সেই সকল ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী আবহমান কাল সেই ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যই সম্পাদন করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু এক্ষণে আর হিন্দুসমাজে পূর্ব্ব রীতি সতেজ ও সজীব নাই—জাতিভেদ ও জাতিগত কার্য্যের বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে এবং হিন্দু সমাজ-বন্ধন এক্ষণে শিথিল হইয়া গিয়াছে। সমাজ নিয়তই পরিবর্ত্তনশীল, যুগে যুগে অবশ্যই ইহার শরীরে পরিবর্ত্তনের চিহ্ন লক্ষিত হইবে। বৈদিক সময়ে হিন্দু সমাজের যেমন অবস্থা ছিল, পৌরাণিক সময়ে তেমন ছিল না; পৌরাণিক সময়ে যে প্রকার অবস্থা ছিল তান্ত্রিক সময়ে সে প্রকার ছিল না। রামায়ণে সমাজের যে অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, মহাভারতে তাহার ব্যত্যয় দেখা যায়; বুদ্ধের সময়ের সমাজ চৈতন্যের সময়ে বিদ্যমান ছিল না। হিন্দু

রাজত্ব সময়ের অবস্থা মুসলমান সময়ে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; মুসলমান রাজত্ব সময়ের অবস্থা ইংরাজ শাসন সময়ে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। অধিক পশ্চাতে যাইতে হইবে কেন?—রামমোহন রায়ের সময়ে সমাজের যে অবস্থা ছিল, এক্ষণে সে অবস্থা নাই! জাতিভেদ প্রথা এক্ষণে ইংরাজী শিক্ষার ফলে বিলক্ষণ শিথিল হইয়াছে। ইংরাজী শিক্ষা স্বাধীনতার দোহাই দিতে গিয়া সমাজের পক্ষে বড়ই অনিষ্ট করিয়াছে—অসার ও কুশিক্ষা দিয়াছে। জাতিভেদ এক্ষণে হিন্দু সমাজে দোলায়মান—একের বৃত্তি অন্যে অবলম্বন করিয়া মহা গোলযোগ উপস্থিত করিয়াছে—সমাজে ঘোর পরিবর্ত্তন আনায়ন করিয়াছে।

শিক্ষার পরিবর্ত্তনে, ইংরাজী প্রথার অধিষ্ঠানে ও বিদেশীয় ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রভাবে এ প্রকার পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। তাহাতে আবার ইংরাজ, মুখে সাম্য ও স্বাধীনতার গান করিতে বড়ই পটু। আমরাও নিতান্ত অনুকরণপ্রিয়; স্বাই ইংরাজী প্রথার অনুকরণ করিতে গিয়া নিতান্ত বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি। ফলত ইংরাজী শিক্ষা, রীতি, নীতি, ব্যবসায়, বাণিজ্যাদি যখন হিন্দু সমাজে প্রবেশ করিল তখন অবশ্যই পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য—ইংরাজকে দেশ হইতে তাড়াইতে না পারিলে আর পরিবর্ত্তনের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার উপায় নাই। ইংরাজ ব্রাহ্মণকে স্থানচ্যুত করিয়া নিজে অধ্যাপকতা করিতে লাগিলেন—ব্রাহ্মণ উদরান্ন করিয়া খাইতে পায় না—কাজেই তাহাকে যে সে বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে বাধ্য হইতে হইল। ইংরাজ স্বয়ংই দেশ রক্ষক; সুতরাং শুদ্ধ যাহাদিগের ব্যবসায় ছিল, তাহাদিগের অনেককে অন্যান্য ব্যবসায় অবলম্বন করিতে হইল। ইংরাজ নিজে ব্যবসায় বাণিজ্য আরম্ভ করিলেন এবং ভূমিকর্ষণেও মনোযোগ দিলেন;—কৃষক ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায় আপন পাট তুলিয়া দিয়া অন্য কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া উদরান্ন করিয়া খাইবার জন্য লালায়িত হইল। নানা প্রকারে পরিচর্য্যা করা যাহাদিগের কার্য্য ছিল, ইংরাজ তাহাদিগের কার্য্যেও হস্তক্ষেপ করিয়া তাহাদিগের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইলেন; কাজে কাজেই তাহারাও দিগ্বিদিকে আহারান্বেষণে নিষ্ক্রান্ত হইল। ইহার উপর ইংরাজ বলিলেন—সকলেই সমান, যাহার যে বৃত্তি ইচ্ছা সে তাহাই অবলম্বন করিতে পারে। এই শিক্ষার গুণে, যাহার ব্যবসায় বা বৃত্তিতে ইংরাজ প্রতিযোগী হন নাই, কেও আপন ব্যবসায়কে নিকৃষ্ট বোধে তাহা ত্যাগ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহের অন্য পথ দেখিতে বাঞ্ছিত হইল—ইংরাজ কর্ত্তৃক যাহার বৃত্তি একেবারে বা কিয়দংশ নষ্ট হইয়াছে, তাহাকে ত বাধ্য হইয়াই পথান্তর দেখিতে হইয়াছে। ইংরাজের শিক্ষায় আমরা ভুলিলাম—তাহার সহিত প্রতিযোগিতায় হারিলাম—ইংরাজ রাজা বলিয়া রাজাজ্ঞা দ্বারা আপনার সুবিধা করিয়া আমাদিগকে সকল সুবিধায় বঞ্চিত করিলেন। এই প্রকার নানা কারণে হিন্দু সমাজে মহা গোলযোগ পড়িয়া গেল—হিন্দু সমাজ বিশৃঙ্খল ও বিপর্য্যস্ত হইল। মনু পরাশরাদি সমাজসংস্কারকদিগের বিধি ব্যবস্থা অতল অনন্ত সমুদ্রে ডুবিয়া গেল। তাঁহাদিগের গঠিত

সমাজের এরূপ অবস্থা ঘটিবে, ইহা তাঁহারা স্বপ্নেও ভাবেন নাই। বর্ত্তমান কালে সকলেই স্ব-স্ব প্রধান—কেহ কাহাকেও গুরু বলিয়া মানিতে চাহে না—রাজ-শাসন ব্যতীত সমাজ-শাসনের আর ক্ষমতা নাই। এ ঘোর দুর্দ্দিনে কে পথ প্রদর্শক হইবে এবং কে যে পতনোন্মুখ সমাজকে রক্ষা করিবে, তাহা জগদীশ্বরই জানেন—আমরা এ বিপদে কাণ্ডারী দেখি না।

হিন্দু সমাজে যখন বৃত্তিনাশ জনিত বিপর্য্যয় ঘটিল, তখন কাজে কাজেই জাতিভেদ প্রথা শিথিল হইয়া গেল। পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সকল বংশ বিশেষে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া এক্ষণে সাধারণ্যে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। ইংরাজের সহিত প্রতিযোগিতায় ও জাতীয় বৃত্তি নাশে হিন্দু-সমাজে কষ্টের আর অবধি নাই। সাধারণত প্রত্যহই লোকের দারিদ্র্য বৃদ্ধি হইতেছে। ইহার উপর লোক সংখ্যার দিন দিন বৃদ্ধি হওয়াতে এক জনের উপযুক্ত অন্ন বস্ত্রে বহুজনকে প্রতিপালিত হইতে হইতেছে। জাতি বিশেষে কার্য্য বিশেষ ন্যস্ত থাকাতে যে সুফল, তাহা এক্ষণে দৃষ্ট হয় না। জাতিভেদ প্রথা পুন প্রতিষ্ঠিত করিবার আর উপায় নাই। যাঁহারা রক্ষণশীল সমাজ-সংস্কারক, তাঁহারা বিস্তর শাস্ত্র অনুসন্ধান করিয়া জাতিভেদ প্রথা পুন প্রচলিত করিতে প্রয়াস পাইতেছেন; কিন্তু যুক্তির সহিত কিছুই করিতে পারিতেছেন না; সুতরাং ফলও কিছুই হইতেছে না। আমাদিগের বিবেচনায়, পূর্ব্ব প্রচলিত রীতি নীতি আর পুন প্রতিষ্ঠিত হইবার নহে—সমাজ নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল; পূর্ব্বভাবে এক্ষণে ইহাকে পরিচালিত করিবার চেষ্টা, ভস্মে ঘৃতাহুতি বলিয়া বোধ হয়। ইংরাজ সমাজের অনুকরণে হিন্দু সমাজকে সংগঠিত করিলেও মঙ্গল নাই। কি রক্ষণশীল, কি পরিবর্ত্তনশীল, উভয় পক্ষের কোন সমাজ-সংস্কারই পতনোন্মুখ হিন্দু সমাজকে রক্ষা করিতে পারিবে না—আংশিক রক্ষণ ও আংশিক পরিবর্ত্তনশীল সম্প্রদায় যদি কিছু করিতে পারেন তবেই মঙ্গল; নতুবা হিন্দু সমাজ কালের অতল গর্ভে ডুবিল—জগতের ইতিহাসের পৃষ্ঠাঙ্ক ভস্মীভূত হইল।

শ্রীসিদ্ধেশ্বর রায়।

শূন্য কুটীর।

১

পথিক ফিরিয়া যায়,
কেহ নাহি ডাকি লয়,
উদাস লইয়া বুকে, চাহি কেন ও কুটীর!
উড়িল কি প্রাণ তোর, শুধু পড়ি ও শরীর?

২

কে আজি আদর করে,
কে আর যতনে ধরে!
ধীরি ধীরি পাতাগুলি বাতাসে উড়িয়া যায়,
ওই যে একটী পাখী, তৃণ মুখে শূন্যে ধায়!

৩

কদিন বাঁচিয়া রবে,
বুঝি প্রাণ যাবে যাবে!
ভাঙ্গা বুক ভাঙ্গা প্রাণে পড়ি আছ ভবপারে;
লওনা নির্ব্বাণ পর, অনন্ত কাল সাগরে?

৪

খেলিলে ভবের খেলা,
সহিলে শোকের জ্বালা,
উড়ি গেল প্রিয় জন,একে একে সব তারা !
যে প্রাণ হেথায় ছিল,কোন্ পথে গেল তারা !

৫

একটুও মায়া নাই জীবের অন্তরে ?
তারা এবে কত দূরে,
তুমি ভাস পারাবারে,
জাগে কি সে পূর্ব্ব কথা পাষাণ অন্তরে ?
আনন্দ বাজার তোর,কে ঢাকিল এ আঁধারে !

৬

শূন্য বুকে নেহারিয়া, কি ভাবিছ পথ পানে,
প্রাণের বিহঙ্গ আর ফিরিবে না ও উদ্যানে !
উদাসে ডুবিয়া রই,
জড়-মায়া কাঁদে ওই ;
কে আর কাঁদিবে হেথা,মিলিয়া কুটীর সনে,
দেখিয়া মায়ার দশা কে যেন কাঁদে এ প্রাণে।

৭

ও কুটীর, আয়, আয় !
আমিও যে তোর প্রায় ;
একেলা বহিয়া যাই, জনহীন একান্তরে !
তুই আর আমি মাত্র, একাপড়ি ভবপারে !

শ্রীচন্দ্রকান্ত সেন।

একাকিত্ব।

একাকিত্ব সাধন, সকল সাধনার মূল সাধনা। বহুজনাকীর্ণ সংসারকে না ভুলিতে পারিলে,—সংসারের মন-মুগ্ধকর মায়া মোহের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি না পাইলে—যশ নিন্দাকে তুচ্ছ করিতে না পারিলে, ধর্ম্ম সাধনই বল, আর যাহাই বল, সকলই অসম্ভব। আমি যদি চতুর্প্রহর তোমার সৌন্দর্য্য দেখিতে বা তোমার মুখের প্রশংসা শুনিতেই নিমগ্ন রহিলাম, তবে আর আমার কর্ত্তব্য পালন হইবে কি প্রকারে ?—আমি যদি সর্ব্বক্ষণ তোমার ভাবেই বিভোর রহিলাম, তবে আর পরমার্থ চিন্তা করি কখন ?—আমি যদি তোমার চিন্তার খনিতে নিমগ্ন হইয়া আত্ম-হারা হইয়াই চিরকাল থাকিব, তবে আর আপন চিন্তার উৎকর্ষ সাধিত হইবে কিরূপে ? কিন্তু মানুষ সংসারে একাকী থাকিতে চায় না। মানুষ, মানুষে ডুবিয়া আত্মবিস্মৃত হইবার জন্যই লালায়িত। মানুষ, মানুষের প্রশংসার জন্যই ব্যতিব্যস্ত। ইহাতে যে মানুষের কোনই উপকার হয় না, তাহা নহে। পৃথিবীতে আজ কাল কত অসংখ্য দল দেখা যাইতেছে। খ্রীষ্টের দল, মহম্মদের দল, নানকের দল, গৌরাঙ্গের দল, বুদ্ধের দল, হাজার হাজার দল এই সোণার সংসারকে দগ্ধ করিতেছে। মানুষ, মানুষের অস্তিত্বে আপনাকে ডুবাইয়া সুখী হইতেছে ; তাই স্পেন্সরের দল,ডারউইনের দল, মিলের দল, কম্‌টীর দল। মানুষ, অন্যের প্রতিভার আদর করিতে যাইয়া আত্মবিস্মৃত হইয়া যাইতেছে। স্বাধীন চিন্তার আদর নাই, ব্যক্তিত্বের সম্মান নাই। অন্যের মহত্ত্ব দেখা ভাল কার্য্য, কিন্তু আপনাকে ভুলিয়া যাওয়া তদপেক্ষা মন্দ। পৃথিবীর আদি সময় হইতে এ পর্য্যন্ত পৃথকত্ব বা একাকিত্ব সাধনা অতি অল্প লোকেরই হইয়াছে, তাই পৃথিবীতে এত দলের সৃষ্টি। দলের সৃষ্টি হওয়াতে, লোকেরা দশজনের মহত্বে মুগ্ধ হইয়া, আর দশজনকে উপেক্ষা করিতে

শিখিয়াছে,—আর দশজনের মহত্ত্ব গ্রহণে অক্ষম হইয়াছে। এই কারণে জ্ঞান বা প্রেম উভয়ই মানব হৃদয়ে সঙ্কীর্ণতা লাভ করিতেছে;—উদারতা বা প্রশস্ততা মানব হৃদয়কে পরিত্যাগ করিতেছে। দলাদলি পৃথিবীর মহা অনিষ্ট সাধন করিতেছে।

দলাদলিতে যে পৃথিবীর মহা অনিষ্ট করিয়াছে, ইহা মানব সন্তানেরা বুঝিতে পারিয়াছে, কিন্তু তবুও আবার দলের জন্ম লালায়িত হইতেছে। এইরূপে অসংখ্য অসংখ্য লোক প্রাচীন দলের মমতা ছিঁড়িয়া আবার নূতন দলের সৃষ্টি করিতেছে। ক্রমাগতই দলের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। তাহার সহিত হিংসা বিদ্বেষ, পরনিন্দা বা ঘৃণার রাজত্বও বিস্তৃতি পাইতেছে। মানুষ, মানুষের মহত্ত্ব দেখিবার জন্য সমাজভুক্ত, কিন্তু আজ মানুষ, কেবল মানুষের দোষই দেখিতেছে। এ রোগের প্রতিকার কিরূপে হইবে, সামান্য বুদ্ধিতে বুঝিতে পারিতেছি না।

মানুষ, মানুষের মহত্ত্ব গ্রহণ করিতে আসিয়াছে, কিন্তু আপনার স্বাতন্ত্র্য ডুবাইতে আইসে নাই। পরস্পরের দ্বারা সকলেই উপকৃত হইব বটে, কিন্তু হইব যে আমি, সে আমি পৃথক। মাতার জরায়ু-গর্ভে মাতার শোণিতে আমার সৃষ্টি, কিন্তু মাতা ও আমি পৃথক। পৃথকত্ব যদি সৃষ্টির বিধান না হইত, তবে সকলই একাকার হইয়া যাইত। আকাশে চন্দ্রসূর্য্য নক্ষত্র থাকিত না, বাগানে ফুল ফল থাকিত না, সমুদ্রে তরঙ্গ থাকিত না, নর নারীতে বিভিন্নতা থাকিত না। তুমি ও আমি এক রূপে হইয়া আসিতাম। অসংখ্য ঘুচিয়া এক অখণ্ড জিনিস থাকিত। বৈচিত্র্য ঘুচিয়া মিলন ঘটিত। অনাম্য বা বিভিন্নতা ঘুচিয়া সাম্য বা একরূপত্ব থাকিত। কিন্তু সৃষ্টি-তত্ত্বে কি দেখিতে পাইতেছি? এক পাঠশালায়, এক শিক্ষার অধীন থাকিয়াও কত বিভিন্ন হইতেছি,—তুমি ও আমি। বালক বালিকায় কত বৈষম্য, বালকে বালকে কত পার্থক্য, বালিকায় বালিকায় কত বিভিন্নতা! ছুটী হৃদয় একরূপ নয়, ছুটী মন একরূপ নয়, ছুটী জীবন একরূপ নয়,—ছুটী ফুল একরূপ নয়, ছুটী ফল একরূপ নয়। সকলই পৃথক, সকলই বিভিন্ন। দেখিব, পাইব, এই জন্ত প্রকৃতি সৃষ্ট, কিন্তু কাহাতেও ডুবিয়া মরিব না;—আত্মবিস্মৃত হইব না। ভারি কঠোর সাধনা। তোমার ভালভাব গ্রহণ করিব বলিয়া তোমার মন্দ ভাবে আমার বিশেষত্বকে ডুবাইব কেন? তোমাকে ভালবাসি বলিয়া তোমার সহিত একাত্মক হইয়া যাইব কেন? কবির কল্পনা দূরে রাখ, তোমার কর্ত্তব্য ও আমার কর্ত্তব্য যে পৃথক,—তুমি ও আমি যে পৃথক হইয়াছি, সে কি এই জন্ত নয় যে, উভয়েরই দুই মহৎ কার্য্য সাধন করিতে হইবে? তবে ডুবাডুবি করিতে, দলাদলি বাঁধিবার জন্ত লালায়িত হইতেছ কেন? সকল ভাঙ্গিয়া চুরিয়া সকলে পৃথক পৃথক হইয়া পড়, সকল প্রকার ভেদাভেদ ভুলিয়া সকলের মহত্ত্ব গ্রহণ করিয়া, একাকিত্ব সাধন করিতেপ্রবৃত্ত হও। হিন্দু কেবল হিন্দুর গুণকীর্ত্তনে রত থাকিবে, খ্রীষ্টানের গুণকীর্ত্তনের দিকে ফিরিয়াও চাহিবে না? মুসলমান কেবল মুসলমানের গুণ গ্রহণে মাতিবে, কাফেরদিগের দিকে ফিরিয়াও চাহিবে না? কি ঘৃণার কথা, কি দুঃখের চিত্র! সকল দল ভাঙ্গিয়া সকল পৃথক পৃথক হউক,—সকলে সকলের

ত্ব গ্রহণ করুক, সকলে সকলের বিশেষ বিশেষ মহত্ব গ্রহণ করিয়া মনুষ্যত্ব লাভে রত থাকুক। কিন্তু হায়, তাহা কি সহজে হইতে পারে? ব্যক্তিত্ব সাধন সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। বহু জনের ঘৃণা, বহু জনের নিন্দা, বহু জনের তিরস্কারকে আলিঙ্গন করিতে পারিলে, তবে ত একাকিত্ব সাধনে জয়ী হওয়া যায়! কত জনের ভালবাসা ছিন্ন করিতে হয়, তবে ত একাকী হওয়া যায়! কত জনের প্রশংসাকে তুচ্ছ করিতে হয়, তবে ত একাকী থাকা যায়। সকলের উপরে কত জনের সাহায্য উপেক্ষা করিতে হয়, তবে ত একাকিত্ব বা ব্যক্তিত্ব সাধনে জয়লাভ করা যায়। পৃথিবীর অবস্থা এমনই জঘন্য হইয়া উঠিয়াছে যে, মানুষ মানুষকে ভালবাসায় দাস করিতে না পারিলে মানুষের কোন প্রকার সাহায্য করিতে চায়না। গোলামগিরি চতুর্দ্দিকে চলিতেছে—দাস ব্যবসায় সর্ব্বত্র আধিপত্য করিতেছে। এমনই জঘন্য অবস্থা হইয়া উঠিয়াছে, দাসত্বই যেন সকলের সেব্য হইয়া পড়িয়াছে। পৃথক হইয়া দেখিয়াছি, দল ছাড়িয়া দেখিয়াছি, চতুর্দ্দিকের লোক অমনিই দয়ার হস্ত গুটাইয়া লইয়াছে, অমনিই চতুর্দ্দিকের সাহায্য বন্ধ করিয়া দিয়াছে। সকল দল সম্বন্ধেই এ কথা বলিতেছি। দাস করিবার জন্য কে ইচ্ছুক নয়? যে স্বাধীনতার ধুয়া ধরিয়া বাহিরে চিৎকার করিতেছে, সেও ভিতরে ভিতরে দাসদাসী অন্বেষণে ব্যস্ত। চাকরিকরাকে কেবল দাসত্ব বলা যায়না;—সে দাসত্ব বরং ভাল মতের দাসত্ব, ভালবাসার দাসত্ব বড় ভয়ানক জিনিস। মতের দাসত্ব-ব্যবসা চতুর্দ্দিক কি ভয়ানক আধিপত্য করিতেছে, একবার দেখ। তুমি আমার মতে যখনই সায় না দেও, তখনই আমি তোমার উপর চটিয়া যাই। গুরু শিষ্যে এই প্রকার কত কাটাকাটি চলিতেছে। দলে দলে মতের মিল না হওয়ায় কত রক্তারক্তি হইতেছে। তোমার মতে না সায় দিলে আর তুমি আমার সাহায্য করিতে চাও না। পৃথিবীর প্রচলিত মতে সায় না দিলে, অমনি পৃথিবীর দয়ার কুটীরে চাবি পড়িয়া যায়। খ্রীষ্ট যখন সকলের মত রক্ষার জন্য আপনার মতকে বলিদান করিতে অস্বীকার করিলেন, তখন পৃথিবীর লোকেরা খ্রীষ্টের বুকে পেরেক বিদ্ধ করিল! এবং সেই হইতে যে জন আপন পথে, আপন মত লইয়া একাকি সাধন করিতে গিয়াছে, সেই প্রাণে মরিয়াছে! কত সহস্র সহস্র খ্রীষ্টের রক্ত পৃথিবীকে প্লাবিত করিতেছে, কে তাহার গণনা করিতে পারে? এমনই জঘন্য অবস্থা এই পৃথিবীর। এই জন্যই বলিতেছিলাম, আর সকল সাধনা সহজ, একাকিত্ব সাধনই কঠিন। ধনলোলুপ দস্যুর হস্ত হইতে ধনের বাক্স রক্ষা করা সহজ, রক্তপিপাসু ব্যাঘ্রের হাত এড়াইয়া জীবন রক্ষা করা সহজ, কিন্তু দাসত্ব লালায়িত পৃথিবীর মতকে উপেক্ষা করিয়া বসবাস করা বড়ই কঠিন। গ্যালিলিও কত উপহাস ও যন্ত্রণা সহ্য করিয়া দেহ ত্যাগ করিলেন, কে না জানে? তবেই দেখ, কত শেলাঘাত, কত নির্যাতন সহ্য করিতে পারিলে তবে একাকিত্ব সাধন হয়! কত জনের মুখশ্রী ভুলিতে পারিলে তবে একাকী হওয়া যায়;—কত দাসত্ব, কত ভালবাসাকে, কত সাহায্যকে উপেক্ষা করিলে, এমন কি প্রাণ-মমতা পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে পারিলে তবে একাকী হওয়া যায়! এ কঠোর সাধনায় জয়ী হইতে কে পারে? কিন্তু জয়ী হইতে না পারিলেও নিস্তার নাই,—

পৃথিবীতে স্বর্গের আশা নাই, মনুষ্যত্ব বা দেবত্ব লাভের সম্ভাবনা নাই। ধ্রুবই হউন, আর প্রহ্লাদই হউন, খ্রীষ্টই হউন; আর শাক্যই হউন, একাকীর বিজন পথে না যাইলে আর সিদ্ধি লাভের সম্ভাবনা নাই। সংসারে ভীষণ গহন অরণ্য সৃষ্টি করিয়া কঠোর তপস্যা না করিলে আর মঙ্গলের আশা নাই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাজিয়া যাইতেছে, দিবসের পরে দিবসের অভিনয় শেষ হইয়া যাইতেছে,—একাকীর পথ মানুষের সম্মুখে আসিতেছে! যে একাকী আসিয়াছে, সে কি চিরকালই কোলাহলে মজিয়া, বহুত্বে ডুবিয়া রহিবে? মানুষের ধর্ম্ম কর্ম্ম কি সকলই ভস্মে ঘৃত নিক্ষেপের ন্যায় চিরকাল ব্যর্থ হইতে থাকিবে? না—প্রকৃতির বিধান তাহা নহে। মানুষ কি চিরকালই দলাদলির মায়ায় মুগ্ধ হইয়া বিশ্বেশ্বরের বিশ্বপ্রেম ভুলিয়া থাকিবে? তাহা অসম্ভব। একাকী যে আসিয়াছে, একাকী যাইবার জন্য তাহাকে প্রস্তুত হইতেই হইবে। দিন যাইতেছে, রজনী আসিতেছে। রজনী আসিতেছে,—সকলকে ভুলাইতে; সকলকে বিস্মৃতিতে ডুবাইতে। সমস্ত দিবস কলরব, ব্যস্ততা, জনতা; রজনীতে নিস্তব্ধ, নীরব, ও সাম্যভাব। গভীর রজনীতে কলরব প্রিয় পাখী জাগিয়া যখন তান ধরে, তখন সে তানে সংসারের ভাব নাই, তাহাতে পরমার্থ ভাব। গভীর রাত্রে যখন মানুষ নিদ্রা হইতে জাগরিত হয়, তখন কি এক আশ্চর্য্য ভাব মনে জাগিয়া উঠে! চতুর্দ্দিক নীরব, সকল নিস্তব্ধ—যেন কেহই নাই, যেন কিছুই নাই;—একাকী সে জাগিতেছে! একাকী সে জনপ্রাণী হীন অন্ধকারে ভাসিতেছে! একাকী গম্ভীর ভাবে দাঁড়াইয়া, তখন সে যে কি বৈচিত্র্যময়ী সাম্য পৃথিবীকে গ্রাস করিতেছে দেখিতে পায়, তাহা ব্যক্ত করা যায় না। অবিশ্বাসী সে নীরবে, সে নিস্তব্ধতায় দাঁড়াইয়া অন্তত মুহূর্ত্তের জন্য বিশ্বাসী হয়, মুহূর্ত্তের জন্য ঘৃণা বিদ্বেষ ভুলিয়া যায়। কিন্তু রজনীর পরে আবার দিবস জাগিয়া উঠিতেছে যখন, তখন সকল ভাব আবার নিবিতেছে। একাকিত্ব ভুলিয়া মানুষ আবার বহুত্বের আদর করিতেছে। কিন্তু মহারাত্রি বা কালরাত্রির কথা মানুষ তখনও জানিতে পারিতেছে না। জানুক বা না জানুক, বিধাতার লিপিতে মানুষের ভাগ্যে এক অখণ্ড বিধান লিখিত আছে, তাহার হাত আর এড়াইবার যো নাই! মহারাত্রি যখন আসিবে, যখন মানুষের সকল ভেদাভেদ ঘুচিয়া যাইবে—সোনার অঙ্গ শ্মশানে ভস্ম হইবে—সকল নির্ব্বাণ হইয়া যাইবে, তখন স্বর্গ লাভ বা বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি হইবে। সে বিধান যে মানুষের এড়াবের যো নাই, সে মানুষ কেন জীবন থাকিতে একাকিত্ব সাধন করিবে না? একরূপ, একভাব, এক জ্ঞান, এক ধ্যানে নিমগ্ন হইতে না পারিলে মহেশ্বরের লীলায় কে মজিতে পারে? সংসার মায়া, অবিদ্যার খেলা ভুলিতে না পারিলে কে মহামায়াকে বুঝিতে পারে? সকলের ভিতরেই একরূপ, একভাব, এবং জ্ঞান, এক শক্তির ক্রীড়া যে না দেখিতে পায়, সে কেমনে দ্বেষ হিংসার দাসত্বের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবে? বিশ্বপ্রেম না বুঝিলে, মানুষ কেমনে অন্ধ প্রেম ভুলিবে? এই জন্যই বলিতেছিলাম, এ সাধন অতি কঠোর সাধন। কিন্তু হউক কঠোর, এ সাধনায় জয়ী হইতে না পারিলে আর কিছুতেই কিছু হইবে না। ফুল না

ছাড়িলে অকূলে ভাসিতে পারিব না, দল না ছিঁড়িলে, দলাদলি-শূন্য উদার বিশ্বপ্রেমসাগরে মজিতে পারিব না, সংসার মমতার জাল না ছিঁড়িতে পারিলে স্বর্গবাসের অধিকারী হইতে পারিব না;—মানুষের মমতার জাল ছিন্ন না হইলে মুক্তি বা ঈশ্বর লাভ হইবে না। কিন্তু মানুষের কি সাধ্য যে এই অসাধ্য সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিবে?—যাঁহারা ঈশ্বরের কৃপায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই পলায়ন করিয়াছেন। সে বুদ্ধও নাই, আর সে খ্রীষ্টও নাই। আজ মানুষ দলাদলির আগুনে পুড়িয়া মরিতেছে। সংসার মায়া বিষম মায়া; এ মায়াকে ছিন্ন করিতে না পারিলে, এ সাধনায় জয় লাভের সম্ভাবনা নাই। ক্রুশ-কাষ্ঠকে আলিঙ্গন করিবার জন্য যে প্রস্তুত থাকিতে না পারে, তাহার পক্ষে এ সাধনায় জয়ের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু ভগবানের কৃপা ভিন্ন কে মৃত্যুর কঠোর হস্তে পড়িয়াও প্রসন্নতাময় শান্তি-স্বপ্নে মাতিতে পারে,—বিষকে সুধা বলিয়া ধরিতে পারে, কষ্ট দুঃখকে সুখ বলিয়া বুঝিতে পারে? কিন্তু ভগবানের কৃপা ভিন্ন, কে অসারের ভিতরে সারকে ধরিতে পারে,—প্রলোভনকে প্রলোভন বলিয়া বুঝিতে পারে,—সংসারসুখকে অসুখের হেতু জানিয়া তৃণের ন্যায় উপেক্ষা করিতে পারে? কৃপাময়ের কৃপায় সাধনা কর, তবেই একাকিত্বে সুখ পাইবে; এক রূপে, এক ধ্যানে মত্ত হও, তবেই সকল অসম্ভব সম্ভব হইবে। তবেই দলাদলি বা ঘৃণা বিদ্বেষের হাত হইতে রক্ষা পাইবে। করুণাময় এই কঠোর সাধনায় আমাদিগের সহায় হউন।

ইন্দুবালা।

নবম পরিচ্ছেদ।

আমাদিগকে আবার ইন্দুবালার উদ্দেশ লইতে হইবে। সূর্য্য অস্ত গিয়াছে কেবল, ধরাতল স্নিগ্ধ ভাব ধারণ করিয়াছে। যমুনা নদী তর তর করিয়া বহিয়া যাইতেছে। অতি নির্জ্জন, নিস্তব্ধ, প্রশস্ত ক্ষেত্র সম্মুখে—প্রাবৃট-সম্ভূত নব দূর্ব্বাদল শ্যামল মনোহর রূপ ধারণ করিয়াছে—মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র পরিষ্কার গৃহ —বোধ হয় কৃষকদিগের আবাসস্থান। ক্ষুদ্র গিরিশ্রেণী অনতিদূরে, আরও দূরে উন্নত গিরিরাজি বিশাল আকাশে মেঘরাশির ন্যায় চিত্রিত হইয়া রহিয়াছে। এই স্থলে একটী কোমলাঙ্গী অষ্টাদশ বর্ষীয়া ধীরে ধীরে ভ্রমণ করিতেছেন। তাহার সঙ্গে তাহার ভ্রাতা, উভয়ে গল্প করিতে করিতে নদীর তীর ছাড়িয়া অনেক দূর আসিয়া পড়িলেন। পশ্চিমদিকের আকাশে একখানা মেঘ দেখা দিল। তাঁহারা ফিরিলেন, দেখিতে দেখিতে অর্দ্ধেক আকাশ ছাইয়া পড়িল। নির্ম্মল বড় ব্যস্ত হইলেন, বলিলেন, ইন্দু বৃষ্টি হইতে পারে, শীঘ্র করিয়া কোন স্থানে আশ্রয় লওয়া আবশ্যক। তাঁহারা একটু অপেক্ষাকৃত বেগে চলিতে লাগিলেন। অল্প কাল মধ্যেই বড়ই অন্ধকার হইয়া শীতল বাতাস উঠিল, এখনি বৃষ্টি আসিবে বুঝা যাইল। নির্ম্মল বড়ই উদ্বিগ্ন হইলেন, বলিলেন, "ইন্দু, একটু বেগে চল,

জল বুঝি আসিল, এত দূর আসা বড় ভুল হইয়াছে, তোমার অসুখ করে এই আমার ভয়।” যাইতে যাইতে ঘোরতর অন্ধকার দিগন্ত সংস্থিত হইল। এদিকে অন্ধকারে নির্ম্মলের পথভুল হইল। গ্রামের দিকে না চলিয়া তাহার বিপরীত দিকে চলিতে লাগিলেন। বৃষ্টি পড়িতে লাগিল—প্রথমে বড় বড় দুই এক ফোঁটা, তারপর মুষল ধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। অন্ধকারময় আকাশে মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ চমকিতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক মেঘ গর্জ্জন আরম্ভ হইল—তাহা দূরে গিরিশৃঙ্গে প্রতিধ্বনিত হইয়া আরও ভয়ানক বোধ হইতে লাগিল। দুই জনের মস্তকের জল মুখ বহিয়া বক্ষস্থলে প্রবহমান হইতে লাগিল। রোগের শয্যা হইতে নবোত্থিতা ইন্দু কিয়দ্দূর চলিয়া বলিলেন—“দাদা,আমার পা যে আর চলিতেছে না।” নির্ম্মল বলিলেন “তুমি আমার কাঁধে হাত দেও, কাঁধে ভর দিয়া চলিতে পারিবে।” ইন্দু তাহাই করিলেন,কিন্তু তাহার শরীর ক্রমে অবসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল। নির্ম্মল তাহার ভগ্নীকে ধরিয়া সুতরাং ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলেন। কিন্তু ক্ষীণাঙ্গী ইন্দু কিছুক্ষন পরে একবারেই চলিতে অক্ষম হইলেন,বলিলেন ‘দাদা আমি আর পারি না’ তাঁহার হাত শিথিল হইয়া যাইল। নির্ম্মল তাঁহাকে ধরিলেন। কিন্তু ইন্দু অবসন্ন হইয়া বসিয়া পড়িলেন। নিবিড় অন্ধকার—প্রবল বৃষ্টি—জলকর্দ্দমে পথ দুর্গম,নিকটে আশ্রয়ের চিহ্ন নাই। নির্ম্মল হাত কোলে করিয়া বসিয়া কাঁদিবার লোক নহেন। যদিও সাধারণত তাঁহার জীবন স্বপ্নময় চিন্তাতে অতিবাহিত হইত, বিপদকালে তাঁহার কার্য্যশীলতার অভাব হইত না। তিনি তখন ভগ্নীর লঘু শরীর অনায়াসে হস্তে উত্তোলন করিয়া লইলেন। সেই তিমিরাচ্ছন্ন রজনীতে ঝড় বৃষ্টির মধ্যে দিয়া সংজ্ঞাহীনা সহোদরাকে ক্রোড়ে লইয়া অনিশ্চিত পথে স্নেহময় ভ্রাতা ধাবমান হইলেন। বিদ্যুতের ক্ষণিক আলোকে এক বার মাত্র সহোদরার মুখ দেখিলেন—মুখ পাণ্ডুবর্ণ, চক্ষু নিমীলিত ও আর্দ্র-কেশ রাজি সংলগ্ন। নির্ম্মল শীঘ্র কোন গ্রামবাসীর আশ্রয় পাইবেন আশা করিয়াছিলেন। পরে বুঝিতে পারিলেন, পথ হারাইয়াছেন। তখন তাঁহার ভরসা একবারে অন্তর্হিত হইতে লাগিল। এদিকে বৃষ্টিতে, বাতাসে, অন্ধকারে, কর্দ্দমে, জলের স্রোতে চলিয়া তাহার শরীর ক্রমে অবসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল। ইন্দুকে বহন করিবার সামর্থ্য যেন হ্রাস হইতে লাগিল। পা কাঁপিতে লাগিল, কিন্তু জীবন থাকিতে ইন্দুবালাকে সেই জলপ্লাবিত স্থানে কেমন করিয়া রাখেন? নির্ম্মল মনে মনে বলিলেন—“হে ঈশ্বর, অবশেষে ইন্দুকে এই প্রকার মরিতে দেখিতে হইল।” নির্ম্মল ইন্দুকে লইয়া বন্ধুর স্থানে উপস্থিত—আর চলিতে পারেন না, পা বড়ই কাঁপিতেছে, হাত অবশ, সমুদয় শরীর ভারাক্রান্ত। নির্ম্মল ভাবিলেন, আর উপায় নাই. তবে এই স্থানেই দুইজনে মরি। এমন সময় আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত আলোকিত করিয়া একটী বিদ্যুৎরেখা জ্বলিয়া উঠিল। নির্ম্মল দেখিলেন, সম্মুখে একটী অনতি-উচ্চ পাষাণ-স্তূপেএকটী ক্ষুদ্র গৃহ। আবার চলিতে লাগিলেন, ভাবিলেন, বুঝি ঈশ্বর রক্ষা করিলেন। আশার সঞ্চার হওয়াতে বল ফিরিয়া আসিল। ইন্দুকে বহন করিয়া সোপানমার্গে উঠিলেন; দ্বারে আঘাত করিলেন। ভিতর

হইতে একজন গম্ভীরস্বরে বলিল "দ্বারে কে আঘাত কর?" উত্তর "বিপদগ্রস্ত পথিক।" তখনই দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। দৃঢ়কায় মহত্ত্ব ব্যঞ্জক মূর্ত্তি সন্ন্যাসী দ্বারের সম্মুখে—বলিলেন, "ভিতরে আইস।" ভিতরে একটী ক্ষুদ্র আলোক জ্বলিতেছিল। তাহার নিকট অনেকগুলি গ্রন্থ; এক খানি উদ্ঘাটিত ছিল। নির্ম্মল ভিতরে আসিয়া কহিলেন "ইনি আমার ভগ্নী—অসুস্থা—জলে মৃতপ্রায়, এখন আপনার গৃহে আশ্রয়—অনুগ্রহ—ঈশ্বরের ইচ্ছা। সন্ন্যাসী আলোক হস্তে নিকটে আসিয়া প্রথমে নির্ম্মলের মুখের প্রতি, পরে ইন্দুর মুখের প্রতি তাকাইলেন। চমকিত হইয়া বলিলেন—"এই খানে।" নির্ম্মল মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় ইন্দুকে তাহার হস্তে দিলেন। সন্ন্যাসী ইন্দুকে একটী শয্যায় শোয়াইলেন। পরে "শান্তিশান্তি" বলিয়া ডাকিলেন। একজন বৃদ্ধা আসিল। সন্ন্যাসী বলিলেন, ইঁহাকে আর্দ্র কাপড় ছাড়াইয়া, শরীর ভাল করিয়া মুছাইয়া দেও, শুষ্ক কাপড় পরাও। নির্ম্মলকে বলিলেন, আইস আমরা অন্য ঘরে যাই। অন্য ঘরে গিয়া নির্ম্মল এবং পরিব্রাজক অনেকক্ষণ নিস্তব্ধে উভয়ে পরস্পরের মুখ পানে এক দৃষ্টে তাকাইয়া—নির্ম্মল প্রথমে পরিব্রাজককে ভাল চিনিতে পারেন নাই। কিন্তু এখন ঠিক চিনিলেন, কিছুই বলিলেন না। নির্ম্মল এবং পরিব্রাজক ইন্দুর নিকট আবার আসিলেন, কয় জনে ইন্দুকে অল্প অল্প অগ্নির উত্তাপ দিতে লাগিলেন। নির্ম্মলও পরিব্রাজক উভয়ে অনিমেষ লোচনে ইন্দুর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছেন। গতপ্রায় জীবনে আর চৈতন্য ফিরিয়া আইসে কি না, অন্ধকারময় আকাশে সূর্য্যরশ্মি প্রতিফলিত হয় কি না, তাহাই দেখিতেছিলেন। ক্রমে ইন্দুর জ্ঞানলাভ হইল, বলিলেন "আমি কোথায়?" নির্ম্মল বলিলেন, "ভয় নাই দিদি, আমি তোমার নিকট আছি।" আবার চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আবার যেন অচেতন হইয়া রহিলেন। পরিব্রাজক ও নির্ম্মল উভয়ে যেন রুদ্ধ শ্বাসে ইন্দুর মুখ পানে তাকাইয়া—ইন্দু আবার চক্ষু খুলিলেন। পরিব্রাজকের উপর দৃষ্টি পড়িল, যেন বিশ্বাস হইল না, যেন সন্দেহ হইতেছে তিনি এখনও স্বপ্ন দেখিতেছেন, এই প্রকার পরিব্রাজককে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। পরে সন্দেহ থাকিল না, চিনিতে পারিলেন, শোণিতহীন পাণ্ডুবর্ণ বদন কথঞ্চিৎ রক্তবর্ণ হইয়া যাইল, মন্দ-আবেগ হৃদয়ে একটুকু জোরে আঘাত করিতে লাগিল। ইন্দুর সেই শরীরের পক্ষে, মনের এই আবেগ, স্মৃতির এই তরঙ্গ স্রোত, মনকে আকুল করিল। তাহা তাঁহার সহ্য হইল না তিনি আবার অজ্ঞান। নির্ম্মল পরিব্রাজককে বলিলেন,—"আপনি এক্ষণ কিছু কালের নিমিত্ত এস্থান হইতে অপসৃত হউন।" পরিব্রাজক অনিচ্ছার সহিত সেই স্থান হইতে চলিয়া যাইলেন। ইন্দুর আবার জ্ঞান হইল। এইবার ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া নির্ম্মলকে বলিলেন, "দাদা, এখানে আর একজন বসিয়াছিলেন?" "তিনি এখন নাই, তোমার সহিত পরে আবার সাক্ষাৎ হইবে।" ইন্দু আবার খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—"এখন হয় না কি? আমার তাঁহাকে বড় দেখিতে ইচ্ছা করিতেছে।" নির্ম্মল কহিলেন—"আচ্ছা তবে আমি তাঁহাকে ডাকিতেছি।" পরিব্রাজক আসিলেন। ইন্দুর শিয়রে বসিলেন।

দুই জন মুহূর্ত্তকাল পরস্পরের মুখের দিকে অনিমিষ লোচনে তাকাইয়া। সেই নীরব ভাষার বাগ্মীতা কিরূপে বুঝাইব ?—সেই তাড়িতবাহী—হৃদয় কম্পনকারী দৃষ্টির অর্থ,—সেই কত দুঃখ-যাপিত দীর্ঘ-বৎসরের চিন্তা, আশা, নৈরাশ্য,—সেই সহস্র অতীত ঘটনার স্মৃতির এককালীন দুর্দ্দমনীয় উচ্ছ্বাস—সেই উভয়ের পরস্পরের প্রাণভূত পদার্থের পরিণাম লাভ,—তাহার যে মর্ম্ম, তাহার যে সুখ, সে সুখের অস্থিরতা, হৃদয়ের চাঞ্চল্য, মস্তিষ্কের মধুময় আবর্ত্তন—তাহা ভাষায় প্রকাশিত হয় না। ইন্দু অধিকক্ষণ তাকাইয়া থাকিতে পারিলেন না। আনন্দে, উল্লাসে, সুখে, লজ্জায় ইন্দুর সমুদায় শরীর কম্পিত হইতেছিল। ইন্দু আবার অচেতন। এবার অনেকক্ষণ অচৈতন্য ভাঙ্গিল না। বোধ হয় পরিশ্রান্ত শরীর নিদ্রাভিভূত হইল। পরিব্রাজক এবং নির্ম্মল উভয়ে পার্শ্বে বসিয়া। বাহিরে—সে ক্ষুদ্র গৃহকে আঘাত করিয়া এখনও ঝটিকা হু হু করিয়া বহিতেছে, বৃষ্টি পড়িতেছে, পাহাড় হইতে জলের স্রোত ক্ষরিত হইয়া জলপ্রপাতের শব্দ করিতেছে। তখন ইন্দু প্রশান্ত নিদ্রার ক্রোড়ে সুষুপ্তা।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

স্বাস্থ্য-রক্ষা ও সাধারন স্বাস্থ্য-তত্ত্ব,—প্রথমভাগ, ফরিদপুরের সিভিল সার্জন শ্রীযুক্ত বাবু ধর্ম্মদাস বসু প্রণীত; মূল্য ২৲। এই অমূল্য গ্রন্থখানিকে সাধারণের উপযোগী করিতে ধর্ম্মদাস বাবু চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। পুস্তকখানি ৩১৪ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত, উত্তম কাগজে মুদ্রিত, কাপড়ের রঙ্গিন মলাটে আবৃত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম পরিচ্ছেদে, উপক্রমণিকা; দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে, জলবায়ু, বায়ু, জল, ভূমি-বাস্তু, বাসগৃহ, খাদ্য এবং পরিধেয়। এই কয়েকটী গুরুতর অত্যাবশ্যকীয় জ্ঞাতব্য বিষয়ের আলোচনায় পুস্তকখানি শেষ হইয়াছে। এই ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত বঙ্গভূমিতে স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য যিনি যে চেষ্টা করিতেছেন, তিনিই আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র। মানুষ, রোগের হস্ত হইতে মুক্তি না পাইলে, ধর্ম্ম চিন্তাই বল আর সংসার-উন্নতির চিন্তার কথাই বল, কোন চিন্তাকেই হৃদয়ে স্থান দিতে পারে না। স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান সকল উন্নতির মূল, অথবা সকল উন্নতি লাভের প্রথম সোপান। আমরা অনেকেই জানি না, কি উপায় অবলম্বন করিলে আমাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হইতে পারে। না জানার দরুণই যে আমাদের এদেশে যুবা, বৃদ্ধ, নরনারী দিন দিন দুর্ব্বল, রোগ-পীড়িত হইতেছেন, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। শরীরের দুর্ব্বলতা, মানসিক দুর্ব্বলতার প্রধান কারণ। আমরা দিন দিন সকল দিকেই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছি। এই দুর্ব্বলতার কারণ কি, ইহা যিনি বহু অর্থ, বহু দিনের পরিশ্রম ব্যয় করিয়া সাধারণের গোচর করিয়াছেন, তিনি যে সকলেরই কৃতজ্ঞতার পাত্র, তাহাতে আর সন্দেহ কি? ধর্ম্মদাস বাবু মানব জীবনের সার্থকতা করিয়াছেন,—বঙ্গদেশের এক প্রধান অভাব মোচন করিয়া মহদুপকার সাধন করিয়াছেন।

বাস্তবিক আমরা ধর্ম্মদাস বাবুর নিকট অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হইয়াছি। এপর্য্যন্ত স্বাস্থ্য-রক্ষা সম্বন্ধে যে সকল পুস্তক প্রচারিত হইয়াছে,তাহা তেমন বিস্তৃত হয় নাই; কোন কোন স্থলে তাহা শারীরবিদ্যা-অনভিজ্ঞ লোকের দ্বারা লিখিত হইয়াছে। সে সকল পুস্তকের উপরে বড় একটা নির্ভর করা যায় না। বাবু যদুনাথ মুখোপাধ্যায় কৃত শরীরপালন সবশ্য ভাল গ্রন্থ, কিন্তু তাহাতে বৈজ্ঞানিক যুক্তির বড় প্রাবল্য নাই;—ধর্ম্ম উপদেশের ন্যায় তাঁহার উপদেশ মানিতে পারিলে কিছু উপকার হইতে পারে। কিন্তু ধর্ম্মদাস বাবুর পুস্তকখানি বৈজ্ঞানিক যুক্তিপূর্ণ উপদেশে পরিপূর্ণ, অথচ এতই সহজবোধ্য যে, যে সে ইচ্ছা করিলে অতি কঠিন কঠিন বিজ্ঞানের কথা বুঝিতে পারে। পুস্তকখানিতে অনুসন্ধিৎসার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। এ পর্য্যন্ত যে সকল তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে, প্রায় সকলই ইহাতে আছে। এই পুস্তকখানি গৃহে গৃহে পঞ্জিকার ন্যায় অধীত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই পুস্তকখানি স্কুলে স্কুলে পাঠ্য রূপে গৃহীত হওয়া প্রার্থনীয়। মূল্য অধিক হইয়াছে বলিয়া অনেকের পক্ষে ক্রয় করা দুঃসাধ্য হইতে পারে,কিন্তু আশা করা যায়, স্কুলের পাঠ্য-তালিকাভুক্ত হইলে, ধর্ম্মদাস বাবু ইহার মূল্য কমাইয়া দিবেন। মেডিকেল স্কুল সমূহে এ পুস্তকখানি এখনই পাঠ্য হওয়া উচিত। ধর্ম্মদাস বাবুকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। আমাদের বিশ্বাস আছে, তাঁহার বহু-যত্ন প্রসূত এই অমূল্য গ্রন্থখানিকে বঙ্গসন্তানেরা উপেক্ষা করিবে না। বিশেষত যে দুঃসময়ে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে, এ সময়ে সকলেই ইহাকে আদর করিবে। তাঁহার এই অপূর্ব্ব গ্রন্থের দুই এক স্থল উদ্ধৃত না করিয়া আমরা এই সমালোচনা শেষ করিতে পারিলাম না।

"দেখিতে হইবে যে, সভ্যতার বৃদ্ধির সহিত মনুষ্যের মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রমের বৃদ্ধি বা হ্রাস হইবার সম্ভাবনা। ইহা বলা বাহুল্য যে, ক্রমশ পরিশ্রমের বৃদ্ধি ব্যতীত হ্রাস হইবার সম্ভাবনা নাই; তবে সভ্যতার আগমনে কিরূপে মাংস ভক্ষণের হ্রাস হইতে পারে? মানসিক পরিশ্রম বিনা কেহ সভ্যতার সোপানে উঠিতে পারিবেন না, সুতরাং মাংস ভক্ষণ ব্যতিরেকেও সভ্যতার সোপানে উত্থিত হইতে পারিবেন, এরূপ ভরসা করা যায় না। * * * * দুগ্ধ, পনির, ডিম্ব ইত্যাদিকেও আমিষ বলিয়া স্বীকার করা উচিত। বিশেষত জীব-হিংসা করিলে যদি পাপ হয়, তবে গাভী, ছাগী, গর্দ্দভী বা মহিষীর বৎসের খাদ্য যে দুগ্ধ,তাহা আমরা কোন্ নিয়মানুবর্ত্তী হইয়া ব্যবহার করি? মনুষ্য আপন জননী ব্যতীত অন্য কোন জীবের দুগ্ধ পান করিবে, ইহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত কিনা,তাহা বলা কঠিন। * * * * অতএব মনুষ্য এককালে দুগ্ধ ঘৃত, পনির, ডিম্ব ও মৎস্য পরিত্যাগ করিয়া কেবল শস্য ও আনাজ ভক্ষণ করিয়া বাস্তবিক স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে পারেন, তাহার উত্তম রূপ প্রমাণ প্রাপ্ত না হইলে মাংস ভোজন নিষেধ করা যুক্তি সঙ্গত বলা যায় না।"

আমরা আশা করি, আহারাদি সম্বন্ধে চিকিৎসা-বিদ্যা-বিশারদ বহুদর্শী ডাক্তার ধর্ম্মদাস বসুমহাশয় যাহা ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা সকলের নিকট আদরনীয় হইবে।

অন্যান্য পুস্তক আগামী বারে সমালোচিত হইবে।

ভক্তিসূত্র।

জীবত্ব জড়ত্ব মাত্র, জড়ত্ব দুর্ব্বলতামাত্র, দুর্ব্বলতা বিকাশের অভাবমাত্র। জড় বিকশিত হইলে জীব হয়, জীব বিকশিত হইলে জীবত্ব হইতে মুক্তি পায়, দেবত্ব লাভ করে। জীববৃত্তি শারীরিক ও মানসিক। শারীরবৃত্তি মানস সাপেক্ষ, মানসবৃত্তি শারীর সাপেক্ষ। শারীর বৃত্তির উন্নতি বা অবনতি স্থূলগ্রাহ্য। সুতরাং শারীর বৃত্তির অনুশীলন বর্ব্বর ও সভ্যকে যুগপৎ আকর্ষণ করে। সর্ব্ববৃত্তির সম্যক অনুশীলনে জড়ত্ব, দুর্ব্বলতা বা জীবত্বের মোচন হয়। তাহার নাম মুক্তি।

শারীরবৃত্তি সাধারণকে আকর্ষণ করে, মানসবৃত্তি কেবল পণ্ডিতগ্রাহ্য। এজন্য পণ্ডিতেরা মানস বৃত্তির অনুশীলনে সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করেন। পণ্ডিতেরা আত্ম অনুসারে কেহ জ্ঞানানুশীলনের, কেহ ভক্তি-অনুশীলনের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। কাহারও মতে জ্ঞানে মুক্তি, কাহারও মতে ভক্তিতে মুক্তি। "ভক্তিতে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর।" পশু ভাব-চালিত, মনুষ্য জ্ঞানচালিত। যুবা ভাব-প্রবণ, বৃদ্ধ বুদ্ধি-প্রবণ; বেদ ভাবুকের কবিতা, উপনিষদ বুদ্ধিমানের দর্শন। এজন্য দার্শনিক জ্ঞানের গুণগণা, কবি ও ধর্ম্ম-প্রচারক ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব গান করেন। ভাব প্রাচীনতাকে রক্ষাকরে, জ্ঞান নূতনতাকে উদ্ভাবন করে। ভাবুক স্থিতিশীল, জ্ঞানী উন্নতিশীল; ভাবুক স্বদেশ ও স্বজাতিপ্রিয়, জ্ঞানী সার্ব্বজনিক ও সার্ব্বদেশীক। ভাবুক প্রহৃষ্ট, জ্ঞানী বিষণ্ণ; ভাবুক উন্মত্ত, জ্ঞানী প্রসন্ন। ভাবপ্রবণ মনুষ্য পশু, জ্ঞান-প্রবণ পশু মনুষ্য সদৃশ। ভাবে মনুষ্যকে পশুর সহিত সংযোগ করে, জ্ঞানে পশুকে মনুষ্যের সহিত সংযোগ করে।

কিন্তু জ্ঞানেও জীবত্ব ঘুচেনা, ভক্তিতেও মুক্তি মিলে না। যখন উহারা প্রত্যেকে আপন স্বরূপ হারাইয়া ফেলে,—জ্ঞানকে জ্ঞান বলিয়া চিনা যায় না, ভক্তিকে ভক্তি বলিয়া উপলব্ধি হয়না,যখন একটী হইতে অন্যটীকে পৃথক করা যায় না, তখনই মুক্তিলাভ হয়।

মুক্তি কেবল প্রেমে। প্রেম ভক্তি নহে, প্রেম জ্ঞান নহে; ভক্তি ও জ্ঞান উভয়ে সমভাবে পূর্ণ অনুশীলিত হইলে দুইজনে যখন অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশিয়া যায়, মনের সেই অবস্থার নাম প্রেম। প্রেমিকের জ্ঞান নাই, প্রেমিকের ভক্তি নাই। সে ক্ষেপা ভোলানাথ। অজ্ঞান, অভক্ত প্রেমিক হইতে পারে না।

আরাধ্য বিষয়ে পরানুরক্তির নাম ভক্তি। অনুরাগের ক্ষণিক উচ্ছ্বাসকে ভক্তি বলা যায় না; এবং পুত্রকলত্রে যে প্রীতি, তাহাকেও ভক্তি বলা যায় না। জ্ঞান না হইলে ভক্তি হয় না। যাহাকে জানি না তাহাকে ভক্তি করি না, তাই বলিয়া যাহাকে জানি তাহাকেই ভক্তি করি না। ভক্তি ও দ্বেষ উভয়ই জ্ঞান মূলক। আরাধ্য বলিয়া জানিলে আরাধ্য বিষয়ে স্বতঃই যে পরানুরক্তি জন্মে, তাহাকে ভক্তি বলা যায়। সুতরাং জড়, অজ্ঞান, বা বাতুলের ভক্তি সম্ভাবনা নাই। এবং জ্ঞানকে ভক্তি বিরোধী বলা যুক্তি-সঙ্গত নহে। তাই বলিয়া জ্ঞানকে ভক্তি

বলা যায় না, জ্ঞান ভক্তির কারণ মাত্র, ভক্তি ভাববৃত্তি, জ্ঞান বুদ্ধিবৃত্তি। যাহাকে ভয় করি, তাহাকে ভক্তি করিনা; ভয় ও ভক্তি বিসম্বাদী। ভয় বিরাগ উৎপাদন করে, ভক্তি অনুরাগের চরম মাত্রা। কিন্তু প্রণয়ীর অনুরাগ ভক্তি নহে, সেখানে সমান সমান, মহতের প্রতি ক্ষুদ্রের পরানুরাগকে ভক্তি-বলি। প্রণয়ীর অনুরাগে স্বর্গলাভ ঘটে, কিন্তু মুক্তিলাভ হয় না। কৃষ্ণানুরাগিণী ব্রজাঙ্গনা কৃষ্ণকে প্রণয়ী বলিয়া ভাল-বাসিত, ভালবাসার অনুশীলন তাহারা যথেষ্ট করিয়াছিল, তজ্জন্য তাহারা ভালবাসার যথেষ্ট উন্নতি বা স্বর্গলাভ করিয়াছিল, কিন্তু কৃষ্ণকে আরাধ্য বলিয়া অনুরক্ত হয় নাই, সুতরাং মুক্তিলাভ করিতে পারে নাই। আরাধ্য যত উন্নত হইবে, ভক্তি তত শ্রেষ্ঠ-তর হইবে, মুক্তি তত নিকট হইবে। বৃক্ষ বা ধেনুকে আরাধ্য বলিয়া তাহার প্রতি অনুরক্ত হইলে স্বর্গলাভ ঘটে, এবং কাহা-কেও আরাধ্য বলিয়া বিবেচনা না করা, কাহারও প্রতি ভক্ত না হওয়া অপেক্ষা বৃক্ষ ধেনুভক্তের অবস্থা শ্রেয়স্কর। একদিকে আরাধ্যকে আরাধ্য বলিয়া না জানায়, তাহার ভক্ত না হইয়া কেবল প্রণয়ী হইলে যেমন মুক্তি ঘটে না, পক্ষান্তরে আরাধ্য পদার্থ ভক্তির নিয়ন্তা হওয়ায়, এবং আরা-ধ্যের প্রকৃতি অনুসারে ভক্তির পরিমাণ সসীম বা অসীম হওয়ায়, যাহার দেবতা যত নিকৃষ্ট, তাহার ভক্তি মুক্তি দিতে তত অক্ষম। জ্ঞান যত অনুশীলিত হইতে থাকে, আরাধ্যের মহত্ব তত অধিক হয়; যাহা পূর্ব্বে আরাধ্য ছিল, তখন আর তাহা আরাধ্য হয় না; কিন্তু তাহার নামে যে ভক্তি কর্ষিত হইয়াছিল, তাহার স্থানে যে উন্নত-তর প্রকৃতি আরাধ্য রূপে আসন গ্রহণ করেন, তাহার প্রতি সেই কর্ষিত ভক্তি বেগবত্তর রূপে প্রধাবিত হয়। কিন্তু মুক্তি এখনও দূরে। জ্ঞান চর্চ্চার পরিপন্থী ভক্তিস্রোত। জ্ঞান ভক্তির অগ্রগামী, আরাধ্য নিরূপক জ্ঞান উন্নততর হইয়া যত উন্নত আরাধ্য খুঁজিয়া লয়, ভক্তি তত উন্নত হইতে থাকে। শেষে সম্যক কর্ষিত জ্ঞান ঈশ্ব-রকে আবিষ্কৃত করিলে তাঁহার প্রতি যে পরা ভক্তি উদ্দীপিত হয়, আমরা যাহাকে প্রেম বলিয়াছি, সেই সম্যক জ্ঞান সহচরী পরাভক্তি মুক্তির কারণ। গোবৃক্ষের ন্যায় প্রতিমাভক্তি স্বর্গদানে সমর্থ, কিন্তু মুক্তি দিতে পারে না। জ্ঞান যাহাকে অতিক্রম করিতে পারে না, পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াও যাহার পদানত থাকে, সুতরাং ভক্তিও যাহাকে ছাড়িয়া অন্যমুখে ছুটিতে পারেনা, সেই চরমলক্ষ পরম আরাধ্য পরাভক্তি মুক্তির একমাত্র কারণ। জ্ঞানের সম্পূর্ণ অভাব, ও ভক্তির সম্পূর্ণ অভাব সমাবস্থা, ইহা মুক্তির কারণ নহে, আংশিক জ্ঞান ও ভাবের সমাবস্থা, ইহাও মুক্তির কারণ নহে। উভয়ের পূর্ণতায় উভয়ে যখন অবিচ্ছেদ্যভাবে সমাবস্থ, সে ভাব কেবল অনতিক্রমনীয় ঈশ্বরে সম্ভব, সেই ভক্তি মুক্তির কারণ। অন্য কোন পূর্ণ প্রতীয়মান অপূর্ণ অবস্থায় উহা পাওয়া যায় না। বিবাহে, সন্তান পালনে বা ভক্তিতে স্বর্গমিলে, কিন্তু প্রেম বিনা আর কিছুতে মুক্তি মিলে না। স্বর্গে জীবত্ব থাকে, মুক্তি জীবত্বের নির্ব্বাণ, ব্রহ্মের স্বারূপ্যলাভ। সামীপ্য ও সাযুজ্যভেদে স্বর্গ নানা প্রকার। তবে কি ব্রহ্মদ্বেষী নাই? আছে। দ্বেষেরও কারণ জ্ঞান। সুতরাং ব্রহ্মদ্বেষীরও ব্রহ্ম

জ্ঞান আছে, কিন্তু সে জ্ঞান, রজ্জুতে সর্প-জ্ঞানের ন্যায়, জ্ঞান রাজ্য হইলেও ভ্রমমাত্র। যাহারা ব্রহ্মকে স্বরূপতঃ জানে, তাহারা ব্রহ্মদ্বেষী হয় না। অপূর্ণজ্ঞান বা ভ্রম অনেক সময় দ্বেষের কারণ বলিয়া বুঝা যায়। যে তাঁহাকে জানে, সেই, রসস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ বলিয়া তাঁহার অনুরাগী হয়। পরাভক্তি ও পরম জ্ঞান অবিচ্ছেদ্য বলিয়া, যেখানে একটী বর্ত্তমান সেখানে অন্যটীর নিরন্তর অবস্থিতি স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া কোন শাস্ত্রে ভক্তি, কোন্ শাস্ত্রে জ্ঞান মুক্তির কারণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে তাহারা বিসম্বাদী নহে।

"যথা তে নিশ্চলং চেতো ময়ি ভক্তি সমন্বিতং তথা ত্বং মৎপ্রসাদেন নির্ব্বাণমপি বাঞ্ছসি"

বিষ্ণুপুরাণ—১।২০।২৮

"তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি। নান্যপন্থা বিদ্যতেঽয়নায়েত্যত্র।"

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্—৩।৮

ভক্তি জ্ঞান জন্য, জ্ঞান ইচ্ছা জন্য নহে। কেহ ইচ্ছা পূর্ব্বক জ্ঞান উৎপাদন করিতে বা অন্যথা করিতে পারে না। নিদ্রিত ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক নিদ্রাভঙ্গ করিতে সমর্থ নহে। যে ভক্তিপ্রবণতা লইয়া জন্ম গ্রহণ করে নাই, সে কখনও ভক্ত হইবে না। জন্ম মুহূর্ত্তে যাহার জ্ঞানের ঘরে শূন্য পড়িয়াছে, সে কখন জ্ঞানলাভ করিবে না। জ্ঞান ও ভক্তি কর্ম্মনিয়ত। যাহার ভাগ্যে মুক্তি নাই, তাহাকে নরকভোগ করিতেই হইবে। সৌভাগ্য এই যে, কে সেরূপ দুর্ভাগ্য, কেহ জানে না। দুর্ভাগ্য এই যে, শাসন করিবার সময় সমাজ প্রাক্তন ফল গণনায় আনেনা। সমাজ অন্ধ, জড়জগতের ন্যায় অন্ধ, অন্ধের মত সমাজ ও জড় জগৎ শাসনদণ্ড ঘুরাইতেছে; যে তাহার মধ্যে পড়িবে, তাহার মস্তক চূর্ণীত হইবে। এইরূপ চূর্ণ করাই তাহাদের প্রকৃতি, এইরূপ না করিলে তাহাদের অবস্থান অসম্ভব হইত। জড় জগতের ন্যায় সমাজের হৃদয় নাই, সম্ভবে না। তোমার আমার মত দুর্ভাগা একটু মমতার আশা করে; কিন্তু অপরাধীর বাসনা রাজদণ্ডের কোমলতার কারণ হয় না। এরও, এরণ্ডই থাকিবে, সহস্র চেষ্টা করিলেও উহা আপনাকে অশ্বত্থে পরিণত করিতে পারিবে না। নির্ম্মম হইয়া আগাছা গুলি সমূলে উৎপাটন করাই সমাজের কর্ত্তব্য।

জ্ঞান—ভক্তির কারণ। যাহাকে দেখি নাই, যাহার কথা শুনি নাই, তাহাকে ভক্তি করিব কিরূপে? যুথিকার কোমল সুষমা যেদিন দেখিয়াছি, মনমোহন সৌরভের আঘ্রাণ লইয়াছি; সেদিন হইতে যুথিকার অনুরাগী হইয়াছি। কোকিলের পঞ্চস্বরে মোহন সংগীত যে দিন শুনিয়াছি, সেইদিন অবধি তাহা ভাল বাসি। ভক্তি অনুরাগের উন্নত অবস্থা। সুতরাং কাহাকেও ভক্তি করিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে ভালরূপে জানা আবশ্যক। জানিলেই ভক্তি বা দ্বেষ জন্মে। জানিনা অথচ আরাধ্য, ইহা বিসম্বাদী কথা। ভক্তি করিবার পূর্ব্বে জানা চাই, আরাধ্য বলিয়া জানা চাই।

জ্ঞানের ও ভক্তির অঙ্কুর থাকিলে, কর্ষণে তাহার উন্নতি বিধান করা যাইতে পারে। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনাদি জ্ঞান বৃদ্ধির উপায়। জ্ঞানের ফল পরাভক্তি। যে পর্য্যন্ত পরাভক্তি না জন্মে, তদবধি জ্ঞান চর্চ্চা করিতে হইবে, অর্থাৎ পূর্ণতা প্রাপ্তি পর্য্যন্ত জ্ঞান

চর্চ্চা বিধেয়। জ্ঞান চর্চ্চা উপেক্ষা করিলে ভক্তি হীনপ্রভ হইবে। ব্রহ্মকে স্বরূপত জ্ঞাত হওয়া জ্ঞানের পূর্ণতার প্রমাণ, যখন দেখিবে প্রতিকৃতি যথাযথ হইয়াছে, তখন বুঝিবে, দর্পণের স্বচ্ছতা জন্মিয়াছে। পূর্ণজ্ঞান পূর্ণভক্তি উৎপাদন করে। পূর্ণজ্ঞ পূর্ণভক্তের অবস্থা মুক্তি, তখন জীবাত্মা ও পরমাত্মায় প্রভেদ থাকে না। প্রেমিক বিনা আর কেহ অদ্বৈতবাদ বুঝে না। প্রেমের জন্ম না হওয়া পর্য্যন্ত দ্বৈতবাদ যুক্তিসিদ্ধ।

জ্ঞান ও ভক্তি বাহ্য লক্ষণ দ্বারা অনুমেয়। যাহার প্রতি একান্ত অনুরাগ জন্মে, তাহার নাম শ্রবণে লোমহর্ষণ হয়, চক্ষে আনন্দাশ্রু বহিতে থাকে। যাহাকে ভালবাসি; তন্নামবিশিষ্ট, তদ্বর্ণবিশিষ্ট, তদ্গুণ বিশিষ্ট তাহার আত্মীয় যে, তাহাকেও ভালবাসি।

"পক্ষপাতেন তন্নাম্নি মৃগে পদ্মেচ তাদৃশি
বভার মেঘে তদ্বর্ণে বঙ্কমানমতিং নৃপ"

নৃসিংহ পুরাণ। ২৫। ২২

সে যাহাকে ভালবাসে, তাহাকে ভাল বাসি, তাহার যে সে যেন আমার। সর্ব্বত্র সকলে তাহাকে দেখি। বিশ্ব সংসার তন্ময় হইয়া উঠে। প্রেমে বিরহ নাই, সাগর তরঙ্গ-শূন্য নহে। বিরহ-সংশ্লিষ্ট প্রেম, তরঙ্গ-শূন্য সাগর, বায়ুশূন্য পৃথিবী অসম্ভব কথা। যাহার বিরহ-কাতর মুখশ্রী দেখিবে, বুঝিবে, সে তরুণী। প্রেমের আভাস পাইয়াছে; কিন্তু প্রেমামৃতের স্বাদলাভ ঘটে নাই। শয়নে, স্বপনে, জাগরণে সেই নাম, সেই চিন্তা, সেই ধ্যান; সম্মুখে সে নিত্যমোহন মাধুরী, বিশ্ব তাহাতে পরিপূরিত। চাঁদে তাঁহার রূপ, ফুলে তাঁহার কান্তি, মেঘে তাঁহার গম্ভীরতা, বায়ুতে তাঁহার প্রখরতা, জলে তাঁহার কোমলতা, সর্ব্বত্র তাঁহার আবির্ভাব। "যে দিকে ফিরাই আঁখি, কৃষ্ণময় জগৎ দেখি;" তবে বিরহের সম্ভাবনা কোথায়?

যাহাকে ভালবাসি, তাঁহার কথায় সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিতে পারি, অন্য কেহ রত্ন দিলেও ভুলি না।

"অপি কীট পতঙ্গোবা ভবেয়ং শঙ্করাজ্ঞয়া
নতু শক্র ত্বয়া দত্তং ত্রৈলোক্যমপিকাময়ে।"

অনুশাসনপর্ব্ব। ১৪।১০৭

যাহাকে ভালবাসি, আপনাকে তাহার মনের মত করিতে চেষ্টা করি, আর সর্ব্বদা তাহার সঙ্গে থাকিতে বাসনা হয়। কখন "দাসী" হইয়া তাঁহার পদ সেবা করি, কখন "সখা" হইয়া তাঁহার সঙ্গে রহস্য আলাপ করি, কখন প্রণয়িনী হইয়া তাঁহাকে মন প্রাণ যথা সর্ব্বস্ব অঞ্জলি বাঁধিয়া ধরিয়া দেই, যেরূপ তাঁহার ইচ্ছা, তাঁহার হইতেই আমার সুখ। তাঁহার মনোরঞ্জনে জীবন সার্থক হয়, তজ্জন্য গৃহ ত্যাগ, কুলত্যাগ, দেশত্যাগ অকিঞ্চিৎকর। যাঁহাকে ভালবাসি, সে যদি খড়্গাঘাতে হত্যা করে, তবুও বলিব—"Thy will be done" তুমি যে আমার। ভীষ্মকে বধ করিতে শ্রীকৃষ্ণ খড়্গ হস্তে উপস্থিত; ভক্ত ভীষ্ম আদরে ডাকিতেছেন, আর বলিতেছেন, "এস এস, তোমার যাহাতে সুখ, তাই কর।"

"এহ্যেহি দেবেশ জগন্নিবাস নমোঽস্তুতে শার্ঙ্গ গদাসি পানে। প্রসহ্য মাং পাতয় লোকনাথরথাচ্ছদপ্রাভূত শৌর্য্য সংখ্যে॥"

ভীষ্ম ৫৮।২৬০৪

জ্ঞানের ন্যায় ভক্তিও সাধনায় বৃদ্ধ হয়। তন্নাম শ্রবণ ও তন্নামকীর্ত্তন অনুরাগ জনক। নমস্কার বা নিজ অপকর্ষ স্মরণ এবং উপাসনা বা তদীয় উৎকর্ষ চিন্তনে অনুরাগ বৃদ্ধি হয়।

" সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতা
নমস্যন্ত শ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে।
জ্ঞান যজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে
একত্বেন পৃথকত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্।"
তথা "অনন্যা শ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনা
পর্য্যুপাসতে তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং
যোগক্ষেমং বহাম্যহং।" গীতা।

অনন্যমনা ও অনন্যরাগ হইয়া তাঁহার স্বরূপ ধ্যান, ভক্তি সাধনের অন্যতর উপায়। কিন্তু ইহাদিগের যে কাহারও সিদ্ধি হৃদয়ের পবিত্রতার উপর নির্ভর করে। হৃদয় পবিত্র না হইলে ধ্যানে একাগ্রতা বা কীর্ত্তনে তন্ময়তা জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। অপবিত্র হৃদয় ব্যভিচারী, একজনে রমণ করিবার সময় অন্য জনকে স্মরণ করে, না নিজে তৃপ্ত হয়, না অন্যকে তৃপ্ত করে। আর একটী কথা, এই সকল অঙ্গ সাধনে সম্পূর্ণ নিষ্কাম হইতে হইবে। ধন, পুত্র সৌভাগ্যাদি সঙ্ক-ল্পার্থ অঙ্গ সাধন নিয়োজিত হইলে তাহারা তত্তৎ ফলোৎপাদনেই পর্য্যবসিত হইবে— ভক্তি উৎপাদনে সমর্থ হইবে না। এই অঙ্গ সাধন মার্গে স্বর্গলাভও বাঞ্ছনীয় নহে। স্বর্গ অচিরস্থায়ী, মোক্ষ হইতে বহুদূরে। স্বর্গ জীবের, মুক্ত যে সে দেবতা; দেবতা প্রেমিক, মনুষ্য ভাব-পশু।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী।

ঊনবিংশ শতাব্দী ও ঈশ্বর বিশ্বাস।

মনুষ্য আদিম কাল হইতে, যে কারণেই হউক, ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আসি-তেছিল। কোন দিন প্রশ্ন করে নাই, কেন বিশ্বাস করে, এবং কি কারণেই বা হৃদয়ে এই বিশ্বাসের উদয় হইল। মনের অন্যান্য নানা প্রকার ভাব বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই ঈশ্বর বিশ্বাস পাইয়াছিল। মৃত ব্যক্তির ভূতের চিন্তায়ই হউক, অথবা পদার্থ মাত্রই আপনার মত জীবনবিশিষ্ট বলি-য়াই হউক—স্পেন্সরের কথাই সত্য হউক, না হয়, হ্যারিসনের কথাই সত্য হউক—অসভ্যাবস্থা হইতেই মনুষ্যের হৃদয়ে এই ঈশ্বর বিশ্বাস নিহিত আছে, দেখিতে পাই। সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ দেখিল যে, অসভ্যাবস্থায় তাহারা এমন অনেক ঘটনাকে এরূপ ভাবে মানিয়া লইয়া-ছিল, যাহা আদৌ সে প্রকৃতিরই নহে। এই বিচারের যুগে—এই বিপ্লবের সময়ে, সকল কথারই বিচার হইতে আরম্ভ হইল, বুদ্ধি দ্বারা সকল বিষয়ের সিদ্ধান্ত করিবার চেষ্টা সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হইল। ঈশ্বর বিশ্বাসও এই সময়ে আক্রান্ত হইতে বাকী রহিল না। তখন ঈশ্বর বিশ্বাসীগণ খুঁজিতে লাগি-লেন, তাঁহাদের এই বিশ্বাসের মূল কি? এবং তাহাও বুদ্ধি দ্বারা সমর্থিত হইতে পারে কি না? ফেসিয়ান (Fashion) বড় শক্ত জিনিস। যখন যাহার ফেসিয়ান উঠে, তখন তাহা সকল বিষয়কেই অধিকার করিয়া থাকে। যখন নিউটনের মাধ্যাক-র্ষণের আইন আবিষ্কৃত হইল, তখন সঙ্গত হউক আর অসঙ্গত হউক, সকল বিষয়ই এই আইন দ্বারা প্রমাণিত করিবার একটা ফেসিয়ান পড়িয়া গিয়াছিল। আজ কাল আবার ক্রমবিকাশের আইন সম্বন্ধে ঠিক্ তাহাই ঘটিয়াছে; এখন দেখিতে পাই যে, সকল বিভাগের সকল প্রশ্নেই এক শ্রেণীর লোক এই ক্রমবিকাশের আইন আনিয়া উপস্থিত করেন। যখন নূতন ক্ষেত্রতত্ত্বের

আলোচনা আরম্ভ হইল, তখন এক ঈশ্বর প্রমাণকারী দার্শনিক, "ঈশ্বর প্রমাণ" নামক একটা প্রতিজ্ঞা, সংজ্ঞা ও স্বতসিদ্ধাদি দ্বারা ঠিক ক্ষেত্রতত্ত্বের এক ক্ষেত্র আঁকিয়া, প্রমাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ছোট খাট বিষয়ে এ দৃষ্টান্তের আর অভাব নাই। যখন সকল কথাই বুদ্ধি দ্বারা সিদ্ধান্ত হইতে আরম্ভ হইল, তখন প্রচলিত ফেসিয়ানের অনুরোধে ঈশ্বর-বিশ্বাসীগণ, আপনাদের ঈশ্বরকেও এই বুদ্ধি দ্বারা, অথবা ন্যায় ও দর্শন দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে আরম্ভ করিলেন। এই উদ্যম ও চেষ্টা কত দূর পর্য্যন্ত অভীষ্ট পথে কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছে, তাহা আমরা পূর্ব্বের দুই সংখ্যা নব্যভারতে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি।

দার্শনিক প্রমাণ যদি ঈশ্বর সম্বন্ধে অপ্রযুক্ত, তবে তুমি ঈশ্বর বিশ্বাস করিবে কেন? ঊনবিংশ শতাব্দীর এই তীক্ষ্ণ প্রশ্ন। একালের পণ্ডিতেরা বলিতেছেন যে, যে কোন প্রকারেই হউক, তোমাকে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, ঈশ্বর আছেন। যদি তুমি এখন কথা বল যে, আবহমান কাল সকল লোকেই ঈশ্বরকে মানিয়া আসিতেছে, অতএব তিনি আছেন; তাহা হইলে এই পণ্ডিতেরা তোমাকে বেখরচা জাহাজে তুলিয়া আফ্রিকার হটেন্‌টট্‌দিগের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করাইতে লইয়া যাইবেন। কিন্তু অপর দিকে আবার দেখিতেছি যে, প্রমাণ দ্বারা (যে কোন প্রমাণই হউক না কেন) ঈশ্বরকে প্রমাণ করিবার চেষ্টার নামই দার্শনিক যুক্তি। পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে সেই সর্ব্ব প্রকার প্রমাণের অসারতা দেখাইবারই চেষ্টা করা গিয়াছে।

পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম যে, ঈশ্বর নিত্য-প্রত্যক্ষ। এই নিত্য-প্রত্যক্ষ শব্দের অর্থ কি? আমার এই হস্তস্থিত লেখনি, এই সম্মুখস্থিত কাগজ যে প্রকার নিত্য-প্রত্যক্ষ, ঈশ্বর কি তেমনি নিত্য-প্রতক্ষ? যদি তাহা হয়, তবে সংসারে লোকে নাস্তিক হয় কেন, সন্দেহবাদী হয় কেন? কাগজ ও কলমের অস্তিত্বে সকলকে যেমন নিঃসন্দিহান দেখি, ঈশ্বর বিষয়ে ত তাহার বিন্দুমাত্রও দেখি না? ইহার উত্তরে আমি বলিতে চাই যে, আমার হস্তস্থিত লেখনি যেমন প্রত্যক্ষ, অন্যান্য পদার্থাদি চক্ষুর সমক্ষে যেমন প্রত্যক্ষ, এই ঈশ্বরের অস্তিত্ব ঠিক তেমনি প্রত্যক্ষ; তবে এত দৃষ্টি ভেদ কেন, কেহ দেখিতে পায়, কেহ দেখিতে পায় না কেন, সে কথা সবিস্তারে খুলিয়া বলিতেছি।

আমরা যাহা দ্বারা পদার্থের স্বরূপ অবগত হইতে পারি, তাহারা সকলেই সাধারণত ইন্দ্রিয় নামে অভিহিত না হইলেও, আমরা সুবিধার জন্য, তাহাদের সকলকেই ইন্দ্রিয় সংজ্ঞা দিব। পদার্থের রূপ রসাদি যেমন আমরা অনুভব করিয়া থাকি, লোকের স্নেহাদি গুণও আমরা তেমনি অনুভব করি। এই কারণে আমার সংজ্ঞায় ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা পাঁচটী অপেক্ষা অনেক অধিক হইয়া পড়িবে। যাহার যে ইন্দ্রিয়ের অভাব আছে, সে, পদার্থের বা ব্যক্তির সেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণ বিষয়ে সম্যক্ অজ্ঞ হয়। এমন প্রাণী আছে, ইন্দ্রিয়ের ন্যূনতা হেতু, যাহাদের নিকট এই জগৎ কেবলই শব্দময়, অথবা কেবলই স্পর্শময়। যদি আর একটী, দুই তিনটী ইন্দ্রিয়-বিশিষ্ট জীব তাহাকে বলে যে, এ জগৎ গন্ধময়ও বটে, তবে সে কি বুঝিবে? অন্ধের কাছে সুচিত্রিত চিত্রপট ধরিলে সে কি দেখিবে? ইত্যাদি,

ইত্যাদি। বহিরিন্দ্রিয় ছাড়িয়া অন্তরেন্দ্রিয়ের কথা বলি;—মনে করুন, এক জনের মনে পরহিত-সাধিনী-বৃত্তি (altruistic-feeling) নাই, শত বুদ্ধদেবের বক্তৃতায়ও কি সে, আত্মদানের সুখ ও মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে? গগনের থালে রবি চন্দ্র দেখিয়া নানক ঈশস্তুতি গাইয়াছিলেন, আবার সেই আকাশের চন্দ্র তারকা দেখিয়া, রামনারায়ণ বাবুর বিদূষক লুচি ও ম[illegible]রের চিন্তায় আকুল হইয়াছিলেন। প্রকৃতির সেই একই শোভা, বিষ্ণু বনচারী অসভ্যে[illegible]ছে তাহার শোভা কৈ, তোমার আমার মত মোটা (gross) লোকের কাছে তাহার কবিত্ব কৈ? আমরাও মনুষ্য, ওয়ার্ডসোয়ার্থও তাহাই; তবে আমরা কেন বাজার খরচ লইয়া ব্যস্ত, এবং প্রকৃতির শোভা বিস্মৃত, আর ওয়ার্ডসোয়ার্থ কেন আমাদের অবস্থা দেখিয়া দুঃখে গাইলেনঃ—

"To her fair works did nature link
The human soul that through me ran;
And much it grieved my heart to think
What man has made of man."

তুমি বলিবে, এসকল শিক্ষার ফল, অবস্থার ফল। আমি তাহা স্বীকার করি। কিন্তু যে প্রকারেই হউক, একটী বৃত্তি মনে না থাকিলে ত আর তদুপযোগী ভাব গ্রাহ্য হইতে পারে না? তুমি কি যুক্তি ও তর্ক দ্বারা সেই বৈজ্ঞানিককে মিল্টনের সৌন্দর্য্য বুঝাইয়া দিতে পার, যিনি সমগ্র মিল্টন পড়িয়া বলিয়াছিলেন যে, "What does it after all proves." ঐ যে হৃদয়হীন দার্শনিক, সূক্ষ্মবিশ্লেষণাস্ত্র হস্তে উপবিষ্ট, সন্তানবিয়োগ বিধুরার কাতরোক্তির ব্যাখ্যা যাঁহার কাছে স্বার্থ, অভ্যাস প্রভৃতির যোগফল, উঁহাকে তুমি মাতার প্রেমের ইতিহাস শুনাইয়া চোখের জল ফেলাইতে পারিবে কি? যে পৃথিবীতে যীশুখ্রীষ্ট ও চৈতন্যের পদধূলি, স্নিগ্ধতা ও সুবাস নাম ধারণ করিয়াছিল, আমরাও কি সেই পৃথিবীতে কন্টকবন সাজাইয়া বাস করিতেছি না? খ্রীষ্ট, চৈতন্য ও কেশবের চক্ষে এজগৎ ঈশ্বরের ছবি কেন ধরিয়াছিল, আর বাক্‌পটু বুদ্ধি-অভিমানী আমাদের চক্ষে এজগৎ শয়তানের বাসা কেন? তোমার কারণ-বাদের যুক্তি অনেক শুনিয়াছি, কিন্তু আমার মত লোকের কাছে সকলি ফক্কিকা বলিয়া বোধ হয়।

আরও শুন; আমরা উদারতার গুণে চূলচেরাই বলি, অথবা সোজা কথায় নিরেট বোকাই বলি, সাংখ্যকার হইতে স্পেন্সার পর্য্যন্ত, সন্দেহবাদীদিগের মুখপাত্রগণ সকলেই-(বুদ্ধি ও প্রতিভার অস্তিত্ব কল্পনা না হইলে) শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান এবং উজ্জ্বলপ্রতিভান্বিত। কেন এই প্রতিভাশালী মহাপুরুষগণ, ঈশ্বর সম্বন্ধে হয় অবিশ্বাসী, আর না হয় অপূর্ণ বিশ্বাসী, আর আমি এই গৌরবান্বিত প্রবন্ধ লেখক, সেই ঈশ্বর বিশ্বাসের বড়াই করি? ইহা সকলি অবস্থা ও ঘ[illegible]নার ফল। ঈশ্বর বিশ্বাসে ও অবিশ্বাসে, উভয়দিকেই সমান শীতল মস্তিষ্ক মানব সমাজের নেতাদিগের নাম করিতে পারা যায়। কাহারও যে, বুঝিবার ক্রটীতে অর্থাৎ মোটা বুদ্ধি বলিয়া ঐ গোল বাধিয়াছে, আমি ক্ষুদ্র কীট, সাহস করিয়া তাহা বলিতে পারি না। শুধু বলিতে পারি না, তাহা নহে, আদৌ তাহা নহেই। যে কারণে এক জন কবি, আর একজন জমাখরচ লেখক, সেই কারণেই একজন এই জগতের দিকে চাহিয়া

ঈশ্বরকে দেখে, আর একজন নাস্তিক হয়। তোমার কারণবাদ ও কৌশলের কোন যুক্তিতেই নাস্তিকের আস্তিক্যবুদ্ধি দিতে পারে না। যাঁহার জগতের কর্ত্তায় বিশ্বাস ও ভালবাসা আছে, কৌশলের যুক্তি তাঁহারই পক্ষে উপযোগী। নচেৎ আমি যেখানে কৌশল বলিব, নাস্তিক সেখানে অকৌশল দেখাইবে। একটী দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাক্। মনে কর, একজন বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন যে, ঈশ্বরের কি অপার দয়া, তিনি আমাদের জীবন ধারণের জন্য কত আয়োজন করিতেছেন। আর একজন হয়ত বলিবেন, উঃ! ঈশ্বর কি ভয়ানক নিষ্ঠুর, চারিদিকে দেখিতেছি, আমাদের বাঁচাইয়া রাখিবার আয়োজন, জীবন দুঃখময়, যত অধিক দিন বাঁচিব, ক্লেশ তত অধিক ভোগ করিব! ইত্যাদি, ইত্যাদি! এই জন্যেই লাউয়েল বলিয়াছেন, "In the matter of Art as in matters Divine, no truth can be discovered or appreciated if one is not in love with them."

আমরা এতক্ষণে যাহা বলিলাম, তাহা এই, ঈশ্বর দর্শনের স্বতন্ত্র ইন্দ্রিয় আছে। সেই ইন্দ্রিয় বা বৃত্তি বা ভাব যতক্ষণ পর্য্যন্ত লোকের হৃদয়ে অবস্থা ক্রমে ফুটিয়া না উঠে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ঈশ্বরতত্ত্ব বুঝিতে সে কিছুতেই পারিবে না। সহস্র দার্শনিক যুক্তি দেও, তোমার যুক্তি তাহার কাছে অলীক বোধ হইবে। আমি যদি সত্য সত্যই অন্ধ, তবে তুমি কোন্ যুক্তিদ্বারা বুঝাইয়া দিবে যে, আমার সম্মুখেরএই নব্যভারতের মলাটখানা নীলরং বিশিষ্ট? দার্শনিক যুক্তি না দিয়া, যাহাতে মনুষ্যের অন্তরে এই বৃত্তি (যাহাকে ম্যান্সেল্ প্রভৃতি Faith নাম দিয়াছেন) প্রস্ফুটিত হয়, তাহার চেষ্টা প্রয়োজনীয়। এপর্য্যন্ত এতৎ সাধনে যত উপায় দেখা গিয়াছে, তাহার মধ্যে নিজের দৃষ্টি পরিষ্কার করা, এবং নিজে যে কিছু দেখিয়াছি, তাহা বলাই [illegible] লিয়া মনে হয়। সত্য সত্যই কিছু দেখিলে, তাহার কথা বলিতে ভাষা এমন মূর্ত্তি ধারন করে যে, লোকের মনে অন্ততঃ একটা এই ভাব হয় যে, এই লোকটা সত্যই কিছু দেখিয়াছে। খ্রীষ্ট এই ভাষার কথা কহিয়াছিলেন বলিয়া চমকিত হইয়া চারিদিকের লোক বলিয়াছিল যে, এ নূতন প্রণালীতে কথা কহে, এবং এব্যক্তি Speaks with authority. কেশবচন্দ্র সেন এই ভাষার কথা কহিয়া বঙ্গদেশকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। হে দার্শনিক, তুমি নিশ্চয় জানিও, তিনি অপ্রমেয়, তোমার দাম্ভিক বিচার তাঁহাকে কখনও আয়ত্ব করিতে পারিবে না।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

নারীজাতির উচ্চশিক্ষা—ইয়ুরোপ।

নারীজাতির অধিকার বিষয়ক প্রশ্নের যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। পুরুষের ন্যায়, নারী বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ-শিক্ষা-লাভে সক্ষম হইবেন না কেন;—চিকিৎসাশাস্ত্র-অধ্যয়নের ও চিকিৎসা-ব্যবসায়-অবলম্বনের অধিকার প্রাপ্ত হইবেন না কেন;—পার্লেমেন্টের সভ্য মনোনীত হইবার এবং সভ্যনির্ব্বাচনকরিবার ক্ষমতা পাইবেন না কেন? —এবং বিচারক, উকীল, ও অধ্যাপক হইতে সমর্থ হইবেন না কেন?—ইয়ুরোপের সর্ব্বত্র এই আন্দোলন চলিতেছে। শুধু আন্দোলন চলিতেছে, এমন নহে; নারীগণ

অনেক স্থলে অভীষ্ট অধিকার লাভ করিয়াছেন। "গৃহকর্ম্ম ভিন্ন অপর বিষয়ে স্ত্রীজাতির অধিকার বা পারদর্শিতা লাভের ক্ষমতা নাই," যাঁহারা ইহা স্থির সত্য বলিয়া জানিয়া রাখিয়াছেন, সংসার আর অধিক দিন তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করিবে না। তাঁহারা সত্বর পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া পড়িবেন।

"মেয়ে জজ, মেয়ে উকীল, মেয়ে ডাক্তার, পার্লেমেণ্টের মেয়ে সভ্য!"—এ বড় নূতন ও হাস্যজনক কথা।" বড় নূতন বলিয়া একথা আরো কিছু দিন হাস্যজনক থাকিবে। বড় নূতন বলিয়া নারীর প্রস্তাবিত অধিকার-লাভ-চেষ্টা আরো কিছু দিন আপত্তি ও বিরোধীতা উপস্থিত করিবে। কিন্তু ভবিষ্যত্ আশঙ্কা-রহিত। ভবিষ্যতে স্ত্রীজাতির জয়লাভ নিশ্চিত।

যে কোন মত বা তত্ত্ব বড় নূতন, তাহাই প্রথম কিছু দিন উপহাসের বিষয়ীভূত থাকে। কলম্বস যখন, "আটলাণ্টিকের পর পারে স্থল আছে" এই বিশ্বাস প্রচার করেন, বড় বড় পণ্ডিতেরা তখন তাঁহাকে "ঘোর মূর্খ" বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন। নিউটন যখন আকর্ষণ-তত্ত্ব প্রচার করেন, "উহা অসম্ভব—কল্পনাতেই আসে না" বলিয়া অনেকে দীর্ঘকাল উহা অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। ষ্টিফেনসন যখন ঘোষণা করেন, "এমন যন্ত্র উদ্ভাবিত করিয়াছি যে তৎসাহায্যে বার মাইল পথ ঘণ্টায় চলিতে পারা যায়;" তখন পার্লেমেণ্টের গণনীয় সভ্যেরা পর্য্যন্ত বলিয়াছিলেন, "উহা কি হইতে পারে? ষ্টিফেন্সন বাতুল!" হোমিওপাথি আজও গোঁড়া অনভিজ্ঞদিগের বিদ্রূপের বিষয়। ডার্বিনের প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন-তত্ত্ব লইয়া আজও অনেকে বৃদ্ধা মাসী পিসীর ও তত্ত্বে পুরুষদিগের আমোদ জন্মাইয়া থাকেন। কিন্তু এ ভাব অল্পকালস্থায়ী। এখন আর কেহ নূতন মহাদ্বীপের অস্তিত্ব অস্বীকার করে না। এখন বালকেরাও নিউটনের আকর্ষণ-তত্ত্ব মানে। এখন কুলবধূরাও, বার মাইল পথ ঘণ্টায় চলা যায়, বিশ্বাস করে। আস্তে আস্তে হোমিওপাথি ও প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন তত্ত্বের প্রতি নিরপেক্ষ-বিচারক অভিজ্ঞ লোকদিগের আস্থা বাড়িতেছে। নারীজাতির অধিকার বিষয়ক প্রশ্ন সম্বন্ধেও সেইরূপ এখন ইহা পরিহাস ও তুমুল আপত্তির বিষয়ীভূত আছে—ও কিছু দিন থাকিবে। কিন্তু পরিণামে তাঁহাদের জয়লাভ হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

যে তিন মুখ্য বিষয়ে নারীর অধিকার লইয়া আন্দোলন চলিতেছে—উচ্চ শিক্ষা, চিকিৎসা-শাস্ত্রানুশীলন, এবং রাজনৈতিক অধিকার লাভ,—তাহার প্রথমটী সম্বন্ধে ইয়ুরোপে কোথায় কি হইয়াছে ও হইতেছে, তদ্বিষয়ে দুই চারিটী কথা বলা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

নরওয়ে।—১৮৮০ অব্দে এখানকার প্রথম কুলকন্যা প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হন। তিনি শিক্ষা-সচিবের নিকট বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করার অনুমতি প্রার্থনা করেন। দুই বৎসর পরে অনুমতি প্রদত্ত হয়। তখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম পরীক্ষা দানে কুলবালাদিগের অধিকার জন্মে নাই। বিগত বৎসর এই অধিকার দেওয়া হইয়াছে। এখানে নিয়ম আছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে কেহ বিচারক, ধর্ম্মযাজক, হাইস্কুলের-প্রিন্সিপাল, বা চিকিৎসক হইতে পারেন

না, সুতরাং নারীগণ এখন ঐ সমস্ত পদ লাভের অধিকারিণী হইয়াছেন।

ডেনমার্ক।—এখানে একটীমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় আছে। স্ত্রীলোকেরা তথায় ধর্ম্মবিজ্ঞান-ভিন্ন অপর সমস্ত শাস্ত্রে পরীক্ষা দিয়া উপাধিলাভ করিতে পারেন। গত বর্ষে ছয়টী কুলকন্যা চিকিৎসা-বিজ্ঞান, একটী দর্শন-শাস্ত্র, এবং তিনটী গ্রীক-লাটিন জর্ম্মন-ফ্রেঞ্চ-প্রভৃতি ভাষা অধ্যয়ন করিতেছিলেন।

সুইডেন।—এখানে ১৮৭০ অব্দে স্ত্রীজাতি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের প্রথম অধিকার প্রাপ্ত হয়েন। তদবধি আজ পর্য্যন্ত ৬০ টীর অধিক নারী প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। গত পূর্ব্ববর্ষে অপ্‌সালা বিশ্ববিদ্যালয়ে চারিটী কুলকন্যা বিজ্ঞান ও দর্শন এবং লণ্ড-নগরে দুইটী ও ষ্টকহলমে একটী কুলকন্যা চিকিৎসা-শাস্ত্র পাঠ করিতেছিলেন। বিদ্যোৎসাহী ধনিগণ ছাত্রীদিগের জন্যে তিনটী বৃত্তি স্থাপন করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারিণীদিগের সংখ্যা ক্রমে বাড়িতেছে।

রুসিয়া।—এখানে নারীদিগের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের অধিকার নাই। কিন্তু স্থানীয় লোকদিগের যত্নে ও উৎসাহে স্ত্রীশিক্ষার সুন্দর বন্দোবস্ত হইয়াছে। রুসিয়ার রাজধানী সেণ্টপিটর্সবর্গ নগরে, পুরুষদিগকে যে যে বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়, কুলকন্যারা তাহা শিখিবার অনুমতি পাইয়াছেন। অধীত বিষয় গুলি দুই ভাগে বিভক্ত (১) বিজ্ঞান এবং (২) সাহিত্য ও ইতিহাস। এই সকল বিষয় বিজ্ঞানের অন্তর্গত— শরীর-তত্ত্ব, উদ্ভিজ্জ-বিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, রসায়ন শাস্ত্র, পদার্থ বিদ্যা, ভূ-তত্ত্ব, খনিজ-বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, গণিত। গণিতের অতি উচ্চ শাখা সকল ও শিক্ষার বিষয়ীভূত। কৃষিতত্ত্ব শিখিবারও বন্দোবস্ত আছে। ছাত্রীরা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। বর্ষ শেষে প্রত্যেক শ্রেণীর পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। যাঁহারা শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন, তাঁহারা উপাধি পাইতে পারেন না, সার্টিফিকেট পান। ১৮৮২ অব্দে সার্টিফিকেটের জন্যে প্রথম পরীক্ষা গৃহীত হয়, তাহাতে ৬২ জন বিজ্ঞানের পরীক্ষায় এবং ৯১ জন সাহিত্য ও ইতিহাসের পরীক্ষায় কৃতকার্য্যতা লাভ করেন। প্রায় ৯০০ ছাত্রী প্রতিবৎসর সেণ্টপিটর্সবর্গ নগরে শিক্ষা লাভ করিতেছেন। ১৮৮২-৮৩ অব্দের প্রাথমিক পরীক্ষায় দুই সতের অধিক ছাত্রী উপস্থিত হইয়াছিলেন।

বেলজিয়ম।—এখানে নারীগণ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইতে পারেন। ব্রসেল্‌স্‌, লীজ, গেণ্ট—এ তিন নগরে ছাত্রীরা শিক্ষা লাভ করিতেছেন।

হলণ্ড।—এখানে চারিটী বিশ্ববিদ্যালয় আছে। চারিটীতেই নারীরা প্রবেশাধিকার পাইয়াছেন, এবং নানা বিষয় শিখিতেছেন।

সুইটজর্লণ্ড। এখানে জিনিবা-বিশ্ববিদ্যালয় আছে। তথায় যে যে বৎসর যত ছাত্রী যে বিষয়ে শিক্ষা পাইয়াছিলেন, তাহার তালিকা—

বর্ষ	বিজ্ঞান	চিকিৎসাশাস্ত্র	সাহিত্য
১৮৭৬-৭৭	১	০	০
১৮৭৭-৭৮	০	৪	০
১৮৭৮-৭৯	৩	২	০
১৮৭৯-৮০	৫	৪	০
১৮৮০-৮১	৬	৭	০
১৮৮১-৮২	৮	৬	০
১৮৮২-৮৩	১২	৮	১

১৮৮২ সন পর্য্যন্ত, বিজ্ঞানের পরীক্ষায় ৯ জন বি-এ উপাধি, এবং ১ জন চিকিৎসা-তত্ত্বে এম্-ডি উপাধি লাভ করিয়াছেন।

ইটালী।—এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে উন্মুক্ত। এখানে স্ত্রী-শিক্ষার যেরূপ উন্নতি হইয়াছে, ইয়ুরোপের অপর কোনস্থলে তেমন হয় নাই। এখানে অনেক "কুলকন্যা" এম্-ডি উপাধি, এবং অনেকে সাহিত্যাদি বিষয়ে "ডাক্তার" উপাধি-প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১৮৬১ অব্দে মিলান নগরে, এবং ১৮৬৬ অব্দে টিউরিন-নগরে, নারীদিগের জন্যে একটী উচ্চ-শ্রেণীর কালেজ স্থাপিত হইয়াছে। ১৮৮২ অব্দে রোম ও ফ্লরেন্স নগরে একটী করিয়া উচ্চ স্ত্রী-নর্ম্মালস্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; তথায় ১২টী গবর্ণমেন্ট বৃত্তি আছে।

স্পেন।—এদেশে স্ত্রীলোকেরা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিতে পারেন; কিন্তু চিকিৎসা-শাস্ত্রের পরীক্ষায় তাঁহা-দিগকে উপাধি দেওয়া হয় না, সার্টিফিকেট প্রদত্ত হইয়া থাকে।

ফ্রান্স।—এখানে এখনও নারী-জাতি উচ্চতম শিক্ষা লাভের অধিকার পান নাই। ১৮৮০ অব্দে সী-সাহেবের বিশেষ যত্নে যে আইন প্রচারিত হইয়াছে, তদ্দারা স্ত্রীশিক্ষার পথ, সম্পূর্ণরূপে না হউক, অনেক পরিমাণে প্রশস্ত হইয়াছে। এবং নারীগণ আশ্চর্য্য উৎসাহের সহিত শিক্ষা লাভে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ১৮৮২ অব্দে রুয়াঁ-নগরে তাঁহাদিগের জন্যে যে কালেজ প্রতিষ্ঠিত হয়, উহা খুলিবার পূর্ব্বদিনে ২০২ জন প্রবেশার্থিনী ছাত্রীর আবেদন পত্র আসিয়া পঁহুছে। এমিএন নগরে যে কালেজ আছে, তথায় প্রথম কয়েক মাসেই ৬০ জন দৈনিক ছাত্রী এবং ৪০ জন বোর্ডিং-ছাত্রী আসিয়া জুটে। লীয়ন-নগরের কালেজে অতি অল্প দিনের মধ্যে ৪০ জন ছাত্রীর নাম তালিকা-ভুক্ত হয়। মণ্ট-পেলিয়ে নামক স্থানের কালেজে প্রথম কতিপয় মাসে ৭৬ জন, এবং বর্ষশেষের পূর্ব্বে ১০০ জন শিক্ষার্থিনী সমবেত হয়; তাহার অল্প দিন পরে ছাত্রী সংখ্যা ১১২ হইয়া উঠে। সয়বন-নগরে স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইলে অল্প দিন মধ্যে তথায় ১৬৫ জন ছাত্রীর সমাগম হয়, ১৮৮১-৮২ অব্দে তাঁহাদের সংখ্যা ২৪৪ হইয়া দাঁড়ায়।

শিক্ষার্থিনীদের যেরূপ উৎসাহ দৃষ্ট হই-তেছে, গবর্ণমেণ্ট এবং ভিন্ন ভিন্ন মিউনি-সিপালিটীও তদ্রূপ উৎসাহের সহিত শিক্ষা বিস্তার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ১৮৮২ অব্দে গবর্ণমেণ্ট স্ত্রীবিদ্যালয় স্থাপনের জন্য এককোটী ফ্রাঙ্ক (৪২ লক্ষের অধিক টাকা) দান করেন। রুয়াঁর কালেজ স্থাপন জন্য স্থানীয় মিউনিসিপালিটী ৫ লক্ষ, এবং গবর্ণমেণ্ট ৫ লক্ষ ফ্রাঙ্ক দান করেন। সী-সাহেবের প্রাগুক্ত আইন প্রচলিত হওয়ার পর হইতে এ পর্য্যন্ত স্ত্রীশিক্ষার জন্য সেবর-নগরে একটী উচ্চ-শ্রেণীর নর্ম্মালস্কুল ও অন্যান্য স্থলে চারিটী কালেজ স্থাপিত হইয়াছে, অপর ২৬টী নগরে কালেজ স্থাপনের বন্দোবস্ত হইয়াছে এবং তদ্ভিন্ন ৩৮টী নগরে কালেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব চলিতেছে।

ইংলণ্ড।—স্ত্রীশিক্ষার নিমিত্তে এখানে যত বিদ্যালয় আছে, তন্মধ্যে নিউনহাম কালেজ ও গর্টন কালেজ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

আমরা শেষোক্ত বিদ্যালয়ের অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত বিবরণ লিখিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষা অতি আবশ্যক, বুঝিয়া, কতকগুলি বিশেষ উৎসাহী লোক, কেম্ব্রিজ-নগরের অনতিদূরে হিচিন নামক স্থলে ১৮৬৯ অব্দে একটী ক্ষুদ্র বাড়ীতে একটী ক্ষুদ্র কালেজ খুলেন। প্রথমে ছয়টী মাত্র ছাত্রী পাঠার্থিনী হয়েন। কেম্ব্রিজের অধ্যাপকগণ আসিয়া শিক্ষাদান করিতেন। ক্রমে ছাত্রী-সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। বর্ষশেষ পরীক্ষায় ছাত্রীদিগের উত্তর দেখিয়া পরীক্ষকগণ সন্তুষ্ট হইলেন। একটী ছাত্রী গণিতে দ্বিতীয় শ্রেণীর উপযুক্ত নম্বর পাইলেন, এবং অপর দুইটী গ্রীক ও লাটিন ভাষায় .Honors এর উপযোগী নম্বর লাভ করিলেন।

ক্রমে সেই ক্ষুদ্র বাড়ীতে আর ছাত্রী ধরে না। তখন কেম্ব্রিজ হইতে দুই মাইল দূরে গর্টন-গ্রামে কালেজের জন্য স্থান নেওয়া হইল, এবং গৃহ নির্ম্মাণ আরম্ভ হইল। বিশ জন ছাত্রীর সমাবেশ হয়, প্রথমত এরূপ গৃহ নির্ম্মিত হইল। বাগানের জন্ত ও খেলার জন্য স্থান থাকিল; এবং আবশ্যক হইলে গৃহটী বাড়াইতে পারা যায়, এরূপ বন্দোবস্ত রহিল। ১৮৭৩ অব্দের অক্টোবর মাসে ছাত্রীরা নূতন বাড়ীতে উঠিয়া আসিলেন। দেখিতে দেখিতে কয়েক বৎসরের মধ্যে পুনরায় স্থানাভাব হইয়া উঠিল, তখন (১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে) গৃহটী বাড়াইয়া, পঞ্চাশ জন ছাত্রীর সমাবেশ হয়, এরূপ করা গেল। তাহাতেও স্থান সঙ্কুলন হয় না। তখন পুনরায় বাড়াইয়া, গৃহটীকে, আশীজন পাঠার্থিনী স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারেন, এরূপ করা গিয়াছে।

ছাত্রীদিগের উৎসাহ বৃদ্ধির নিমিত্ত বস্ত্রবয়ন-কোম্পানি ৩টী, চর্ম্ম-ব্যবসায়-কোম্পানি ৩টী, বস্ত্রবিক্রয়-কোম্পানি ৩টী, এবং স্বর্ণকার-কোম্পানি ৩টী বৃত্তি স্থাপিত করিয়াছেন।

কেম্ব্রিজের ছাত্রদিগের যে যে বিষয় পড়িতে হয়, গর্টনের ছাত্রীদিগেরও তাহা অধ্যয়ন করিতে হয়। ছাত্রীরা ইচ্ছা করিলে কেম্ব্রিজে যাইয়া তথাকার লেকচর শুনিতে পারেন। তদ্ভিন্ন গর্টনেও অধ্যাপনার সুন্দর বন্দোবস্ত রহিয়াছে। অধ্যাপকগণ অত্যন্ত শ্রম সহকারে ছাত্রীদিগকে পড়াইয়া থাকেন। তাঁহাদের সহিষ্ণুতা আশ্চর্য্য। যাহাতে অধীয়মান বিষয় সুন্দর রূপে বোধগম্য হয়, তদ্বিষয়ে তাঁহারা কিছু মাত্র চেষ্টার ত্রুটি করেন না।

প্রত্যেক ছাত্রীর বৎসরে ৭০ পাউণ্ডের কিছু অধিক দিতে হয়। ইহাতে শিক্ষার ব্যয়, খাওয়ার ব্যয়, কেম্ব্রিজে যাওয়া আসার ব্যয়, সমস্ত সঙ্কুলন হয়। প্রত্যেক ছাত্রী দুটী করিয়া ঘর পান; একটী শয়নের, অপরটী বসিবার। প্রাতে ঈশ্বরোপাসনা হয়, বেলা ৯ টার সময়ে আহার হয়। আহারান্তে কালেজের অধ্যাপনা কার্য্য আরম্ভ হয়, ও ১২ টা বা ১টা পর্য্যন্ত চলিয়া থাকে। ১২টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত জলযোগের সময়। জলযোগের পর ইচ্ছানুসারে ছাত্রীরা বেড়ান, বা খেলা করেন। কেহ কেহ বা পাঠ করিয়া থাকেন। ব্যায়ামেরও বন্দোবস্ত আছে। সায়ংকালে ভোজন (ডিনর)। রাত্রি ৯ টার সময় চা-পান। ডিনরের সময়ে

যখন সমস্ত ছাত্রী বড় টেবিলের পার্শ্বে বসিয়া খান, এবং আহার, গল্প ও হাস্য-কৌতুক চলিতে থাকে, তখন দেখিলে বড় সুন্দর বোধ হয়। চা খাইবার জন্যে হলে সমবেত হইতে হয় না, ঘরে ঘরে চা দেওয়া হইয়া থাকে। এ সময়ে এক ছাত্রী অপর ছাত্রী বা শিক্ষয়িত্রীকে নিমন্ত্রণ করিতে পারেন। এইরূপ যে ৮।৯ টা ছাত্রীর সমাগম হয়, এবং কৌতুক পূর্ণ আলাপ বা তর্কবিতর্ক ও শাস্ত্রালোচনা হইয়া থাকে, ইহাতে যেমন আমোদ পাওয়া যায়, তেমনই শিক্ষা লাভ হয়।

কালেজে তর্ক-সভা, সঙ্গীত-সভা, এবং লন-টেনিশ রাকেট্‌স্ প্রভৃতি খেলিবার ক্লব, ও অন্যান্য সভা আছে। পুরুষেরা আসিতে পান না। পিতা বা অভিভাবক ভিন্ন কোন পুরুষ দর্শকের কালেজ-গৃহে আসিবার নিয়ম নাই।

গর্টন কালেজের স্থাপন অবধি এ পর্য্যন্ত দুই শতের অধিক ছাত্রী শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সার্টিফিকেট লাভ করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকে শিক্ষয়িত্রীর পদ অবলম্বন করিয়াছেন, বা গ্রন্থ রচনায় লিপ্ত হইয়াছেন, বা চিকিৎসা ব্যবসায়ের আশ্রয় লইয়াছেন; অপরেরা পরোপকার-ব্রতে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছেন। অনেকে বিবাহ করিয়াছেন। অবশিষ্টেরা গৃহে অপরবিধ কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া কাল যাপন করিতেছেন।

শ্রীশশিভূষণ দত্ত।

ঈশ্বর-বিশ্বাস ও আত্মপ্রত্যয়। *

আত্মপ্রত্যয় সম্বন্ধে অনেক মতভেদ। কাহারো কাহারো মতে আত্মপ্রত্যয় বলিয়া কোন বস্তু নাই, "আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ সত্য কিছু নাই, সমুদায় সত্যই ইন্দ্রিয়বোধ বা যুক্তি-সম্ভূত। কাহারো কাহারো মতে, যাহা কিছু ইন্দ্রিয়জ্ঞান বা যুক্তির অতীত, অথচ কোন না কোন প্রকারে তাঁহাদের বিশ্বাসের ভূমি অধিকার করিয়াছে, তাহাই আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ। এই দুই সীমান্তবর্ত্তী মতের মধ্যস্থলে বহুবিধ মত বর্ত্তমান। আমরা এই দুই মতের মধ্যে কোন মতেরই পক্ষপাতী নহে। আমরা বিশ্বাস করি যে,

* "নব্যভারতের" বিগত সংখ্যায় বাবু বিজয়চন্দ্র মজুমদারের লিখিত "উত্তর" শীর্ষক প্রবন্ধের প্রত্যুত্তরে এই প্রবন্ধ লিখিত হয় নাই, ইহার উদ্দেশ্য প্রশস্ততর। কিন্তু বিজয় বাবুর "উত্তরের" প্রত্যুত্তর দিবার জন্য আমি কোন প্রবন্ধ লিখিতে ইচ্ছা করি না, অথচ তদ্বিষয়ে কিছু বলিবার আছে, সুতরাং এই নোটে বলিতে বাধ্য হইলাম। বিজয় বাবু তাঁহার "উত্তরের" শেষ ভাগে যে নিবেদন করিয়াছেন, আশা করি এস্থলে আমার কিছু বলাতে তাহার বিরুদ্ধাচরণ হইবে না; কেননা আমি তাঁহার প্রবন্ধের ঠিক সমালোচনা করিতেছি না। আমি বিজয় বাবুর "উত্তরের" প্রত্যুত্তর দিতে চাই না এই জন্য যে, তাঁহার "উত্তর" প্রকৃত অর্থে উত্তর নহে; ইহাকে "পুনরুক্তি" বা "আংশিক পুনরুক্তি" বলিলে যথার্থতর নামে অভিহিত করা হয়। পাঠক আমার "ঈশ্বর বিশ্বাস ও দার্শনিক যুক্তি" নামক প্রবন্ধ ও বিজয় বাবুর "উত্তর" এক সঙ্গে পড়িলেই দেখিবেন, আমার অনেক কথা এবং যুক্তির কিছুই উত্তর দেওয়া হয় নাই; কেন দেওয়া হয় নাই, জানি না। বিজয় বাবুর প্রত্যাশিত প্রবন্ধে যে সে সকল কথার উত্তর থাকিবে তাহারও আশা নাই, কেননা সে প্রবন্ধের বিষয় হইবে—আত্ম প্রত্যয় ও যুক্তির ভূমির অতীত ঈশ্বর বিশ্বাসের ভিত্তি। সেই প্রত্যাশিত প্রবন্ধের আমি কোন সমালোচনা করিতে চাহিনা। বিজয়বাবু যে

আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ সত্য কতকগুলি আছে, অথচ যাহা কিছু সংযুক্তি দ্বারা প্রমাণ করা যায় না, অথচ লোকে বিশ্বাস করে অথবা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করে, তাহাকেই আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ বলিতে প্রস্তুত নই। আত্মপ্রত্যয় সম্বন্ধে বিস্তৃত সর্ব্বাঙ্গীন্ আলোচনা এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। ঈশ্বর-বিশ্বাসের সহিত সাক্ষাৎ ও অসাক্ষাৎ ভাবে সংবদ্ধ যতকগুলি আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ সত্য আছে, তাহা সংক্ষেপে দেখানই এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। সাময়িক পত্রের প্রস্তাব অবিশ্বাসীকে বিশ্বাসী করিবে, নাস্তিককে আস্তিক করিবে, জড়বাদীকে অধ্যাত্মবাদী করিবে, সন্দেহজড়িত মনকে সন্দেহ-মুক্ত করিবে, জ্ঞানপিপাসুর পিপাসা নিবৃত্ত করিবে, এরূপ আশা দুরাশা মাত্র। ইহাতে যদি আগ্রহশীল পাঠকের মনে একটুও সত্যানুসন্ধান জন্মাইয়া দিতে পারে, জ্ঞান পিপাসুর হৃদয়ে একটীও চিন্তার স্রোত খুলিয়া দিতে পারে, তবেই যথেষ্ট হইল।

যে সত্য বাহ্য বা অন্তরেন্দ্রিয় দ্বারা লাভ করা যায় না, যাহা যুক্তি দ্বারাও প্রমাণিত হয় না, তাহাকেই আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ সত্য বলি: এই নাম আপত্তিকর হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না, অর্থটা স্মরণ থাকিলেই হয়। এখন জিজ্ঞাস্য এই, এরূপ সত্য যদি কিছু থাকে, তবে তাহার লক্ষণ কি? লোকে যাহা কিছু ইন্দ্রিয়াতীত ও যুক্তির অতীত বিষয়ে বিশ্বাস করে, তাহাই কি আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ সত্য? স্পষ্টভাবে একথা বলিবে এরূপ লোক আছে কি না সন্দেহ; কিন্তু কার্য্যত অনেকেরই এই মত। অপরের বিশ্বাসের বেলায় যাহাই হউক, নিজের পোষিত বিশ্বাস সম্বন্ধে অনেককেই কার্য্যত এই মতের আশ্রয় লইতে দেখা যায়। বলা বাহুল্য যে, এরূপ মতের কোন মূল্যই নাই। তর্কে হারিলেই যদি আত্মপ্রত্যয়ের দোহাই দিয়া নিস্তার পাওয়া যায়, তবে জ্ঞান ও কুসংস্কার, সত্য ও কল্পনা, আলোক ও অন্ধকারের মধ্যে কিছুই প্রভেদ থাকে না। তবে আর একেশ্বরবাদী

বিশ্বাসের মূল দেখাইবেন, তাহা আমার পক্ষে সন্তোষকর না হইলেও যদি অপরের পক্ষে সন্তোষকর হয়, যদি তাহাতে কোন হৃদয়ে ঈশ্বর বিশ্বাসকে জীবিত রাখিতে পারে, তাহা হইলে তাহার বিরুদ্ধে আমি কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না। আত্মপ্রত্যয় ও যুক্তিতেও ঈশ্বর-বিশ্বাস প্রমাণিত হয়, ইহা দেখানই আমার মূল উদ্দেশ্য। ২। ১টী অবান্তর কথা সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিব, কেননা তাহা বলিবার আর সুবিধা পাইব না; তার জন্য কিছু স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লেখা যায় না। (১) আমি নিজেকে "চিন্তাশীল ও ধর্ম্মানুরাগী" কখনও বলি নাই, আমার মুখে এরূপ কথা তুলিয়া দেওয়া বিজয় বাবুর পক্ষে সুরুচিসঙ্গত হয় নাই। (২) নগেন্দ্র বাবুর অভিজ্ঞতা ও ভক্তি প্রচার এবং আমার "Gleams of the New Light" ও "সাধন বিন্দুর" উল্লেখ "অবলম্বিত স্বীয় প্রচার প্রণালীর" পরিচয় দিবার জন্যই করা হইয়াছিল, আমি এবিষয় ভুল বুঝি নাই। আশ্চর্য্য যে কেশব বাবু প্রভৃতির প্রচার প্রণালী যে নগেন্দ্র বাবু প্রভৃতির প্রচারপ্রণালীর সঙ্গে একরূপ, তাহা বিজয় বাবু এখনো স্বীকার করিতেছেন না। উভয় দিকেই যুক্তি এবং "ধর্ম্মাভিজ্ঞতা প্রদর্শন" আছে, তবে প্রভেদ কোথায়? (৩) ডাঃ মার্টিনোর প্রচার প্রণালী কেবল "দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক যুক্তি" নহে; তিনি তাঁহার "Endeavours after the Christian Life" ও "Hours of Thought" দ্বারা যে গভীর "ধর্ম্মাভিজ্ঞতা প্রদর্শন" করিতেছেন, বিজয় বাবু কি তার কিছুই জানেন না? (৪) কারণবাদ সম্বন্ধে বিজয় বাবু যাহা বলিয়াছেন, পাঠক তদ্বিষয়ে প্রসঙ্গ ক্রমে বর্ত্তমান প্রবন্ধে অনেক কথা পাইবেন।

ও বহুদেববাদী, পৌত্তলিক ও নিরাকারোপাসক, অভ্রান্তশাস্ত্রবাদী ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতাবাদী, অনন্ত নরকবাদী ও বিশ্বজনীন-মুক্তিবাদী, ইহাদের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ থাকে না। এমন কুসংস্কার অল্পই আছে, যাহা আত্মপ্রত্যয়ের দোহাই দেয় নাই। যদি কল্পনা, অজ্ঞানতা-প্রসূত কুসংস্কার ও আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ সত্যের মধ্যে কোন প্রভেদ থাকে, তবে আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ সত্যের একটী সাধারণ লক্ষণ থাকা প্রয়োজন। সে লক্ষণ কি?

বর্ত্তমান সময়ের আত্মপ্রত্যয়-বাদীদিগের মধ্যে অন্যান্য বিষয়ে অনেক মতভেদ সত্ত্বেও, একটী বিষয়ে অনেকটা ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকেরই মত যে, আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ সত্যের লক্ষণ—বিপরীতের অভাবনীয়তা বা অচিন্তনীয়তা (Inconceivability of the Opposite.) যে বিশ্বাস ইন্দ্রিয়জ্ঞান আত্মদৃষ্টি এবং যুক্তির অতীত, অথচ যাহার বিপরীত মত আদবে চিন্তাই করা যায় না, তাহাই আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ সত্য। এরূপ লক্ষণাক্রান্ত যাহা নহে, সে বিশ্বাসের সত্যতার কোন প্রমাণ নাই। কিঞ্চিৎ চেষ্টা করিলেই কুযুক্তি বা লোকপরম্পরাগত কিংবদন্তিতে তাহার মূল বাহির করা যায়। যে বিশ্বাস অনতিক্রমনীয় নহে, যাহা ইচ্ছা করিলেই তাড়ান যায়, যাহার বিপরীত স্বচ্ছন্দেই ভাবা যায়, তাহার সত্যতার প্রমাণ কোথায়? তাহা সন্দেহের অতীত হইল কৈ? আবার, অপর দিকে, যাহা অতিক্রম করিতে পার না, যাহার বিপরীত ভাবিতেই পার না, তাহাকে অতিক্রম করিবার চেষ্টা নিতান্তই অনর্থক। ইহার মূল খুঁজিয়া না পাইতে পার, কিন্তু ইহার সত্যতায় তোমাকে কথায় না হউক, কার্য্যে বিশ্বাস করিতেই হইবে। বর্ত্তমান সময়ে এই মতের সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ পরিপোষক হার্বার্টস্পেনসার। নাস্তিক আস্তিক, বিশ্বাসী সন্দেহবাদী, আত্মপ্রত্যয়বাদী আত্মপ্রত্যয়-বিরোধী, সকলেই এই মতের সাক্ষাৎ বা অসাক্ষাৎ সাক্ষী, কেননা যে সকল বিশ্বাসের বিপরীত অচিন্তনীয়, তাহা কেহই কার্য্যকালে অতিক্রম করিতে পারে না। সুপ্রসিদ্ধ সন্দেহবাদী হিউম বলিতেন, "আমার নির্জ্জন প্রকোষ্ঠ ছাড়িয়া জনসমাজে আসিলে আমার সমুদায় যুক্তিতর্ক ব্যর্থ হইয়া যায়, কেননা তখন অলৌকিক লৌকিক বিশ্বাস সমূহেও আমি বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারি না।" আমরা দুটী আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ সত্যের দৃষ্টান্ত দিতেছি, পাঠক দেখুন দেখি ইহাদের বিপরীত ভাবিতে পারেন কি না। (১) প্রত্যেক কার্য্যেরই কারণ আছে, (২) দুই সরলরেখা স্থান বেষ্টন করিতে পারে না। এই বিশ্বাস দ্বয় যে বাহ্য বা অন্তরেন্দ্রিয়ের অথবা যুক্তির বিষয় নহে, তাহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। আমরা আমাদের দৃষ্ট কার্য্য মাত্রেরই কারণ দেখিয়া থাকিতে পারি, কিন্তু তাহা হইতে এরূপ সার্ব্বভৌমিক ও অবশ্যম্ভাবী বিশ্বাসে কখনই উপস্থিত হওয়া যায় না যে, আমাদের প্রত্যক্ষীভূত বা অপ্রত্যক্ষীভূত কার্য্য মাত্রেরই কারণ আছে, অথচ আমরা তাহাই বিশ্বাস করি; যিনি তর্ক দ্বারা এই বিশ্বাস উড়াইয়া দিতে চান, তিনিও কার্য্যকালে ইহা বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারেন না; এই বিশ্বাস আমাদের খাওয়া শোওয়া, লেখা পড়া, কথাবার্ত্তা, চলা বসা—সমুদয় দৈনন্দিন জীবনের ভিত্তিভূমি। দ্বিতীয়

বিশ্বাসটীও তেমনিই ইন্দ্রিয় জ্ঞান ও যুক্তির অতীত, অথচ সর্ব্বোভৌমিক ও অবশ্যম্ভাবী। আমাদের প্রত্যক্ষীভূত সমুদয় সরলরেখা স্থান বেষ্টনে অক্ষম হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাতে প্রমাণ হইতেছে না যে, এমন কোন দুটী সরল রেখা থাকিতে পারে না যাহারা স্থান বেষ্টনে সক্ষম; কিন্তু আমাদের বিশ্বাস তাহাই। আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না যে কোন স্থানে, কোনকালে দুটী সরল রেখা স্থানবেষ্টন করিতে পারে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সন্দেহ-রুগ্ন দার্শনিকগণ এরূপ স্পষ্ট সত্যের ও অবশ্যম্ভাবিতা অস্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

কিন্তু এই যে "বিপরীতের অভাবনীয়তা" রূপ আত্মপ্রত্যয়ের লক্ষণ, ইহাতেও কিঞ্চিৎ অপরিপক্কতা আছে। ইহা অনেকস্থলে সত্য-নির্ণায়ক হইলেও, ইহাকে একেবারে অভ্রান্ত লক্ষণ বলিতে পারি না। কেহ কেহ বলেন, বিপরীতের অভাবনীয়তা জ্ঞানের অভাব বা ভাবযোগের দৃঢ়তা হইতে উৎপন্ন হইতে পারে; যেস্থলে এরূপ হয়, সেস্থলে একটা বিশ্বাসের বিপরীত অভাবনীয় হইলেও সে বিশ্বাসকে সত্যমূলক বিশ্বাস বলিতে পারি না। দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছি। এমন এক সময় ছিল, যখন পৃথিবী শূন্যে থাকিতে পারে, পৃথিবীর দুই বিপরীত দিকে দুই স্থান থাকিতে পারে, (antipodes) ঘূর্ণায়মান পৃথিবী-পৃষ্ঠে মানুষ স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে, এই সমুদায় সত্য অধিকাংশের পক্ষে অভাবনীয় ছিল,কিন্তু এখন আর নাই,জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অভাবনীয়ও ভাবনীয় হইয়া উঠিয়াছে। তখনকার লোকেরা "বিপরীতের অভাবনীয়তার" দোহাই দিয়া যদি বলিত যে "পৃথিবী শূন্যে থাকিতে পারেনা," "antipodes থাকা অসম্ভব," "ঘূর্ণায়মান পৃথিবী পৃষ্ঠে মানুষ দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না" এই সমুদায় আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ অবশ্যম্ভাবী সত্য,তাহা হইলে কি তাহাদের কথা সত্যমূলক হইত? স্পষ্টতই না। আবার ভাবযোগের এমনই দৃঢ়তা যে, অগ্নি সংযোগে সর্ব্বদাই বস্তু দগ্ধ হয়, উপযুক্ত পরিমাণ অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন সংযোগে নিত্যই জলের সৃষ্টি হয়, পৃথিবী সর্ব্বদাই বস্তু আকর্ষণ করে, উত্তাপ সংযোগে বস্তু সমূহ নিত্যই প্রসারিত হয়, এই সমুদায় দেখিয়া অনেক দার্শনিকেরও বিশ্বাস জন্মিয়া গিয়াছে যে,এই সমুদায় ঘটনা অবশ্যম্ভাবী,—ইহাদের বিপরীত অভাবনীয়; অথচ সকলের পক্ষে তাহা ঠিক নহে, অনেকে ইহাদের বিপরীত স্বচ্ছন্দেই ভাবিতে পারে। এই সমুদায় আপত্তির সম্পূর্ণ বিচার আমরা এখন করিতে চাই না; কিন্তু ইটা বেশ স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, "বিপরীতের অভাবনীয়তাকে" মূলসত্যের অভ্রান্ত লক্ষণ বলিয়া স্বীকার করাতে অনেক বিঘ্ন আছে; জ্ঞানের পরিমাণ অনুসারে, ভাবযোগের দৃঢ়তা ও শিথিলতা অনুসারে "ভাবনীয়তা" "অভাবনীয়তার"ও তারতম্য হয়; সুতরাং এই লক্ষণ দ্বারা বিচার করিতে গেলে অনেক কুসংস্কার ও আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ সত্যের সম্মান পাইতে পারে। তবেই "বিপরীতের অভাবনীয়তাকে" আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ সত্যের অভ্রান্ত লক্ষণ বলা যাইতে পারে না।

সুতরাং আর এক পদ অগ্রসর হইতে হইল। কাহারো কাহারো মতে আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ সত্যের লক্ষণ "বিপরীতের

আত্ম-বিরোধিতা" (contradictoriness of the opposite.) আমরা এই মতেরই পক্ষপাতী। এই লক্ষণ অভ্রান্ত। এই পরীক্ষা চূড়ান্ত, ইহাতে প্রবঞ্চিত হওয়া অসম্ভব। এই লক্ষণটী স্পষ্টরূপে বুঝাইতেছি। তর্কশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির মাত্রেই Law of Identity, Law of Contradiction, Law of Excluded Middle নামক চিন্তার মৌলিক নিয়ম ত্রয়ের বিষয় জানেন; আমরা সাধারণ পাঠকের জন্য প্রথম দুটী নিয়ম দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছি। প্রথম নিয়ম এই—

যাহা আছে তাহা আছে
অথবা—যাহা...হয় তাহা...হয়
দৃষ্টান্ত—যাহা কাল" তাহা কাল"
২য় দৃ—যাহা গোল" তাহা গোল"

এই নিয়মের সত্যতা সম্বন্ধে বোধ হয় আর কিছু বলিতে হইবে না; ইহাতে সন্দেহ করা দূরে থাক্, ইহার সরলতা দেখিয়া হয়ত অনেক পাঠক হাস্য করিবেন এবং বলিবেন, ইহা আবার কি কাজে লাগিবে? তাহা পরে দেখিবেন। যাহা হউক, এই নিয়মের মর্ম্ম এই যে, subject এ যাহা কিছু বুঝায়, (স্পষ্টরূপেই হউক, আর গূঢ়রূপেই হউক) তাহা predicate এ উল্লিখিত হইলে অবশ্যই সত্য হইবে। আর একটী দৃষ্টান্ত লওয়া যাক্—"বৃত্ত মাত্রেরই কেন্দ্র আছে," এই বাক্যটী সম্পূর্ণরূপেই উক্ত নিয়মের অনুযায়ী; "বৃত্ত" কথাটীতে কেন্দ্রের স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও আমরা জানি "বৃত্ত" বলিলেই কেন্দ্রশালী বুঝায়, কেন্দ্রশূন্য বৃত্ত অর্থহীন; সুতরাং subject এর সংজ্ঞায় যাহা সংবলিত আছে, তাহা স্পষ্টরূপে predicate এ উল্লিখিত হইলে তাহা অবশ্যই সত্য হইবে। অতঃপর দ্বিতীয় নিয়মের উল্লেখ করা যাইতেছে—

যাহা আছে তাহা নাই হইতে পারে না।
অথবা যাহা হয় তাহা নয় হইতে পারে না।
দৃষ্টান্ত—যাহা কাল" তাহা কাল নয় হইতে পারে না।
যাহা গোল"তাহা গোল-নয় হইতে পারেনা।

অর্থাৎ নিয়মটীর মর্ম্ম এই যে, এক স্থানে, এককালে, একই বস্তু বিপরীত গুণাক্রান্ত হইতে পারে না। [পাঠক "বিবিধ" ও "বিপরীতে" গোল করিবেন না] অথবা—যাহা subject এর সংজ্ঞায় স্পষ্টরূপেই হউক আর অস্পষ্টরূপেই হউক সংবলিত আছে, তাহার বিপরীত কথা predicate এ উক্ত হইতে পারে না। একখানা কাগজের কতক কাল থাকিতে পারে, কতক শাদা [কাল-নয়] থাকিতে পারে; একই টুকরা কাগজ এক সময় শাদা [কাল-নয়] থাকিতে পারে, অন্য সময়ে উহাকে কাল করা যাইতে পারে, কিন্তু একই টুকরা কাগজ একই সময়ে কাল এবং শাদা [কাল-নয়] হইতে পারে না। একটী বস্তু কখনো উষ্ণ কখন ও শীতল [উষ্ণ-নয়] হইতে পারে, অথবা একই সময়ে এক হাতে উষ্ণ, আর এক হাতে শীতল [উষ্ণ-নয়] বোধ হইতে পারে, কিন্তু একই সময়ে, একই হাতে উষ্ণ এবং শীতল [উষ্ণ-নয়] হইতে পারে না। অধিক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন বাহুল্য মাত্র। এই মৌলিক নিয়মের যাথার্থ্য সকলেই স্বীকার করিবেন; ইহা স্বীকার না করিলে হাঁ না, সত্য অসত্য, জ্ঞান অজ্ঞানতার কিছুই প্রভেদ থাকে না।

পাঠক এখন সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, যে কোন বিশ্বাস উক্ত নিয়মদ্বয়ের অনুযায়ী তাহা সত্য না হইয়া পারে না, এবং যে কোন বাক্যে উক্ত নিয়মদ্বয় ভঙ্গ হইয়াছে, তাহা মিথ্যা না হইয়া পারে না। আর একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি—আমি বলিলাম যে, এমন হইতে পারে যে আমাদের দৃষ্টির অতীত কোন সরল রেখাদ্বয় স্থান বেষ্টন করিতে পারে। এই প্রস্তাব (proposition) দ্বিতীয় নিয়মের বিরোধী, সুতরাং ইহা কখনই সত্য হইতে পারে না। দুটী রেখাকে স্থান বেষ্টন করিতে হইলেই তাহাদিগকে বাঁকা অর্থাৎ অসরল হইতে হইবে, দুটী রেখার স্থান বেষ্টনের আর কোন অর্থই নাই; সুতরাং "দুটী সরল রেখা স্থান বেষ্টন করিতে পারে," ইহার প্রকৃত অর্থ—"সরল রেখা অসরল হইতে পারে" ইহা অসম্ভব; সুতরাং উক্ত প্রস্তাব অবশ্যই অসত্য এবং ইহার বিপরীত অর্থাৎ "দুই সরল রেখা স্থান বেষ্টন করিতে পারে না" এই প্রস্তাব সত্য। এই বাক্যের সত্যতার প্রমাণ প্রথম নিয়ম; সরল রেখার সংজ্ঞার ভিতরেই স্থান বেষ্টনের অসামর্থ্য নিহিত রহিয়াছে; subject এ যাহা প্রচ্ছন্ন আছে, predicate এ তাহাই প্রকাশিত হইয়াছে।*

এখন আমরা দেখাইব যে, ঈশ্বর-বিশ্বাসের সহিত সাক্ষাৎ বা অসাক্ষাৎভাবে সংসৃষ্ট কতকগুলি বিশ্বাস আছে, যাহারা উক্ত মৌলিক নিয়ম দ্বয়ের অনুযায়ী। যদি তাহাই হয়, তবে ঐ সকল বিশ্বাসকে আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধমূল সত্য বলিতে বোধ হয় কাহারো আপত্তি থাকিবে না। যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, ঐ সকল মত অনতিক্রমনীয় সত্যরূপে গৃহীত হইলেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। একটী বক্তব্য এই যে, স্পষ্টরূপে প্রস্তাব গুলির অর্থ বুঝার উপরেই সমস্ত নির্ভর করে। আমাদের বিশ্বাস যে, যে সকল বিশ্বাস আত্মপ্রত্যয় সিদ্ধ তাহা একবার স্পষ্টরূপে বুঝিলে অস্বীকার করা অসম্ভব; অধিকাংশ সন্দেহ অবিশ্বাসের কারণ অর্থ বোধ সম্বন্ধে গোলমাল। যাহা হউক, উল্লিখিত বিশ্বাস গুলি একে একে উল্লেখ করিয়া আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি যে, উহারা অবশ্যম্ভাবী মূল সত্য।

১। জড় মাত্রই আত্মার জ্ঞানাধীন (Dependent on perception)

কোন কোন পাঠক বলিবেন, যাহা লইয়া দার্শনিকদিগের মধ্যে এত বিবাদ, তাহাকেই আমরা আত্ম-প্রত্যয় সিদ্ধ মূল সত্য বলিতেছি, এ কেমন! ইহার উত্তরে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, লৌকিক ভাষায় যাহাকে জড় বলে, সেই জড়ের সম্বন্ধে আধুনিক দার্শনিকদিগের প্রায় কিছুই মত ভেদ নাই; সাধারণ লোকের অবোধ্য, ইন্দ্রিয়াতীত জড়াধার সম্বন্ধেই যত মতভেদ। যাহা হউক, মত ভেদের কথায় এখন বিশেষ প্রয়োজন নাই। আমাদের উল্লিখিত প্রস্তাবটী আমরা বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি। জড়ের লৌকিক অর্থ—ইন্দ্রিয় জ্ঞানের সাক্ষাৎ বিষয়; যাহা কিছু ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করা যায় তারই নাম জড়; আমরাও এই অর্থেই জড় বলিয়াছি। আচ্ছা, ইটি সকলেই স্বীকার করিবেন যে, ইন্দ্রিয় জ্ঞান না হইলে আমাদের জড়ের কোন ভাবই

* পাঠকদিগের মধ্যে কেহ ক্যাণ্ট-শিষ্য থাকিলে হয়ত এই দৃষ্টান্ত আপত্তিকর মনে করিবেন। আমরা ক্যাণ্ট-শিষ্য নহি।

(idea) হইত না, যাহা কিছু জড়ের ভাব তাহা ইন্দ্রিয় জ্ঞান হইতেই ; অন্ধের কাছে বর্ণ কিছুই নয়, বধিরের কাছে শব্দ কিছুই নয়, স্পর্শশক্তি-বিরহিতের কাছে উষ্ণতা শীতলতা, কিছুই নয় । ইন্দ্রিয় জ্ঞান হইতেই জড়ের ভাব পাই । ইন্দ্রিয় জ্ঞান আমাদিগকে জড়ের কি ভাব দেয় ? জড়ের অর্থ কি ? জড়ের অর্থ ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞাত বস্তু, জড়ের অর্থ দৃষ্টবস্তু, শ্রুত বস্তু, স্পৃষ্ট বস্তু ইত্যাদি ; ইহা ব্যতীত জড়ের ভাব আমাদের কিছুই নাই ; অন্য কোন জীবের যদি থাকে, তার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নাই । আমরা জড় বলিতে বুঝি, দৃষ্ট, শ্রুত, স্পৃষ্ট ইত্যাদি, সংক্ষেপতঃ—জ্ঞাত । কিন্তু "জ্ঞাত" অর্থই "আত্মার জ্ঞানাধীন', সুতরাং "জড় মাত্রই আত্মার জ্ঞানাধীন" এই প্রস্তাব উপরোক্ত প্রথম নিয়মাধীন, ইহার subject এ যাহা নিহিত আছে তাহাই predicate এ প্রকাশিত হইয়াছে, সুতরাং ইহা একটী অবশ্যম্ভাবী সত্য । ইহাকে অস্বীকার করিতে যাও, ইহার বিপরীত মত মানিতে যাও, দেখিবে তাহাতে দ্বিতীয় নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ হইবে । দেখা যাক্ । কেহ বলিলেন, 'কেন ?—জড় আত্মার জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র রূপেও থাকিতে পারে, অর্থাৎ জড় অজ্ঞাত অবস্থায়ও থাকিতে পারে ।' কিন্তু জড় অর্থই —'জ্ঞাত বস্তু' সুতরাং কথাটা এই দাঁড়াইতেছে যে 'জ্ঞাত বস্তু অজ্ঞাত হইতে পারে" ইহাতে দ্বিতীয় নিয়ম স্পষ্টই ভঙ্গ হইতেছে, সুতরাং ইহা কখনই সত্য হইতে পারে না ।

২ । জড়জগৎ কোন নিত্য জ্ঞানের অধীন ।

জড়জগৎ কখনো আমাদিগের নিকট প্রকাশিত, কখনো আমাদিগের হইতে লুক্কায়িত হইতেছে, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস যে জড় জগতের অস্তিত্ব আমাদের জ্ঞানের উপর নির্ভর করে না, আমরা যখন ইহাকে জানি তখনই যে ইহার উৎপত্তি, এবং যখন জানি না তখনই ইহার বিলয়, ইহা আমরা বিশ্বাস করি না ; এই বিশ্বাসের মূল এখন অন্বেষণ করিবার প্রয়োজন নাই ; এই বিশ্বাস সকলেরই আছে ; আমরা বিশ্বাস করি যে, জড় জগৎ আমাদের জ্ঞাননিরপেক্ষভাবেও থাকিতে পারে । কিন্তু জড় জগৎ অর্থই—"জ্ঞাত জগৎ" অর্থাৎ জ্ঞানাধীন জগৎ ; সুতরাং আমাদের জ্ঞানাধীন না হইলেও ইহা একটী নিত্য জ্ঞানের অধীন, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইতেছে । ইহা অস্বীকার করিলে যে দ্বিতীয় নিয়ম ভঙ্গ হয়, তাহা দেখান বাহুল্য মাত্র । এই নিত্য জ্ঞানের নামই ঈশ্বর ।

৩ । বিষয়ী মাত্রই বিষয়-সংসৃষ্ট ।

'বিষয়ী' অর্থ যে জানে, জ্ঞাতা ; 'বিষয়' অর্থ যাহা জানা যায়, জ্ঞাত । জ্ঞানকার্য্য হইতেই বিষয় ও বিষয়ীর পরিচয় ; জ্ঞানের সম্বন্ধেই 'বিষয়' ও 'বিষয়ী' অর্থযুক্ত, জ্ঞানের বাহিরে 'বিষয়' ও 'বিষয়ী' অর্থশূন্য ; সুতরাং জ্ঞানের ভূমি ছাড়িয়া আমরা 'বিষয়' 'বিষয়ীর' সংজ্ঞা করিতে পারি না । জ্ঞানের ভূমিতে বিষয় বিষয়ীর এই পরিচয় পাই যে বিষয়ী জ্ঞাতা, বিষয় জ্ঞাত । জ্ঞাতারই অপর নাম বিষয়ী, জ্ঞাতেরই অপর নাম বিষয় । সুতরাং অজ্ঞাতা বিষয়ী [এবং অজ্ঞাত বিষয়] থাকিতে পারে না, জ্ঞান শূন্য আত্মা থাকিতে পারে না ; জ্ঞানশূন্য আত্মা থাকিতে পারিলে আত্মা আর জড়ে কোন প্রভেদ থাকিত না । অত-

এব বিষয়ী মাত্রই জ্ঞাতা হওয়া চাই ; কিন্তু 'জ্ঞাতা' বলিলেই বিষয়-সংসৃষ্ট বুঝায়, কেননা 'জ্ঞাতা' অর্থ 'যে জানিতেছে ;' কি জানিতেছে ?—একটা কিছু জ্ঞানের বিষয় অবশ্যই থাকা চাই। সুতরাং বিষয়ী মাত্রেই বিষয়-সংসৃষ্ট। 'বিষয়-সংসৃষ্ট' কথাটা পাঠক ভুল বুঝিবেন না, 'বিষয়-সংসৃষ্ট' অর্থ 'শরীর যুক্ত' নহে, 'বিষয় সংসৃষ্ট' অর্থ—যাহার জ্ঞানাধীনে বিষয় আছে। উপরোক্ত প্রস্তাবটী যে প্রথম নিয়মাধীন একটী মূল সত্য, তাহা আর বোধ হয় বিশেষ করিয়া দেখাইতে হইবে না। পাঠক এই মূল সত্যটীর বিষয় গভীর ভাবে ভাবিলে অনেক আলোক লাভ করিবেন। 'বিষয়' অর্থ যাহা দেখা যায়, শুনা যায়, স্পর্শ করা যায়, ভাবা যায়, কল্পনা করা যায়, সংক্ষেপত—জানা যায়। [দেখা শুনা ইত্যাদি জ্ঞানেরই অবস্থান্তর মাত্র] বিষয়কে 'জড়' বল, আর 'আবির্ভাব' বল, আর 'ভাব' বল,আর'বোধ' বল, বিশেষ কিছু আসে যায় না, নাম গুলি কেবল জ্ঞানের অবস্থার তারতম্য সূচক মাত্র। 'বিষয়' অর্থ আত্মার অবলম্বিত বস্তু ; তেমনি বিষয়ীর অর্থ ও বিষয়ের জ্ঞাতা, ভাবুক, আধার। ভাবিলেই দেখা যায়, বিষয়ী ছাড়া বিষয়ের এবং বিষয় ছাড়া বিষয়ীর কোন ভাব (idea)ই হয়না, কোন অর্থই হয় না। বিষয় ও বিষয়ী একই মৌলিক সত্তার দুটী দিক্ মাত্র—দুটী স্বতন্ত্র বস্তু নহে। এই দুটী দিককে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করা যায়, কিন্তু কার্য্যে কিম্বা কল্পনায় কিছুতেই বিচ্ছিন্ন করা যায় না। একটী বলিলে অবশ্যম্ভাবী রূপে আর একটীকে বুঝায়। বিষয় মাত্রই বিষয়ী-সংসৃষ্ট, বিষয়ী মাত্রই বিষয়-সংসৃষ্ট।

৪। জড় স্বয়ং নিষ্ক্রিয়।

'জড়' অর্থ ইন্দ্রিয়-জ্ঞানাধীন বিষয়—আত্মার অধীনস্থ ভাব বিশেষ ; সুতরাং জড়ের প্রকৃতিতেই নিষ্ক্রিয়তা নিহিত রহিয়াছে। স্বয়ং ক্রিয়াবান হইতে হইলেই স্বাধীনতা, স্বতন্ত্রতা বুঝায়, কিন্তু জড় স্বাধীন নহে, স্বতন্ত্র নহে, ইহা আত্মার অধীন—আত্মার সহিত অবিচ্ছেদ্য-রূপে সম্বন্ধ—ভাব নিচয় মাত্র। যাহার প্রকৃতিই অধীনতা, সে আবার স্বতঃ ক্রিয়াবান অর্থাৎ স্বাধীন হইবে কিরূপে ? সুতরাং 'জড় স্বয়ং ক্রিয়াবান' এই কথা বলিলে এই বুঝা যায় যে, অধীন বস্তু স্বাধীন, অর্থাৎ অধীন নহে, ইহাতে স্পষ্টতই দ্বিতীয় নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ হয়, সুতরাং ইহা কখনই সত্য হইতে পারে না। অতএব উপরোক্ত প্রস্তাব প্রথম নিয়মাধীন মূল সত্য ; ইহার subject এ যাহা নিহিত আছে predicate তাহাই প্রকাশিত হইয়াছে। এই মূল সত্য জড় বিজ্ঞানের ভিত্তি ভূমি ; বিজ্ঞান জড়কে নিষ্ক্রিয় ভিন্ন ভাবিতে পারে না, তাহাতেই ক্রিয়াবান "শক্তি" নামক পদার্থে বিশ্বাস করিতে বাধ্য হয়। স্থূলদর্শী দার্শনিকেরা একদিকে জড়কে 'ভাব' (ideas or sensations) 'আবির্ভাব' (phenomena)'মনের অবস্থা নিচয়' বলিয়া স্বীকার করিয়া আবার পরক্ষণেই ইহাকে স্বাধীন কার্য্যক্ষম বলিয়া কেবল নিজের স্থূলদর্শিতারই পরিচয় দেন। অন্য নানা অর্থে জড় দুরবগাহ রহস্যময় হইতে পারে ; জড় বিস্ময়কর, সৌন্দর্য্যপূর্ণ মুগ্ধকর হইতে পারে ; হইবে না কেন ? অনন্ত হৃদয় নিহিত, অনন্ত হৃদয়োত্থিত ভাব রাশি ক্ষুদ্র কীটসম মানুষের পক্ষে দুরবগাহ, বিস্ময়কর, মুগ্ধকর হইবে, ইহা আর বিচিত্র

কি ? কিন্তু তাহাতে প্রমাণ হইতেছে না যে জড় স্বয়ং ক্রিয়াবান ; যে মুহূর্ত্তে ইহাকে sensation বলিলাম, idea বলিলাম, phenomenon বলিলাম, সেই মুহূর্ত্তেই ইহার অন্ত সহস্র বিশেষণ সত্ত্বে ও ইহাকে নিষ্ক্রিয় বলিতে বাধ্য হইলাম ; আর sensations, ideas, phenomena ভিন্ন জড়ের অন্য কোন অর্থই নাই। সুতরাং যিনি জড়কে কার্য্যক্ষম বলেন, তিনি হয় জড়ের অর্থ জানেন না, না হয় অর্থ অগ্রাহ্য করিয়া, জ্ঞানের ভূমি ছাড়িয়া, কল্পনারাজ্যে বিচরণ করিবার প্রয়াসী।

৫। কার্য্যমাত্রই কর্ত্তা-সাপেক্ষ।

'কার্য্য' অর্থ পরিবর্ত্তন। পরিবর্ত্তন বলিলেই আমরা সাধারণত বিষয়ের পরিবর্ত্তন বুঝি, মনের সম্মুখে ভাবের আবির্ভাব, মন হইতে ভাবের তিরোভাব, ভাবের অবস্থান্তর, এই সমুদায়ের নাম পরিবর্ত্তন ; কার্য্য এবং পরিবর্ত্তনের অন্য অর্থও থাকিতে পারে, কিন্তু আমরা এস্থলে এ অর্থই গ্রহণ করিলাম ; কার্য্য অর্থ বিষয়ের পরিবর্ত্তন। বিষয় স্বয়ং নিষ্ক্রিয়, সুতরাং ইহার পরিবর্ত্তন বলিলেই কোন ক্রিয়াবান বস্তু বা ব্যক্তির কর্তৃত্ব বুঝায়। অতএব উপরোক্ত প্রস্তাবটী একটী মূল সত্য ; ইহার প্রকৃত আকার —নিষ্ক্রিয় বস্তুর পরিবর্ত্তন মাত্রই কর্ত্তা-সাপেক্ষ ; ইহার বিপরীত প্রস্তাব স্পষ্টতই দ্বিতীয় নিয়ম-বিরুদ্ধ। এই মূলসত্যই কারণবাদের মূল-সূত্র ; সাধারণত ইহা এই আকারে উক্ত হইয়া থাকে—'কার্য্যমাত্রেরই কারণ আছে ;' আমরা ইহাকে এই আকারে বসাইতে ইচ্ছা করি না, কেন না ইহাতে অনেক গোলমাল হয় ; 'কারণের' অর্থ লইয়া অনেক গোলযোগ হয়। কিন্তু কর্ত্তা ব্যতীত প্রকৃত কারণ আর কিছুই হইতে পারে না, আত্মপ্রত্যয় কর্ত্তাকেই চায় এবং কর্ত্তাকে পাইলেই তৃপ্ত হয়, অন্যবিধ কারণে তৃপ্ত হয় না। এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা পাঠক "Roots of Faith"এর "Cause —physical and spiritual" নামক প্রবন্ধ চতুষ্টয়ে, এবং বিগত বর্ষের "নব্যভারতের" "নাস্তিকতা" ও 'আস্তিকতা' শীর্ষক প্রবন্ধ দ্বয়ে দেখিতে পাইবেন।

৬। কর্ত্তা মাত্রই জ্ঞানী।

'কর্ত্তা' অর্থ কার্য্যের উৎপাদক ; 'কার্য্য' অর্থ বিষয়ের পরিবর্ত্তন। 'বিষয়' অর্থ আত্মার ভাবনিচয়। আত্মার ভাব নিচয় ব্যতীত বিষয়ের আর কোন অর্থ নাই। সুতরাং বিষয়ের পরিবর্ত্তন কেবল আত্মাই করিতে পারে, জ্ঞাতের পরিবর্ত্তন কেবল জ্ঞাতাই করিতে পারে। যাহার সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ, কেবল সেই বিষয়ের পরিবর্ত্তন করিতে পারে ; বিষয়ীর সহিত বিষয়ের নিত্য সম্বন্ধ, এবং বিষয়ী ভিন্ন আর কাহারো সহিত ইহার সম্বন্ধ থাকিতে পারে না, কেন না "জ্ঞাত" ভিন্ন বিষয়ের আর কোন অর্থ নাই, এবং জ্ঞাত বলিলে কেবল জ্ঞাতার সঙ্গেই সম্বন্ধ বুঝায়। সুতরাং "কর্ত্তা মাত্রই জ্ঞানী" এই প্রস্তাবের পূর্ণ আকার —"বিষয় পরিবর্ত্তনকারী মাত্রই জ্ঞানী" অর্থাৎ "বিষয়-সংসৃষ্ট মাত্রই জ্ঞানী" অর্থাৎ বিষয়ী। বিষয় সংসৃষ্ট আর "বিষয়ী" একই কথা। অতএব দেখা যাইতেছে "অন্ধ শক্তি" "অজ্ঞান অজ্ঞাত বা অজ্ঞের শক্তি" এই সমুদায় কেবল অর্থহীন কল্পনা মাত্র, জ্ঞানের বেশে অজ্ঞান, আলোকের বেশে অন্ধকার মাত্র। জ্ঞাতা বা জ্ঞানী ছাড়া আর কিছুরই শক্তি, কর্তৃত্ব, কারণত্ব থাকিতে পারে না ;

কর্তৃত্ব ও জ্ঞান অবিচ্ছেদ্য। এই বিষয়ের ও সমালোচনা উপরোক্ত পুস্তক ও প্রবন্ধে আছে।

৭। অসৎ হইতে সৎ উৎপন্ন হইতে পারে না। কিছু-না হইতে কিছু হইতে পারে না।

ইহা কারণবাদের মূল সূত্রেরই একটী ভিন্ন আকার; কিন্তু ইহাকে এই স্বতন্ত্র আকারে বুঝা ও ধরা আবশ্যক; ইহা অজ্ঞেয়তাবাদ জড়বাদ প্রভৃতির মূলোচ্ছেদকারী। 'অসৎ' অর্থ শূন্য; অসৎ হইতে সৎ হইতে পারে, ইহার অর্থ শূন্য স্বয়ং পূর্ণ হইতে পারে, বা শূন্য অশূন্য হইতে পারে,— ইহা স্পষ্টতই দ্বিতীয় নিয়ম-বিরুদ্ধ। 'অসৎ' বা 'কিছু-না' ইহাতে সম্পূর্ণ অস্তিত্বহীনতা ও শক্তি-হীনতা বুঝায়, সুতরাং অসৎ বা কিছু-না হইতে কিছু হইতে পারে না, ইহা বলিলে subject এ যাহা নিহিত আছে predicate এ তাহাই প্রকাশ করা হয়; সুতরাং উপরোক্ত প্রস্তাব প্রথম নিয়মানুযায়ী মূল সত্য। এই মূল সত্য কোন না কোন আকারে সকলেই বিশ্বাস করে; প্রত্যেক কার্য্যের উপযুক্ত কারণ খুঁজিবার প্রবৃত্তি এই মূল বিশ্বাস হইতেই উৎপন্ন হয়।

৮। অচেতন হইতে চৈতন্য উৎপন্ন হইতে পারে না।

ইহা উপরোক্ত মূল সত্যেরই একটী প্রয়োগ মাত্র; চৈতন্যের সম্বন্ধে অচেতন অসৎ, অচেতন সহস্র-গুণ সম্পন্ন হইলেও চৈতন্যের সম্বন্ধে ইহা কিছু-নার সমান, সুতরাং অচেতন হইতে চৈতন্য হইতে পারে, ইহা বলিলে প্রকারান্তরে বলা হয়, অসৎ হইতে সৎ হইতে পারে। দৈনন্দিন জীবনে মানুষ কার্য্যের উপযুক্ত কারণ, ফলের উপযোগী বৃক্ষ না পাইলে কথনই তৃপ্ত হয় না, অথচ এই উচ্চতর বিষয়ে বৃথা বিনয়ের বশবর্ত্তী হইয়া আত্ম-প্রতারিত হয়। বিজ্ঞান অচেতন হইতে চৈতন্যের উৎপত্তি কেবল যে প্রমাণ করিতে পারে নাই, তাহা নহে, বিজ্ঞানের পক্ষে তাহা প্রমাণ করা অসম্ভব। বিজ্ঞান 'না'কে 'হাঁ' করিতে পারে না, অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারে না। মানিলাম যে বিজ্ঞান এত দিন এই বিষয়ে যাহা করিতে পারে নাই তাহাও এককালে করিতে পারে, কিন্তু তাহাতেও উপরোক্ত মূল সত্যকে অতিক্রম করিতে পারিবে না। বিজ্ঞান কত দূর যাইতে পারে? যে স্থলে চৈতন্য বা চৈতন্যের কোন বীজ নাই, বিজ্ঞান এখনো সে স্থলে চৈতন্যের উৎপত্তি দেখাইতে পারে নাই, কিন্তু মানিলাম যে এক সময় দেখাইতে পারে; কিন্তু তাহাতেও জড়বাদ সপ্রমাণ হইবে না—জড় হইতে চৈতন্য হইল ইহা সপ্রমাণ হইবে না। জড়ের সংযোগ উপলক্ষে চৈতন্যের উৎপত্তি হইতে পারে, কিন্তু এরূপ স্থলে জড়ের সংযোগ উপলক্ষ মাত্র, প্রকৃত কারণ নহে। চৈতন্যের কারণ কেবল চৈতন্যই হইতে পারে। যাহাতে যাহা নাই সে তাহার কারণ হইতে পারে, ইহা মানিলে কারণের কোন অর্থ থাকে না। এক জন মূর্খকে কোন কালেজের অধ্যাপক করিলে, দুর্নীত অভক্তকে ধর্ম্ম প্রচারে নিযুক্ত করিলে, এক জন বিজ্ঞানানভিজ্ঞকে রয়েল সোসাইটির বক্তা করিলে জড়বাদী মাত্রই আপত্তি করিবে; অথচ জড় হইতে চৈতন্যের উৎপত্তি হইতে পারে, ইহা বলিয়া আত্ম প্রতারিত হইতে এবং লোকের মতিভ্রম জন্মাইতে ত্রুটি করিবেনা।

৯। জড়জগৎ পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন।

এস্থলে 'জড়জগৎ' অর্থে আমরা আমাদের প্রত্যক্ষীভূত জগৎ বুঝিতেছি—যে জগৎ কখনো আমাদের সমক্ষে আবির্ভূত, কখনো আমাদের নিকট হইতে তিরোভূত হইতেছে তাহারই কথা বলিতেছি; জড় আত্মার জ্ঞানাধীন ভাবনিচয় মাত্র, ইহা ইতিপূর্ব্বে দেখান হইয়াছে; জড় জগৎ অর্থ তবে, ভাব জগৎ; Material world অর্থ phenomenal world. এই ভাব জগৎ কোথা হইতে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইতেছে? কোথা হইতে উৎপন্ন হইতেছে? অসৎ হইতে সৎ হইতে পারে না, সুতরাং এই জগতের কোন কারণ আছে; কিন্তু সেই কারণ অচেতন ভাবশূন্য হইতে পারে না; যিনি অজ্ঞেয়, তাঁহাতে ভাব আছে কি না জানি না; যাহাতে ভাব নাই তিনি ভাব দিবেন কিরূপে? যাহাতে বিষয় নাই তিনি বিষয়ের কারণ হইবেন কিরূপে? সুতরাং এই প্রবহমান সৃষ্টি কার্য্যের কারণ কেবল পরমাত্মাই হইতে পারেন। যিনি ভাবের আধার, যিনি বিষয়-সংসৃষ্ট, কেবল তিনিই ভাব উৎপাদন করিতে পারেন, বিষয় প্রকাশিত করিতে পারেন।

১০। জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন।

জীবাত্মা সৃষ্ট। এই যে পরিমিত জ্ঞানযুক্ত, অতীত ও ভবিষ্যতের জ্ঞান-বিরহিত, বিস্মৃতি-প্রবণ, বর্দ্ধনশীল, পরিবর্ত্তনশীল, ক্ষুদ্র আত্মা, ইহা নিশ্চয়ই জাত, সৃষ্ট, কিন্তু ই... কিছু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সন্দেহ নাই; অসৎ হইতে সৎ হইতে পারে না। ইহা যে অজ্ঞান বা অজ্ঞেয় কিছু হইতে উৎপন্ন হয় নাই, তাহাও নিশ্চয়, যাহাতে যাহা নাই সে তাহা দিবে কিরূপে? জ্ঞান বস্তু উপাদন করিবার পক্ষে অজ্ঞান বস্তু বা অজ্ঞেয় বস্তু উভয়ই অসৎ; সুতরাং জীবাত্মার কারণ কেবল পরমাত্মাই হইতে পারে[ন]।

অদ্য এইখানেই থামি। যদি পারি, ভবিষ্যতে ধর্ম্ম-বিশ্বাস সম্বন্ধীয় আরো কতিপয় মূল সত্যের ব্যাখ্যা করিব, অথবা পূর্ব্বোক্ত গুলিকেই আরো বিস্তৃত রূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

শ্রীসীতানাথ দত্ত।

আত্মহত্যা।

(কোন রমণীর বিষপানে মৃত্যুউপলক্ষে লিখিত)

মানিনি! কি অভিমানে হইয়ে পাষাণ,
আকণ্ঠ ভরিয়ে বিষ করেছিস্ পান?
এত কি হইল ঘৃণা, গেল না জীবন বিনা,
কোন্ মূর্খ করিয়াছে এত অপমান?
এমন অযত্নে হায়, অনাদরে অবজ্ঞায়
দু'পায় ঠেলিল কেরে মণি মূল্যবান?
সত্যই পাপিষ্ঠ নরে, এত অত্যাচার করে?
মানবের বুকে কিরে দানবের প্রাণ?
আহা হা স্বর্গের দেবি! সে রাক্ষসে নিত্য সেবি
পতিপুত্র ভ্রাতারূপে সাধিস্ কল্যাণ!

তোর মত আছে কেরে, স্বর্গমর্ত্ত্য ত্রিসংসারে
প্রাণময়ী মূর্ত্তিমতী আত্ম বলিদান?
কোন্ মূর্খ করিয়াছে এত অপমান?

১

কি দুঃখেরে পাগলিনি! হইয়ে পাষাণ,
আকণ্ঠ ভরিয়ে বিষ করেছিস্ পান?
কার সোণামুখী তরী, কারে রে কাঙ্গাল করি
অকালে ডুবিলি বিনা ঝটিকা তুফান?
কার রে আছিলি তুই, সুধাময়ী বেলি যুঁই
যৌবন বসন্তে ভরা প্রেমের উদ্যান?
কারে বিধি প্রতিকূল, কার সে স্বর্গীয় ফুল
অকালে খসিলি কার কাঁদাইয়া প্রাণ?
কে সে হতভাগা হায়, প্রেমপূর্ণ পূর্ণিমায়
অকালে যাহার তুই শশী অস্তমান?
কি খেদেরে পাগলিনি ত্যজিলি পরাণ?

২

কি দুঃখেরে পাগলিনি হায় হায় হায়,
অমূল্য জীবন দিলি এমন হেলায়?
স্নেহ ভুলি মায়া ভুলি, সহৃদেশ্বর্ব্ব ঠেলি
কোন্ প্রাণে হা মানিনি দিলি রসনায়?
একটু হ'লি না ভীত, একটুকু সশঙ্কিত
একটু কাঁদেনি প্রাণ প্রাণের আশায়?
প্রাণে এত তুচ্ছ বোধ, হা ক্ষীরোদ! হা নির্ব্বোধ?
যৌবন জীবনে কিরে শোভা কারো পায়?
সংসারে জনমে ঘৃণা, দেখিনিরে তোরে বিনা
বালিকা বয়েসে কার বাসনা ফুরায়?
কি দুঃখে খাইলি বিষ হায় হায় হায়!

৩

কি দুঃখেরে অভাগিনি খাইলি গরল,
নবীন বয়েসে হেন শশী শতদল?
জীবনের যত আশা, সুখ শান্তি ভালবাসা
প্রাণের পিপাসা কিসে নিবিল সকল?
বুক ভরা অভিলাষ, সে আনন্দ সে উল্লাস
সকলি জন্মের মত গেল রসাতল?
হা পাষাণি সর্ব্বনাশি! এমন রূপের রাশি
বিচ্ছিন্ন কুসুম তুল্য করিলি বিফল?
অই যে রজতকায়, জোছনা মূরছা যায়,
আননে ফুটিয়া আছে শশী নিরমল!
অই যে সুনীল আঁখি, স্নেহ লাজে মাখামাখি
লাবণ্য বন্যায় ছিল নীলাম্বু চঞ্চল!
কমলে গোলাপে গড়া, ও অধর মধুভরা
এখনো—এখনো যেন করে টলমল!
আহা হা এ রূপরাশি, হা পাষাণি সর্ব্বনাশি!
দর্পণে দেখিয়া কভু মুছি অশ্রুজল
করেছিলি সিক্ত নাকি বসন অঞ্চল?

৪

আহা হা একটু দয়া হ'ল না পাষাণে,
এতকি প্রবলা ঘৃণা অবলার প্রাণে?
রমণীর এত জেদ, কি এত গভীর খেদ,
ভ্রুক্ষেপে চাহে না কিছু তৃণবৎ জ্ঞানে!
মর কিংবা বাঁচ কেহ, কাহারে নাহিক স্নেহ,
আতঙ্কে করুণা কাঁদে চাহি তার পানে!
এ ব্রহ্মাণ্ড তুচ্ছ বোধে, মহারাগে মহাক্রোধে
চন্দ্র সূর্য্য ভেঙ্গে ফেলে আঘাতি চরণে!
ছিন্নমস্তা আত্মঘাতী, পাষাণী রমণী জাতি
জগৎ জ্বালা'য়ে দেয় মহা অভিমানে!
এত কি প্রবলা ঘৃণা অবলার প্রাণে?

৫

এই যে শিশুটী তোর কি বলিব হায়,
কাঁদিয়া আকুল দেখ মাটিতে লুটায়!
একটু দেনারে ক্ষীর, শুষ্ক কণ্ঠে শিশুটীর,
ক্ষীরোদ, কোলের বাছা আকুল ক্ষুধায়!
ছি ছি ছি বুকের ধন, এত তারে অযতন?
শুনিনি জননী হেন পাষাণের প্রায়!
ছেলে যদি "মামা" ডাকে, মায়ের কি রাগ থাকে

স্নেহের সাগর তার উছলিয়া যায়;
ক্ষীরোদ, শিশুটী তোর কাতর ক্ষুধায়!

৬

হা মানিনি! চক্ষু তুলে দেখ একবার,
অভাগিনী জননীরে, কি দশা তাহার!
দেখ একবার চেয়ে, হা পাষাণি চক্ষু খেয়ে
দেখ্ রে হৃদয় রত্ন ছিনি তুই যার,
পড়িয়া চরণ তলে, সে অভাগা অশ্রুজলে
কাতরে কাঁদিছে কত করি হাহাকার!
কখনো ধরিয়া পায়, দীন ভাবে ক্ষমা চায়,
আতঙ্কে শিহ'রে আহা উঠিছে আবার,
সরলা! হৃদয় রত্ন ছিনি তুই যার!

৭

তবু কি একটু দয়া হয় না পাষাণে?
রমণী কঠিনা কিরে এত অভিমানে?
কি দোষে, কি ক্ষোভে গেলি, পতি পুত্র পায় ঠেলি
চাহিলি না হা নিদয়া কারো মুখ পানে?
মানুষের মত কিরে, নাহি ছিল ও শরীরে
রচিত ধমনী শিরা নর উপাদানে?
ছিলনা হৃদয় ও'তে, দয়া মায়া থাকে যাতে,
কেবলি কি ছিল উহা ভরা অভিমানে?
রমণী কঠিনা হতে এত কিরে জানে?

৮

এত কি জানিস তুই হারে ও সরলা?
তবে কিরে মিথ্যা নহে, জ্যোতির্ব্বিদ যাহা কহে
পর্ব্বত প্রস্তরে অই এ ... কলা?
কাদম্বিনী হাসিমুখে, সত্যই কি রাখে বুকে
লুকাইয়া বজ্রবহ্নি ও নহে চপলা?
এত কি কঠিনা তুই হারে ও সরলা?

৯

ভয়ানক জেদ্ তোর ভয়ানক মান,
বিষম পাপেতে পোরা দারুণ পরাণ!
পরকালে নাহি ভয়, আশঙ্কা কাহারে কয়
জানে নাই যেন অই স্বাধীন পরাণ!
বিমুক্ত বায়ুর প্রায়, পর্ব্বত লঙ্ঘিয়া যায়,
নাহি তার বাধা বিঘ্ন উচ্চ নীচ জ্ঞান!
রমণী এমনি কিরে কঠিন পরাণ?

১০

ক্ষীরোদ!

আমিও রে তোর মত, উদ্যম করেছি কত,
বাঁধিতে পারিনু কই পরাণে পাষাণ!
বসি অন্ধকার ঘরে, কালকূট নিয়ে করে
প্রাণভরে ডাকিয়াছি—"কোথা ভগবান্!
দেখ একবার প্রভু, নিষ্ঠুর সংসার কভু
দেখিল না হৃদয়ের যে মহা শ্মশান,
দেখ সেই দগ্ধ ঠাঁই, সুখ নাই শান্তি নাই,
দেখ সেই ভস্মভরা ধূধূ-করা প্রাণ!
নাহি জানি পাপ পুণ্য, হৃদয় করিয়া শূন্য
বুক ভরা ভালবাসা করিয়াছি দান,
তবু ত নিষ্ঠুর কেহ, একটু দিল না স্নেহ
কাঁদিয়াছি দ্বারে দ্বারে কাঙ্গাল সমান!
আজি এই হলাহলে, যে চিতা হৃদয়ে জ্বলে
জনমের মত দেব করিব নির্ব্বাণ,
অন্তিমে আত্মার শান্তি করিও প্রদান!"

১১

কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা মোর হ'লনা সফল,
তোর মত মোর ভাই, অদম্য উদ্যম নাই
নাহিক তেমন এই হৃদয়ের বল!
তেমন সম্মান বোধ, নাহি মোর হা ক্ষীরোদ!
তাহ'লে কি আর সেই তীব্র হলাহল,
ছি লজ্জা! ছুঁইতে ঠোঁটে, পরাণ চমকি উঠে,
নিক্ষেপিয়া দূরে ফেলি বর্ষি অশ্রুজল?
ক্ষীরোদ, প্রতিজ্ঞা মোর হল না সফল!

১২

কিন্তু, যদিও তখন—
হয়নি সফল হায় প্রতিজ্ঞা আমার,
* * * *
বসিয়া শ্মশানে তোর, আসিলে রজনী ঘোর,

ঘুমায়ে থাকিবে যবে সমস্ত সংসার,
পরাণে মাখিব ছাই, সে সাহস যদি পাই,
অদম্য উদ্যম সেই শক্তি দুর্নিবার!
সে প্রেম অপ্রতিহত, সে আকাঙ্ক্ষা উগ্রকত
বিশ্বনাশী সে বৈরাগ্য বজ্র অঙ্গীকার,
সে একান্ত একাগ্রতা, প্রাণগত নির্ম্মমতা,
দেখিব পাইনি তোর ক্ষুদ্র বালিকার!

১৩

ক্ষীরোদ!
কি তোর বৈরাগ্য ভাব ঘোর অভিমান,
স্মরিতেই ভক্তিভরে নত হয় প্রাণ!
কি তোরে করিবে ঘৃণা, নরক পিশাচ বিনা?
কেনা বোঝে হৃদয়ের স্বর্গীয় সম্মান?
আমি তোরে প্রিয় দেবি, হৃদয় মন্দিরে সেবি
শ্রদ্ধার অঞ্জলি নিত্য করিব প্রদান!
আমি বড় ভালবাসি, ছিন্ন-মস্তা রূপরাশি,
বিশাল বৈরাগ্য ভাবে বড় মাতে প্রাণ,
আমি তোরে প্রিয়দেবি, হৃদয় মন্দিরে সেবি
প্রীতির অঞ্জলি নিত্য করিব প্রদান!
যা তবে ক্ষীরোদ—সেই সুখময় স্থান
স্বর্গীয় শান্তির কোলে জুড়াইবে প্রাণ!

যত ব্রহ্মপুত্র তীরে, ও সুতনু ধীরে ধীরে
পবিত্র পাবকে হবে তস্ম অবসান,
গভীর নিশীথকালে, বসি সেই চিতাশালে
তোর ও ভৈরবী মূর্ত্তি করিব ধেয়ান!
অভয়া বরদা বেশে, সে ঘোর শ্মশান দেশে
সিদ্ধির সাধনা রূপে হ'য়ে অধিষ্ঠান,
ভক্তের বাসনানল করিস্ নির্ব্বাণ!

১৪

আহা!
অই যে ডাকিল পাখী আসন্ন সন্ধ্যায়,
বাগানে কুসুম ফোটে, আকাশে তারকা ওঠে,
তেমনি শীতল বায়ু ধীরে বয়ে যায়!
হা ক্ষীরোদ তোর লাগি, কেহ নয় দুখভাগী
এই যে একাকী তুই চলিলি কোথায়!
এই যে চলিলি একা, আর ত হবে না দেখা,
আহা হা স্মরিতে যেন বুক ফে'টে যায়!
পথের সামান্য ধূলি, এ সামান্য তৃণ গুলি
সকলি রহিল যদি হায় হায় হায়,
ক্ষীরোদ, একাকী তুই চলিলি কোথায়?

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

সংস্কার রহস্য।

প্রথম প্রস্তাব।

বিবাহ, পুনর্বিবাহ ও বিধবা বিবাহ।

সংস্কার বিধি স্মৃতি নামক ধর্ম্ম শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়, বেদে ইহার কোন বিধান বা প্রণালী দৃষ্ট হয় না। বিবাহ সংস্কারটীও স্মার্ত্ত, তজ্জন্য বেদে ইহার কোন প্রণালী উপদেশ নাই। সুতরাং বৈদিক সময়ের হিন্দু বিবাহ কি প্রণালীতে নির্ব্বাহ হইত, তাহা আর এক্ষণে জানিবার উপায় নাই। বিবাহ সংস্কারের প্রচলিত মন্ত্র গুলি প্রায় বৈদিক। সে সকল মন্ত্রের ব্যাখ্যা দেখিলে অনুমান হয় যে, বৈদিক সময়েও কোন এক নির্দ্দিষ্ট নিয়মে ভার্য্যাগ্রহণ করা হইত। সেই সকল বেদ মন্ত্রের তাৎপর্য্য লইয়া সূত্রকার ঋষিগণ যে বিবাহ ক্রিয়ার একটী শৃঙ্খলা বা প্রণালী প্রস্তুত করিয়াছিলেন, সেই প্রণালী আজও হিন্দুসমাজে ব্যবহৃত হইতেছে।

বিবাহ সম্বন্ধীয় বর্ত্তমান প্রচলিত বেদ-

মন্ত্র গুলির অর্থ অন্বেষণ করিলে প্রতীতি হয় যে, উক্ত সময়ে কোন এক নির্দ্দিষ্ট নিয়মে অভিমত কুমারীকে পাণিগ্রহণ করা হইত। অগ্নি প্রজ্জ্বালন করিয়া তৎসম্মুখে প্রণয় গাথা গান, মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য বর্ণন, প্রতিজ্ঞা করণ, অবশেষে পরস্পরের অবিচ্ছেদ কামনা ও পুত্রাদি প্রাপ্তি কামনা করা হইত। এই অদ্ভুত সময়ের পূর্ব্বে, অর্থাৎ অতি আদিম কালে এ সকল অনুষ্ঠান কৃত হইত কি না, তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। মহাভারতের একটী উপাখ্যান ভাগে লিখিত আছে যে, অতি আদিম কালের স্ত্রীলোক সকল অনাবৃত ছিল অর্থাৎ তাহারা কাহারও *নিজস্ব* হইয়া থাকিত না। একথা যদি সত্যমূলক হয়, তবে নিঃসন্দিগ্ধ হইয়া বলা যাইতে পারে যে, তখনও পর্য্যন্ত বিবাহ প্রথার সৃষ্টি হয় নাই। ঐ পশুবৎ যাদৃচ্ছিক ব্যবহার নাকি শ্বেত কেতু নামক ঋষিপুত্র হইতে নিবারিত হইয়াছিল, ইহাও মহাভারতোক্ত উক্ত আখ্যানে বর্ণিত আছে। ফল, ক্রমোৎকর্ষ হওয়াই সম্ভব বলিয়া অনুমিত হয়।

ক্রমে বৈদিক প্রথার মন্দ অংশের পরিবর্ত্তন বা সংস্কার করণ পূর্ব্বক ঋষিরা বিবাহ প্রণালী প্রচার করিলেন। শত শত সভ্যলোক তাহার অনুকরণে প্রবৃত্ত হইল। কতক কতক অসভ্য লোক তাহা মান্য করিল না। তৎকারণে ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ,—ও গান্ধর্ব্ব প্রভৃতি অনেক প্রকার প্রণালীর সৃষ্টি হইয়াছিল, ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুদিগের মধ্যে দুই প্রকার মাত্র বিবাহ প্রণালী চলিত থাকা দৃষ্ট হয়। অবশিষ্ট ৬ প্রকার প্রণালী এক্ষণে লুপ্ত। পূর্ব্বকালের বিবাহ প্রণালী কিরূপ ও কি প্রকার উদ্দেশ্যযুক্ত, তাহা বর্ণন করা বা অনুসন্ধান করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। তৎকারণে আমরা শাস্ত্র লিখিত বিবাহ বিধি ও বর্ত্তমান বৈবাহিক আচার, এই দুয়ের সামঞ্জস্যে পাঠকগণকে নব্য ও প্রাচীন হিন্দু বিবাহের রহস্য উপদেশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

প্রত্যেক ধর্ম্মবক্তা ঋষি বিবাহ ব্যবস্থার উপদেশ করিয়াছেন। তাঁহাদের সেই সকল উপদেশের মধ্যে বিবাহ্যা কন্যা, বিবাহ্য বর, বড় কন্যার বিবাহ-যোগ্য বয়স, ইত্যাদি ইত্যাদি বহু প্রকার সুক্ষ্ম নির্ণয় আছে, সে সকল আমরা আনুপূর্ব্বী ক্রমে ব্যাখ্যা করিব।

প্রথম কন্যার লক্ষণ।

কিরূপ কন্যা বিবাহ করা উচিত, প্রথমে তাহাই বিবেচ্য। যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন,—

"অবিপ্লুত ব্রহ্মচর্য্যো লক্ষণ্যাংস্ত্রিয়মুদ্বহেৎ।
অনন্য পূর্ব্বিকাংকান্তাং অসপিণ্ডাং যবীয়সীম্॥"

যে কন্যা অনন্য পূর্ব্বিকা অর্থাৎ যে কন্যা সকলরূপে পর পরিগৃহীত হয় নাই, যাহার অন্তর্লক্ষণ ও বাহ্য লক্ষণ উভয়ই উত্তম, যাহার স্ত্রীত্বের পক্ষে সংশয় নাই, যে কন্যা বরের মন ও নয়ন পরিতৃপ্ত করিতে পারে, যে কন্যা অসপিণ্ডা (যাহার সহিত রক্ত সম্বন্ধ নাই) যে কন্যা বয়ঃকনিষ্ঠা, এরূপ কন্যাই বিবাহ্যা, এতদ্ভিন্ন অবিবাহ্যা। যথা—"অরোগিনীং ভ্রাতৃমতীং অসমানার্ষ গোত্রজাম্॥" [সংস্কার ময়ূখ।

যে কন্যার কোন দুশ্চিকিৎস্য রোগ নাই, যে কন্যা স্বগোত্রোৎপন্না নহে এবং যে কন্যা তুল্য প্রবরা নহে, সেই কন্যাই বিবাহ করিবেক, অন্যথা করিবেক না।

পূর্ব্বকালের ঋষিরা কিরূপ কন্যাকে ভার্য্যা করিবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিতেন, তাহা এই বচনদ্বয় দ্বারা জানা যায়। অধিক অন্বেষণ করিতে হয় না। এখনও পর্য্যন্ত হিন্দুরা স্বগোত্রোদ্ভবা, তুল্য-প্রবরা, সপিণ্ড কন্যা ও বয়ঃকনিষ্ঠা কন্যা বিবাহ করেন না; কিন্তু শীঘ্রই এনিয়ম লুপ্ত হইবে, এরূপ অনুমান হইতেছে। অসাপিণ্ড কন্যা কি? তাহা এস্থলে বিশদ করিয়া বলা উচিত হইতেছে।

"সমানঃ একঃ পিণ্ডো দেহো
যস্যাঃ সা তাদৃশী ন ভবতীত্য সপিণ্ডাতাম্।"

এই ব্যুৎপত্তির দ্বারা স্থির হইতেছে যে, পূর্ব্বেও এখনও এক-শরীরান্বয় অর্থাৎ শরীর বা শারীর রক্ত সম্বন্ধীয় একত্ব লইয়া সাপিণ্ড্য নির্ণয় করা হইত ও হইতেছে। এক শরীরান্বয় শব্দের অভিপ্রেত অর্থ এই যে, এক দেহ হইতে যাহারা উৎপন্ন হয়, তাহারা পরস্পর সপিণ্ড। এই লক্ষণ অনু-সারে কেবল ভাই ভগ্নীর সপিণ্ডতা স্ফূর্ত্তি পায়, অন্যে পায় না, এরূপ বিবেচনা করি-বেন না। এক শরীরের রক্ত সম্বন্ধ অনেক পুরুষ পর্য্যন্ত থাকে, তজ্জন্য অনেক পুরুষ পর্য্যন্ত সপিণ্ডতা থাকে। কত পুরুষে সপিণ্ডতা নিবৃত্তি হয় এবং বিবাহের জন্য কাহার সহিত কাহার সপিণ্ডতা গ্রহণ করা উচিত, শাস্ত্রকারগণ তাহা নাম উল্লেখ পূর্ব্বক বর্ণন করিয়াছেন। যথা—

১। পুত্রে পিতৃ শরীরের সাক্ষাৎ রক্ত সম্বন্ধ আছে।

২। পিতামহাদি শরীরের সহিত তাহার পরম্পরা সম্বন্ধ আছে।

৩। পুত্রে মাতৃ শরীরের অবয় বা রক্ত সম্বন্ধ আছে।

৪। মাতামহাদি শরীরের সহিত তাহার পরম্পরা সম্বন্ধ আছে।

৫। মাতৃ ভগিনী (মাসী), মাতৃ ভ্রাতা (মাতুল) ইহাদিগের সঙ্গেও স্বীয় জননী জনক জন্যতারূপ সম্বন্ধের দ্বারা বিবাহ বিষয়ে সপিণ্ডতা আছে।

৬। ঐরূপ পিতৃভগিনী (পিসী) ও পিতৃভ্রাতা (খুড়া) প্রভৃতির সহিত স্বজনক জন্যরূপ সম্বন্ধ থাকায় উক্তবিধ সাপিণ্ড পরিগৃহীত হইয়া থাকে।

৭। পতি পত্নী উভয়ে মিলিয়া শরীর উৎপাদন করেন, তৎকারণে উক্ত উভয়ের মধ্যেও সাপিণ্ডতা আছে। বিবাহের কালে এইরূপে সাপিণ্ড গণনা করা হয় এবং সাপিণ্ড্যে বাধিলে বড় কন্যার বিবাহ হয় না, ইহা ভারতবর্ষবাসী হিন্দুদিগের বহু পুরাতন প্রথা।

যদি বলেন, ঐরূপ এক শরীর সম্বন্ধ ধরিলে কেহ কাহাকে বিবাহ করিতে পারে না, কেন না, সকল ব্যক্তিই এক ব্রহ্মার সন্তান, সকলের সহিত সকলের পরম্পরা সম্বন্ধে এক শরীরান্বয় বা সাপিণ্ডতা আছে, অতএব যে কোন কন্যা উপস্থিত করিবে, সকল কন্যাই সপিণ্ড কন্যা বলিয়া ত্যাগার্হ হইবে। ইহার প্রত্যুত্তরে ব্যবস্থাপক ঋষি-গণ বলিয়াছেন যে, সাপিণ্ড ব্যবস্থা অনাদি প্রবাহে গৃহীত হইবে না, ৫ পুরুষ ও ৭ পুরুষ পর্য্যন্ত গ্রহণ করিলেই যথেষ্ট হইবে। যথা যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন,—

"পঞ্চমাৎ সপ্তমাদূর্দ্ধং মাতৃতঃ পিতৃত স্তথা।"

বিষ্ণুস্মৃতিতেও এইরূপ বিধান দৃষ্ট হয়। যথা—

"মাতৃতস্ত্বা পঞ্চমাৎ পুরুষাৎ পিতৃতশ্চা সপ্তমাৎ।"

হিন্দুরা যেমন সপিণ্ড কন্যা বিবাহ করেন না, তেমনি, সগোত্রা কন্যা ও সপ্র-

বরা কন্যা উভয়ই অবিবাহ্যা বলিয়া অঙ্গীকার করেন। যথা—[বিষ্ণু, ২৪। ৯।—

"ন সগোত্রাং ন সমানার্ষ প্রবরাং ভার্য্যাং বিন্দেত।"

পাঠকগণ এখন মনে করিতে পারেন যে, ঋষিরা "সুলক্ষণা কন্যা বিবাহ করিবেক; দুর্লক্ষণা কন্যা বিবাহ করিবেক না।"* এইরূপ উপদেশ ও ব্যবস্থা বদ্ধ করায় দুর্লক্ষণাদিগের বিবাহ হওয়া দুর্ঘট হইতে পারে। কেন না সকল ব্যক্তিই সুলক্ষণার অন্বেষণ করিবেক, তন্ন প্রযুক্ত কেহই দুর্লক্ষণা কন্যা গ্রহণ করিবেক না। ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, "যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ" যে যেমন তাহার তদ্রূপ সংঘটনই হইয়া থাকে; ইচ্ছা করিলেই যে সকল ব্যক্তিই সুলক্ষণা কন্যা পাইবে, তাহার কোন নিয়ম নাই। বিশেষত বরেরও সুলক্ষণ দুর্লক্ষণ থাকে, তদনুসারে তদুভয়ের সামঞ্জস্য হইতে পারে। যেমন কন্যা সম্বন্ধে নিয়মিত উপদেশ আছে, তেমনি বর সম্বন্ধেও নিয়মিত উপদেশ আছে। কিরূপ বরে কন্যা সম্প্রদান করা উচিত, শাস্ত্রকারেরা তাহাও উপদেশ করিয়াছেন। যথা—বরের গুণ।

"কুলঞ্চ শীলঞ্চ বয়শ্চ বিত্তং
বিদ্যা চ রূপঞ্চ সনাথতা চ॥
এতান্ গুণান্ সপ্ত পরীক্ষ্য দেয়া
কন্যা বুধৈঃ শেষ মচিন্তনীয়ম॥" [যমস্মৃতি।

সৎকুল, সৎস্বভাব, বিবাহ যোগ্য বয়স, পত্নী পোষণ যোগ্য ধন, বিদ্যা, রূপ ও সনাথতা অর্থাৎ কর্তৃপক্ষ সদ্ভাব, এই সাত প্রকার বর-গুণ, এই সাত প্রকার গুণ আছে কি না তাহা পরীক্ষা করিয়া, এই সকল গুণ যদি থাকে, তবে তাদৃশ বরে কন্যা দান করিবেক। অন্য কিছু বিচার করিবেক না।

আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে সর্ব্বাগ্রে কুল পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। তাহার উদ্দেশ্য এই যে, শুদ্ধ বংশোদ্ভব বরে শুদ্ধ বংশীয়া কন্যা সংগতা হইলে তাঁহাদিগের দ্বারা উন্নত-হৃদয় সুসন্তান জন্ম গ্রহণ করিয়া কুল পবিত্র ও সমাজ উন্নতকরিবেক। যথা মহাভারতে উক্ত হইয়াছে—"যয়োরেব সমং বিত্তং যয়োরেব সমংকুলম্। তয়োর্বিবাহো-মৈত্রী চ নোত্তমাধময়োঃ ক্বচিৎ॥"

অর্থাৎ উভয়ের ধনশালিতা তুল্য, যে উভয়ের কুল শীল সমান, সেই দুই জনের বিবাহ ও বন্ধুতা সুখাবহ অথবা উচ্চের সহিত হীনের বিবাহ, কি উত্তমের সহিত অধমের বন্ধুতা উভয়ই দোষাবহ হয়।

বিবাহ যোগ্য বয়স।

কত বয়সে বিবাহ করা ও দেওয়া উচিত, মহর্ষি মনু তাহা উপদেশ করিয়া গিয়াছেন। মহর্ষি মনুর মতে, ত্রিংশদ্বর্ষীয় যুবার দ্বাদশ বর্ষীয়া কন্যার পাণিগ্রহণ করা উচিত। পুরুষের বিবাহ কাল ন্যূনকল্পে ২৪ এবং কন্যার ন্যূন কল্পে ৮। যথা—"ত্রিংশদ্বর্ষো বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকাম্। ত্র্যষ্টবর্ষোঽষ্টবর্ষাং বা ধর্ম্মে সীদতি সত্বরঃ॥"

ত্র্যষ্টবর্ষ অর্থাৎ ২৪ বৎসর। ২৪ বৎসর বয়সে বিবাহ করিলে ৮ বর্ষীয়া কন্যা বিবাহ করিবেক এবং তৎপরে ৩০ বৎসর বয়সে বিবাহ করিলে ১২ দ্বাদশ বর্ষীয়া কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেক। যদি ত্বরাযুক্ত হয়, অর্থাৎ ২৪ বৎসরের পূর্ব্বে যদি বিবাহ করি-

---

* "না কুলীনাং।" "নচ ব্যাধিতাম্।" "না বিকারীং।" "ন হীনাঙ্গীম্" "নাতি কপিলাম্" "ন বাচাটাম্" "নাতি কপিলাম্" ইত্যাদি ক্রমে অনেক প্রকার নিন্দা লক্ষণ প্রত্যেক ব্যবস্থা শাস্ত্রে লিখিত আছে।

বার জন্য ব্যগ্র হয়, তবে সে ব্যক্তি নিশ্চিত গার্হস্থ্য ধর্ম্ম ও সমাজ ধর্ম্মে ক্লেশ পায়। মনুর এই ব্যবস্থা দেখিলে স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, পূর্ব্বকালের ঋষিরা বাল্য বিবাহ শুভকর বলিয়া বিবেচনা করিতেন না, প্রত্যুত গার্হস্থ্য ধর্ম্মের ও সমাজের হানি কারণ বা অবসন্নদশার হেতু বলিয়া বিবেচনা করিতেন। কন্যা সম্বন্ধে যে অল্প বয়সের কথা বলা হইল, তাহার অভিপ্রায় অন্যবিধ। হিন্দুরা বিবাহের সহিত ধর্ম্মের সংশ্রব আছে বলিয়া বিবেচনা করিতেন। তাঁহাদের মতে স্ত্রীর স্বাধীন ভাবে ধর্ম্মাচরণ করিবার অধিকার নাই, অথচ আট বৎসরের পর কি স্ত্রী কি পুরুষ, উভয়েরই ধর্ম্মরাজ্যে পদার্পণ করা উচিত। পুরুষ যেমন অষ্টম বর্ষে উপনীত হইয়া ধর্ম্মাধিকার প্রাপ্ত হয়, স্ত্রীকেও তেমনি আট বৎসরের পর ধর্ম্মাধিকার প্রাপ্ত হওয়া উচিত। স্ত্রীলোকের যেমন উপনয়ন সংস্কার নাই, যখন বিবাহই তাহাদের উপনয়ন স্থানীয় ধর্ম্মাধিকার প্রবর্ত্তক সংস্কার, তখন তাহাদের ৮ বৎসর বয়ক্রম কালে বিবাহ হওয়াই উচিত। ৮ বৎসরে বিবাহিতা হইয়া তাহারা পতিকৃত ধর্ম্মের অংশ ভাগিনী মাত্র হইবে, কিন্তু তাহারা রজোদর্শন না হওয়া পর্য্যন্ত সম্বন্ধের অধিকারিণী হইবে না। অতএব, প্রাচীন কালের বিবাহ ব্যবস্থার নিষ্কর্ষ এই যে, পুরুষ ২৪ পূর্ব্বে বিবাহ করিবেন না। ২৪ পরে ৩০ পর্য্যন্ত তাঁহাদের বিবাহ যোগ্য মুখ্যকাল। কন্যাগণ আট বৎসরের পূর্ব্বে বিবাহ সংস্কৃতা হইবে না। ৮ বৎসরের পরে ১২ অথবা রজদর্শন কাল পর্য্যন্ত তাহাদের বিবাহ যোগ্য প্রধান কাল। যদি কোন কারণে সৎপাত্র লাভ না হয়, তাহা হইলে উক্ত কালের অধিককাল অবিবাহিত থাকিলেও দোষ হইবে না।

বিবাহ আট প্রকার।

পূর্ব্বকালে আট প্রকার বিবাহ প্রচলিত ছিল, তন্মধ্যে আর্য্য সন্তানেরা ৪ প্রকারমাত্র বিবাহ যশস্কর ধর্ম্মকর বলিয়া মনে করিতেন। যথা—“অথাষ্টৌ বিবাহা ভবন্তি। ব্রাহ্ম দৈব আর্ষঃ প্রাজাপত্য গন্ধর্ব্ব আসুরো রাক্ষসশ্চেতি। আহূয় গুণ বরে কন্যা দানং ব্রাহ্মঃ। যজ্ঞস্থ ঋত্বিজে দৈবঃ। গোমিথুন গ্রহণেনার্ষঃ প্রার্থিত প্রদানেন প্রাজাপত্যঃ। মাতাপিতৃ রহিতো যোগা গান্ধর্ব্বঃ। ক্রয়েণাসুরঃ। যুদ্ধ হরণেন রাক্ষসঃ। সুপ্ত প্রমত্তাভি গমনাৎ পৈশাচ। এতে অষ্টাশ্চত্বারো ধর্ম্ম্যাঃ। গান্ধর্ব্বোহপি রাজন্যানাম্।” [বিষ্ণুস্মৃতি।

এই সকল বিবাহের মধ্যে ব্রাহ্ম, প্রজাপত্য ও আসুর, এই ত্রিবিধ বিবাহ এক্ষণে প্রচলিত দেখা যায়।

অসবর্ণ বিবাহ।

পূর্ব্ব কালে এদেশে অসবর্ণ বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল বটে; কিন্তু তন্মধ্যে কিছু বিশেষ ব্যবস্থা থাকা দেখা যায়। যথা—“ব্রাহ্মণস্য বর্ণনাক্রমেণ চতস্রোভার্য্যা ভবন্তি। তিস্রঃ ক্ষত্রিয়স্য। দ্বে বৈশ্যস্য। একা শূদ্রস্য।”

ব্রাহ্মণেরা, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের কন্যা বিবাহ করিতে পারিতেন। ক্ষত্রিয়েরা, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র কন্যা বিবাহ করিতেন, ব্রাহ্মণ-কন্যা বিবাহ করিতেন না। এইরূপ বৈশ্যেরা, বৈশ্য ও শূদ্র কন্যা এবং

শূদ্রেরা কেবল শূদ্র কন্যা গ্রহণ করিতে পারিতেন।*

হিন্দু ব্যবস্থা শাস্ত্র অনুশীলন দ্বারা জানা যায় যে, স্বজাতীয় কন্যার পাণি গ্রহণ স্বত্বে বিজাতীয় কন্যার পাণিগ্রহণে স্বীকৃত হইত না। মহর্ষি মনুর ব্যবস্থায় এই বিষয়টী বিস্পষ্টরূপে অভিহিত হইয়াছে। যথা—

"সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তা নামিমাঃ স্যুঃক্রমশোঽবরা॥"
"শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য সাচ স্বাচ বিশঃস্মৃতে।
তে চ স্বা চৈব রাজ্ঞঃস্যুস্তাশ্চ স্বাচাগ্রজন্মনঃ॥"

দ্বিজাতিদিগের সবর্ণা কন্যা বিবাহ করাই প্রশস্ত অর্থাৎ ধর্ম্ম্য। সেই জন্য ধার্ম্মিক লোকেরা প্রথমত সবর্ণা কন্যা লাভের নিমিত্ত প্রস্তুত হইতেন। কামুকেরা কামিত্ব বিধায় ও অকামুকেরা অলাভ প্রযুক্ত যদি কখন অসবর্ণ বিবাহে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে তাঁহারা অনুলোম ক্রমেই অসবর্ণ কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেন, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ কন্যাকে না পাইলে ক্ষত্রিয় কন্যা, ক্ষত্রিয় কন্যা না পাইলে বৈশ্য কন্যা, এবং ক্রমে বিবাহ করিবেন। এ সম্বন্ধে অন্য এক প্রকার নিয়ম ছিল।

নিয়মটী এই যে, বর সবর্ণা কন্যা বিবাহ করিলে বিধি বিধানক্রমে অগ্নি স্থাপন পূর্ব্বক তৎ সন্নিধানে কন্যার হস্ত ধারণ করিতেন, কিন্তু অসবর্ণা কন্যা বিবাহ করিলে তাহার পাণিগ্রহণ করিতেন না। বরের পাণিগ্রহণের পরিবর্ত্তে ক্ষত্রিয় কন্যা হইলে এক শর কি অন্য কোন অস্ত্র গ্রহণ করিতেন, বৈশ্য কন্যা প্রতোদ (চাবুক) এবং শূদ্র কন্যা হইলে বরের বস্ত্রপ্রান্ত মাত্র ধারণ করিতেন। যথা—মনু বলিতেছেন—

"পাণি গ্রহণ সংস্কারঃ সবর্ণা স্বপদিশ্যতে।
অসবর্ণা স্বয়ং জ্ঞেয়ো বিধিরুদ্বাহ কর্ম্মণি॥
শরঃ ক্ষত্রিয়য়াগ্রাহ্যঃ প্রতোদো বৈশ্য কন্যয়া।
বসনস্য দশা গ্রাহ্যা শূদ্রয়োৎকৃষ্ট বেদনে॥"

এরূপ অসবর্ণ বিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহের নিয়ম সত্য ত্রেতাদি আদিম যুগেই ছিল, কলি প্রারম্ভে ইহা বর্জ্জিত বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। কলিকালের কোনও আর্য্য এই প্রকার অনুগমন করেন নাই। পুরাণাদি শাস্ত্রে দেখা যায়, এই অসবর্ণ বিবাহ কলিকালের প্রথমে মহাত্মাগণ কর্ত্তৃক ব্যবস্থা পূর্ব্বক নিবারিত হইয়াছিল।

পুনর্বিবাহ।

মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি প্রাচীন মহর্ষি কুলের ব্যবস্থা পুস্তক অনুশীলন করিলে পূর্ব্বকালের বিবাহ তত্ত্ব উত্তমরূপে জানা যায়। সেই সকল আর্ষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া আমরা অনেক কথা বলিয়াছি এবং অনেক কথা বলিতে অবশিষ্ট আছে। এ পর্য্যন্ত যে কিছু বলা হইয়াছে, সমস্তই কন্যা বিবাহের কথা, কিন্তু একণে স্ত্রী বিবাহ বা পুনর্বিবাহ সম্বন্ধীয় গুটিকতক কথা বলিতে ইচ্ছা করি। পুনর্বিবাহ কি? কিরূপ অবস্থায় বিবাহিতা কন্যার দ্বিতীয়বার বিবাহ হইত, তাহা মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি মহর্ষিকুলের ব্যবস্থা পুস্তক দেখিলে জানা যায়। আজ কাল যাঁহারা বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিতে ইচ্ছুক এবং যাঁহারা তাহা নিবারণ করিতে বদ্ধপরিকর,

---

* ক্ষত্রিয়দিগের ব্রাহ্মণ কন্যা বিবাহ করিবার অধিকার ছিল না বটে, কিন্তু দৈবাৎ কোন কোন ঘটনায় এবং কন্যা পিতার অনুমতি ক্রমে কখন কখন ক্ষত্রিয় রাজাগণ ব্রাহ্মণ কন্যার পাণি গ্রহণ করিতেন, করিলে দোষ হইত না। যেমন যযাতি রাজা ব্রাহ্মণ কন্যা দেবযানির পাণিগ্রহণ করিয়াও নিন্দনীয় হন নাই।

তাঁহারা উভয়েই এই প্রস্তাব পাঠ করিলে, দেখিবেন, পূর্ব্ব কালের হিন্দুসমাজ কিরূপ ভাবে পরিচালিত হইত।

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য কন্যা লক্ষণ বিচারকালে বলিয়াছেন যে, অনন্য পূর্ব্বিকা কন্যাই বিবাহ করিবেক, অন্য পূর্ব্বিকা কন্যা বিবাহ করিবেক না। * এই বাক্যের দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, তৎকালে দৈবাৎ বা কদাচিৎ কেহ এইরূপ কন্যা বিবাহ করিত, তাহা নিবারণ করাই উদ্দেশ্য। অন্য পূর্ব্বিকা দুই প্রকার হইতে পারে, ইহাও উক্ত যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি উপদেশ করিয়াছেন। যথা—

"অক্ষতা চ ক্ষতাচৈব পুনর্ভূঃ সংস্কৃতা পুনঃ।
স্বৈরিণী যাপতিংহিত্বা সবর্ণংকামতঃ শ্রয়েৎ ॥"

অক্ষতা ও ক্ষতা, দুই প্রকার কন্যা বিবাহ সংস্কারে সংস্কৃতা হইলে পুনর্ভূ বলিয়া গণ্য হইবেক। পরন্তু যে নারী পতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাম বশগা হইয়া অন্য কোন সবর্ণ পুরুষকে আশ্রয় করে, পতিত্ব গ্রহণ করে, সে স্বৈরিণী বলিয়া গণ্য। ব্যাখ্যাতৃগণ বলিয়াছেন,—"যেনকেনচিৎ পুরুষেণ সহ সঞ্জাত বিবাহ। সংস্কার দূষিতা ন তু তেনোপভুক্তা সাহি অক্ষতা ইত্যুচ্যতে।"

কেবল মাত্র বিবাহ সংস্কার হইয়াছে, কিন্তু কোন প্রকারে পতি সংসর্গিণী হয় নাই, এরূপ নারী অক্ষতা বলিয়া গণ্য। আর যে নারী বিবাহ সংস্কার না হইতেই পুংসংসর্গ দোষে দূষিতা হয়, সে ক্ষতা বলিয়া গণ্য। এই দ্বিবিধ নারীই পুনর্বিবাহের দ্বারা সংস্কৃত হইলে পুনর্ভূ আখ্যা প্রাপ্ত হইবে; কিন্তু যদি কাম প্রযুক্তা হইয়া পতি পূর্ব্বক অন্যকোন সবর্ণ পুরুষের আশ্রয় লয়, পতীত্ব গ্রহণ করে, তাহা হইলে সে স্বৈরিণী বলিয়া গণ্য; সুতরাং সে পুনর্বিবাহ যোগ্যা নহে।

কি বুঝিলেন? যাজ্ঞবল্ক্যের এই উক্তিতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, পূর্ব্বে হিন্দু সমাজে মধ্যে মধ্যে অক্ষতা কন্যার বিবাহ হইত, পরন্তু তাহা কিছু ঘৃণিতা থাকিত। তাদৃশ নারীরা পুনর্ভূ সংজ্ঞায় অভিহিতা হইত, তাহাদের সন্তান ধারাও পৌনর্ভব বলিয়া উপহাসিত হইত। অপিচ বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, কিরূপ কারণ বর্ত্তমান থাকিলে সজাতি বিবাহ সংস্কারা অক্ষতা নারীর পুনর্বিবাহ ঘটনা হইতে পারে। বোধ হয় সকলেই একবাক্যে বলিবেন যে, হয় পতি-কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা, না হয় বিধবা, এই দুয়ের অন্যতর ঘটনা না হইলে তাদৃশী নারীর বিবাহ ঘটনা হইতে পারে না। মহর্ষি মনু বলিয়া গিয়াছেন ;—

"যা পত্যা বা পরিত্যক্তা বিধবা বা স্বয়েচ্ছয়া।
উৎপাদয়েৎ পুনর্ভূত্বা স পৌনর্ভব উচ্যতে ॥
সা যে দক্ষতযোনিঃস্যাৎগত প্রত্যাগতা পিবা।
পৌনর্ভবেন ভর্ত্রাসা পুনঃ সংস্কার মর্হতি ॥"

"স্বেচ্ছয়া পুনর্ভূত্বাঅন্যস্য পুনর্জায়া ভূত্বা যং উৎপাদয়েৎ স পুত্রঃ পৌনর্ভব ইতি যোজনা। সা চেদিতি। সা উভয় বিধাপি স্ত্রী যদি অক্ষত যোনির স্যাৎ, তদা পৌনর্ভবেন ভর্ত্রা সহ পুনর্বিবাহাখ্যং সংস্কার মর্হতি। অপি বা যাস্ত্রী গত প্রত্যাগতা কৌমারং পতিং পরিত্যাজ্য অন্য আশ্রিত্য পুনঃ প্রত্যাগতা সতী যদ্যক্ষতা। ভবেৎ সাপিতেন কৌমারেণ ভর্ত্রা পুনর্বিবাহ মর্হতি। এবঞ্চ ক্ষতায়া বিধবায়া সধবায়া বা দ্বিতীয়েন পত্যা সহ পুর্বিবাহো ন ভবতীতি মহাশয়ঃ।"

এই সকল কথার সংক্ষিপ্ত অর্থ এই যে, মনুর মতে বিধবাই হউক, পতি পরি-

* বচনটী পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

ত্যাক্ত * সধবাই হউক, ক্ষতা হইলে তাহার আর পুনর্বিবাহ নাই, কিন্তু অক্ষতা হইলে তাহার বিবাহ আছে। পরন্তু আর্যকালে তাহা সদাচার বলিয়া গ্রাহ্য ছিল, কেবল পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ তাহাকে কদাচার ও সমাজ বিরুদ্ধ বলিয়াছেন। তজ্জন্যই তাঁহারা পুনর্ভূস্ত্রী ও পৌনর্ভব পুত্র সমাজ মধ্যে অপমান ভাগিনী ও অল্প মানভাগী এরূপ উল্লেখ করিতে সাহসী হইয়াছেন। এই আচার নিষেধ করা তাঁহাদের সম্পূর্ণ অভিপ্রেত হইলেও তাঁহাদের সময়ে এককালে নিবারিত হয় নাই। ধর্ম্ম শাস্ত্র অনুশীলন দ্বারা স্পষ্ট বোধ হইতেছে—বিধবা বিবাহ শাস্ত্র ও যুক্তি বিরুদ্ধ নহে, কেবল সামাজিক আচার বিরুদ্ধ। আমরা এ গুরুতর বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিতে প্রস্তুত নহি, কিন্তু সমাজ সংস্কারক মহোদয়গণ বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক উপস্থিত সময়োপযোগী যথা কর্ত্তব্য কার্য্য করিয়া সমাজের হিত সাধন করিবেন।

শ্রীরামদাস সেন।

* "পতি পরিত্যক্তা" উল্লেখের দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় পূর্ব্বকালে ডাইভোর্স আইন প্রচলিত ছিল।

জ্ঞানী কার্লাইল।

মানব সমাজের এমন এক অবিবর্ত্তিত ও অবিকশিত অবস্থা ছিল, যখন জড়-শক্তি ভিন্ন অন্য কোন শক্তি মানবের অনুভূতির বিষয় ছিল না। সেই জড়োপাসনার যুগের পরে যখন সমাজ কিয়ৎ পরিমাণে জ্ঞানে ও সৌভাগ্যে উন্নীত হইল,—জ্ঞানের সুবিমল আভা মানবের চিদাকাশে একটু একটু প্রকাশিত হইল, তখন মানবের শক্তিজ্ঞান আর এক গ্রাম ঊর্দ্ধে উপনীত হইল,—জড়-শক্তি (material force) ছাড়িয়া জৈবনিক পাশব-শক্তিতে (organic brute force) উপস্থিত হইল। সভ্যতা ও বিজ্ঞান যখন অল্পে অল্পে ঘোর অজ্ঞানান্ধকার ঘুচাইয়া অপূর্ব্ব স্বর্গীয় জ্যোতি মানব সমাজে বিস্তার করিল, তখনই মানব বুঝিতে পারিল যে, সকল শক্তির মূল শক্তিই চিৎশক্তি (Sychic force.) বর্ত্তমান যুগে কার্লাইল সেই চিৎ-শক্তির প্রাধান্য জগতে জলদ-গম্ভীর স্বরে প্রচার করিয়াছেন। ঐ যে সুশোভিত অট্টালিকা তোমার নয়নানন্দ বর্দ্ধন করিতেছে, আর ঐ যে প্রতিমা তাহার রূপচ্ছটায় তোমাকে বিমুগ্ধ করিতেছে,—সংক্ষেপত যে সমস্ত মানবীয় ক্রিয়া কলাপ বিশ্ব সংসার ব্যাপিয়া রহিয়াছে, সমস্তই মানবের চিৎ শক্তির ক্রিয়া,—চিৎ-শক্তি জৈবনিক শক্তিতে, এবং জৈবনিক শক্তি, জড়-শক্তিতে পরিণত হইয়া এই সমস্ত আশ্চর্য্য ও আনন্দজনক ব্যাপার সংঘটিত করিতেছে। চিন্তা-শক্তি ও চিৎশক্তি অবিকৃত ভাবে সাহিত্যে সংনিবদ্ধ। তজ্জন্যই, বর্ত্তমান যুগে মানব সমাজের উন্নতির যত প্রকার উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে, সাহিত্য তন্মধ্যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। মানব সমাজে সাহিত্যের প্রভাব অতি আশ্চর্য্য। যখনই কোন সুপণ্ডিত চিন্তাশীল ব্যক্তি, তাঁহার ভাবশিশু গুলিকে সাহিত্যের সুরম্য পরিচ্ছদে সুশোভিত করিয়া জগৎকে উপহার দেন, তখনই কোন গূঢ় অলক্ষিত শক্তি জগতে

প্রবেশ করে। পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের যাথার্থ্য অনুভব করিতে হইলে, বর্ত্তমান শতাব্দীর সভ্য জগতের ইতিহাস কথঞ্চিত পর্য্যালোচনা করিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে। কিয়ৎদিবস পূর্ব্বে ইংলণ্ডে জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল্, ও ফ্রান্সে অগষ্ট কোমৎ কি দুর্দ্দমনীয় প্রভাবে মানবের চিন্তা-রাজ্যে রাজত্ব করিয়াছেন,তাহা কাহারই অবিদিত নাই। তাহার পূর্ব্বে ফরাসী দেশে রুশো ও ভল্টেয়ার, তাঁহাদের লেখনী প্রভাবে যে কি লোমহর্ষণ ব্যাপার উৎপাদন করিয়াছিলেন, ইতিহাস-পাঠক তাহাও অবগত আছেন। আজ কাল স্পেন্সার, হাক্সলে প্রভৃতি লেখকগণ শিক্ষিত সমাজে কিরূপ বরণীয়, তাহাও সকলে জানেন। বর্ত্তমান যুগে সাহিত্য জগতে প্রথিত-নামা ব্যক্তিদিগের মধ্যে কার্লাইল অদ্বিতীয়; সচরাচর তিনি চেল্‌শিয়ার ভবিষ্যদ্বক্তা (Chelsian prophet) বলিয়া অভিহিত হন। মিরাবোর বর্ণনায় তিনি বলিয়াছিলেন—"He was a man, not with logic-spectacles but with eyes." এই কথা সর্ব্বথা তাহাতেই প্রযুক্ত হইতে পারে। বাস্তবিকই তিনি ভবিষ্যদ্বক্তা। নৈয়ায়িকেরা যুক্তি মার্গে তাঁহাদের সিদ্ধান্তে উপনীত হন, কিন্তু তিনি একদৃষ্টিতে সমস্ত বিষয় দেখিতেন। যদি তাঁহাকে দার্শনিক শ্রেণীর মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিতে হয়, তবে তাঁহাকে (Subjective idealists) শ্রেণীর অন্তর্ভূত করিতে হইবে।

জ্ঞানী কার্লাইল শিশু-কাল হইতে তাঁহার প্রৌঢ়-সুলভ চিন্তাশীলতার ও মৌলিকতার নিদর্শন জগতের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন। তাঁহার জীবন সরলতায় বর্দ্ধিত ও সরলতায়ই পরিণত, তিনি অতি সামান্য অবস্থা হইতে আপনাকে উন্নত করেন। যেমন প্রকৃতির ভাণ্ডারের অমূল্য রত্ন, আর্য্য-কবিদিগের আদরের নলিনী, পঙ্ক হইতেই উৎপন্ন হয়, তেমনি প্রকৃতির বর-পুত্র, জ্ঞানী-শ্রেষ্ঠ কার্লাইল, স্কটলণ্ডের অন্তঃপাতী ডাম্ফ্রেসেয়ারের সজল প্রদেশ হইতে সমুদ্ভূত। তিনি অতি সামান্য আহার বিহারে পরিতুষ্ট থাকিতেন। কার্লাইলের জীবনের ঘটনা লিপি বদ্ধ করা অপেক্ষা,তাঁহার চিন্তা-কাননে প্রবেশ করিয়া ফুল্ল কুসুম সংগ্রহ করা উচিত। তাহাদের সৌরভ অনন্ত কাল জগতে পরিব্যাপ্ত থাকিবে। তাঁহার চিন্তা প্রসূত গ্রন্থ নিচয় দুই মহাভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, (১ম) সাধারণ গবেষণা ও চিন্তা পূর্ণ গ্রন্থ, (২য়) ঐতিহাসিক গ্রন্থ। প্রথমোক্ত শ্রেণীর গ্রন্থাবলির মধ্যে Sartor Resartus ও Hero-worship সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। Sartor Resartus সাহিত্য জগতে এক অপূর্ব্ব রত্ন। মানব-প্রতিভার অচিন্ত্য শক্তির পরিচায়ক মিশরের জগদ্বিখ্যাত পিরামিড্ কালের অনন্তসাগরে বিলীন হইতে পারে, মুসলমান রাজত্বের সৌভাগ্য-চিহ্ন আগ্রার সুরম্য তাজমহলও কালে শূন্যে মিলাইয়া যাইতে পারে, কিন্তু এই গ্রন্থের গভীর ভাবগুলি মানবের চিন্তা রাজ্য হইতে কখনও আর ধ্বংশ হইবে না। যত কাল পৃথিবীতে মানব প্রতিভার আদর থাকিবে, ততকাল কার্লাইলের গভীর চিন্তার আদর থাকিবে। এই গ্রন্থ পর্ব্বতের নিভৃত কন্দরে রচিত হইয়াছিল। জগতে, অনেক সময়ে যে মহামূল্য রত্নরাজিও নিতান্ত অপদার্থ বলিয়া উপেক্ষিত হয়, তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত কার্লাইলের Sartor Resartus; প্রথমে কোন প্রকাশক

এই গ্রন্থ প্রকাশে সাহসী হন নাই, শেষে অতি কষ্টে ফ্রেজারস্ মেগেজিন্ নামক সাময়িক পত্রে খণ্ডশ প্রকাশিত হইয়াছিল। কিছুকাল পরে এমেরিকায় এমার্শনের প্রযত্নে ঐ সমস্ত প্রবন্ধ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। আজ কাল্ ইংরেজী-পাঠজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই ইহার আদর করিয়া থাকেন। গিরিশৃঙ্গের বিজন চিন্তার ফল এই মহা গ্রন্থ ১৮৩১ অব্দে রচিত হয়। এই পুস্তক খানি এক বিবিধ-পণ্য-পরিপূর্ণ বিপণি, জীবনবেদের যে অধ্যায়ের দিকে চাও, তাহারই কিছুনা কিছু গূঢ় রহস্য ইহাতে অভিব্যক্ত দেখিবে।

কার্লাইল, প্রকৃতির বিষয় চিন্তা করিতে করিতে, প্রকৃতির যবনিকার অন্তরালস্থিত পুরুষকে ভাবিলেন এবং অদ্বৈতবাদীদিগের ন্যায় প্রকৃতি ও পুরুষকে এক করিয়া বলিলেন ;—"Or what is Nature? Ha why do I not name thee God? Art not thou the living garment of God?" "অথবা প্রকৃতি কি? আ! তোমাকেই কেন ঈশ্বর বলি না। তুমিই কি ঈশ্বরের জীবন্ত পরিচ্ছদ নও?"

"চিন্তাশীল মনুষ্যের জীবনে, এমন এক চিন্তা পরিপূর্ণ, মধুর অথচ ভয়াবহ সময় উপস্থিত হয়, যখন ভয়ে ও বিস্ময়ে সে আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা করে, আমি কে, তখন সংসার তাহার কোলাহলময় ব্যাপার লইয়া দূরে পলায়ন করে; তাঁহার দৃষ্টি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া সেই শূন্য আকাশময় গাম্ভীর্য্যে উপনীত হয়, তখন জগৎ আর সেই একাকী সংলাপ করে,—আমি কে? একটী শব্দ, একটী গতি, অথবা একটী ছায়া,অথবা অবিনাশী আত্মার একটী শরীরী পরিদৃশ্যমান ভাব? আমি চিন্তা করি, অতএবই আমি আছি। বাস্তবিকই আমি এখন আছি এবং কিছু পূর্ব্বে ছিলাম না, কিন্তু কোথা হইতে আসিলাম? কি রকমেই বা আসিলাম? এবং কোথায়ই বা যাইব?"

"কস্ত্বং কথং কুত আয়াতঃ?
তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ॥"

"এই প্রশ্নের উত্তর সহস্র রূপী, সহস্র-ভাষী সমগ্র প্রকৃতির সমস্ত বর্ণে ও সমস্ত গতিতে লিখিত ও প্রত্যেক আনন্দ ও শোকের ধ্বনিতে উচ্চারিত। কিন্তু যাহার দ্বারা এই ঈশ্বর লিখিত গ্রন্থের ভাব উদ্ধার হইতে পারে, এমন চক্ষু ও কর্ণ কোথায়? আমরা যেন এক অসীম ছায়াবাজির গৃহে অথবা এক স্বপ্ন কাননে বসিয়া আছি; কিন্তু সেই জাগ্রত পুরুষ, এই সমস্ত স্বপ্ন যাঁহার ক্রিয়া, তাঁহাকে দেখিতে পাই না।" আবার তিনি মনোবিজ্ঞান, গণিত ও সমাজ বিজ্ঞানের সংজ্ঞা, স্বতঃসিদ্ধ ও স্বীকার্য্য গুলিকে কেমন তন্ন তন্ন করিয়া তাহাদের অসারতা প্রতিপাদন করিয়াছেন।

কার্লাইল দেখিলেন, মানব সুখ সুখ করিয়া উন্মাদের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, যতই সুখ ভোগ করিতেছে, ততই সুখ-লালসা বৃদ্ধি হইতেছে—তৃপ্তি কিছুতেই হয় না, তাই বলিতেছেন ;—

"The fraction of life can be increased in value not so much by increasing your Numerator as by lessening your Denominator Unity itself divided by zero will give infinity. Make thy claim of wages a zero, then thou hast the whole world under thy foot."

কি চমৎকার রহস্য, অতি সংক্ষেপে ও সহজ ভাষায় অভিব্যক্ত হইল! তিনি বলিতেছেন, হর ন্যূন করিলে মানবজীবন ভগ্নাংশের

মানের যত বৃদ্ধি হয়, লব বৃদ্ধি করিলে তত হয় না, এক (১) এই সংখ্যাও যদি শূন্য দ্বারা বিভক্ত হয়, তবে ভাগ ফল অনন্ত হইবে। ($\frac{1}{0} = L$ অথবা অনন্ত)। তোমার পারিশ্রমিকের আশা শূন্য কর, সমস্ত জগত তোমার পদতলে আসিবে। হে মানব, কেবল সুখ লালসাকেই উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে কেন অধিরোহণ করাও। ঐ লালসাই তোমার সুখের পথে কণ্টক, বাসনা যতই বৰ্দ্ধিষ্ণু হইবে, তোমার সুখ-লাভের সম্ভাবনা ততই হ্রস্ব হইবে। আর্য্য নীতিজ্ঞেরাও তাই বলিয়াছেন—"নজাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি, হবিষা কৃষ্ণ—বৰ্ম্মেব ভূয় এবাভি বৰ্দ্ধতে।" কি আশ্চর্য্য! এই মহামন্ত্র সাধন করিবার জন্যই না গৌতম, রাজ্য সম্পদে পদাঘাত করিয়া, অঙ্কশায়িনী সৌভাগ্যলক্ষ্মীর প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, পিতা শুদ্ধোদন ও মাতা মায়াদেবীকে ঘোর শোক-সাগরে নিক্ষেপ করিয়া, গহন কাননে ও পৰ্ব্বত কন্দরে আশ্রয় গ্রহণ করেন? বৌদ্ধ যোগীরাও এই মহাসত্য লাভ করিয়া নির্ব্বাণের জন্য ঐহিক সুখে জলাঞ্জলি দিতেন।

একদা এই সত্য, যোগীতুল্য নিৰ্ব্বাক ও নিস্পন্দ হিমাচলের পাদদেশে নিনাদিত হইয়াছিল। আর ধীমান কার্লাইল স্কট্‌ল্যাণ্ডের পৰ্ব্বতময় প্রদেশে এই সত্য অন্যভাবে জগতকে উপহার দিলেন। ইহার সার মৰ্ম্ম ইয়ুরোপ এখনও বুঝিতে পারে নাই, দর্শন জনয়িত্রী ভারত ভূমিই এই সত্য প্রচারের লীলাক্ষেত্র। বাস্তবিকই যদি আমাদের সুখলালসা খৰ্ব্ব করি, ও জীবনের সুখ-নেষ্য বিষয় গুলি বিশ্ব স্রষ্টার প্রসাদ বলিয়া গ্রহণ করি, তবে কি আমাদের জীবন স্পৃহনীয় ও মধুময় হয় না? কার্লাইল বলিতেছেন;—"Love not pleasure—love God, this is the everlasting yea, wherein all Contradiction is solved, wherein whoso works and walks it is well with him."

অর্থ—"সুখ-ভোগেই ভালবাসা অর্পণ করিও না; ব্রহ্মকে প্রেম কর, ইহাই নিত্য সত্য, এখানে সমস্ত বৈপরীত্য দূর হয় (সমস্ত বিবাদ ভঞ্জন হয়) এবং এই ভাবে যিনি জীবন-পথে বিচরণ করেন এবং জীবনের কার্য্য সম্পাদন করেন, তাঁহার সৰ্ব্বাঙ্গীণ নিরাময় হয়।"

কার্লাইলের ধৰ্ম্ম মত কি ছিল, তাহা লইয়া তাঁহার জীবনী-লেখকদিগের মধ্যে ঘোরতর মত দ্বৈধ আছে। কেহ তাঁহার উপহাসের তীব্রতা, সাম্প্রদায়িকতার প্রতি কটাক্ষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাঁহাকে নাস্তিক শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট করেন, আবার কেহ তাঁহাকে অজ্ঞেয়তাবাদী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু যে কেহ তাঁহার গ্রন্থ সকল যত্ন সহকারে পাঠ করিয়াছেন, তিনিই তাঁহার গভীর আধ্যাত্মিকতা, ঈশ্বরে অটল বিশ্বাস, অনন্তে উচ্ছ্বাস ও আরাধনার ভাব প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন প্রত্যেক মহাপুরুষের জীবনেই পরিলক্ষিত হয়। প্রাণগত ধৰ্ম্ম কখনও বাহিরে প্রকাশ পায় না, এবং আমরা যে কোন ধৰ্ম্ম-সম্প্রদায়ভুক্ত হই না, আমাদের আত্মার গঠন যেমন ভিন্ন ভিন্ন, আমাদের ধৰ্ম্মমতও তেমনি ভিন্ন ভিন্ন হইবে। জগতের অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা সমূহ, সৃষ্টি কৌশল, প্রভৃতি দেখিয়া কার্লাইল বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া—নিরন্তর আরাধনা করিতেন। এই আরাধনার অভাব হেতু, বর্ত্তমান যুগের সভ্যতার প্রতি তাঁহার

এত বিদ্বেষ,এবং লোকের প্রশংসা করিবার শক্তি বিলোপ পাইতেছে বলিয়াই কার্লাইল নিরন্তর শোকাশ্রু ফেলিতেন। বর্ত্ত-বর্ত্তমান যুগের নাস্তিকতা ও অবিশ্বাসের প্রতি তাঁহার বিজাতীয় ঘৃণা ছিল, জগতের কোন (Mystic element) দুর্জ্ঞেয় রহস্যই নাই বলিলে তিনি ক্রোধে সংজ্ঞাশূন্য হইতেন। বৈজ্ঞানিকের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্য কার্লাইল বলিতেছেন ;—

"Science is the accumulated records of man's experience. These Scientific individuals have been nowhere, but where we also are, have seen some hand-breaths deeper than we see into the Deep that is infinite, without bottom, and without shore."

বিজ্ঞানকে কেমন উপযুক্ত সংজ্ঞায় ব্যাখ্যা করিয়া তিনি বলিতেছেন,—বিজ্ঞান মানবের সঞ্চিত ভূয়োদর্শনের লিপিবদ্ধ বিবরণ ; জ্ঞানসম্বন্ধে এসমস্ত বৈজ্ঞানিকেরাও যেস্থানে আমরাও সেই স্থানে। এই অতলস্পর্শ, তীরশূন্য অনন্ত সাগরের আমাদের অপেক্ষা হস্ত পরিমিত গভীরতর স্থান তাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন মাত্র।" বর্ত্তমান সময়ে অনেক জ্ঞানাভিমানী, স্থূলদর্শী বৈজ্ঞানিক তাঁহাদের অতি সামান্য জ্ঞানে গর্ব্বে স্ফীত হইয়া এই দুর্জ্ঞেয়, অসীম, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত তত্ত্ব অবগত হইয়াছেন বলিয়া জগতে ঘোষণা করিতেছেন। তাঁহারা যদি কার্লাইলের এই মহাবাক্য প্রাণের অন্তরতম স্থানে মুদ্রিত করিয়া রাখেন, তাহা হইলে বিনয় শিক্ষা হইবে এবং জ্ঞান গরিমাও খর্ব্ব হইবে।

বর্ত্তমান শতাব্দীর স্পর্দ্ধিত বৈজ্ঞানিকদিগকে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তাঁহাদের প্রশংসা করিবার শক্তি ও বিস্ময় প্রকাশের শক্তির অভাবের জন্য কতই ব্যঙ্গ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, সমস্ত বিষয়ের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে বলিয়াই যে সেগুলি আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, এমত নহে, জগতের সৃষ্টির দুর্জ্ঞেয়তা ও অত্যাশ্চর্য্য কৌশলের বিষয় সকলেই স্বীকার করেন, কিন্তু এই সৃষ্টিও যদি বুঝিবার ঘটে, তবে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই থাকে না। কি মূর্খতা! কার্লাইল বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি বিস্ময় প্রকাশ করিতে পারে না, অথবা স্বভাবতই বিস্ময় প্রকাশ (এবং আরাধনা) করে না, সে অসংখ্য রয়াল সোসাইটির (ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান সমিতির) সভাপতি হইলেও এবং বিজ্ঞান ও দর্শনের গভীর তত্ত্ব সমূহ তাহার মস্তিষ্কের আয়ত্ত হইলেও তিনি এক যোড়া চস্মা—তাহার পশ্চাতে চক্ষু নাই।

প্রেম সম্বন্ধে তাঁহার মত অত্যন্ত উন্নত। প্রেমের বিশ্বজনীন ভাব তিনি অতি দৃঢ় ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। "Love is not altogether a delirium, yet has it many points in common therewith. I call it rather a discerning of the infinite in the finite, * * which discerning may be either true or false, either seraphic or demonaic, Inspiration or Insanity." "প্রেম একেবারেই এক অস্বাভাবিক উত্তেজনা নয়,কিন্তু অনেক বিষয়ে ইহার সহিত সৌসাদৃশ্য আছে, আমি ইহাকে বরং সসীমে অনন্ত নিরীক্ষণ বলিব। এই নিরীক্ষণ সত্যও হইতে পারে মিথ্যাও হইতে পারে, দৈব ক্রিয়াও হইতে পারে, পৈশাচিক ক্রিয়াও হইতে পারে, অনুপ্রাণনাও হইতে পারে, উন্মত্ততা হইতে পারে।"

সংসার-রঙ্গভূমিতে মানব যে যে ভাবে

অবতীর্ণ হইয়া অভিনয় ব্যাপার সম্পন্ন করে, কার্লাইল সেই সমস্ত ভাব বিন্যাসে অত্যাশ্চর্য্য কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রকৃতির যবনিকা উত্তোলন করিয়া, তদন্তরালস্থিত মহাপুরুষকে সন্দর্শন করাই তাঁহার জীবনের উচ্চতম ব্রত হইয়াছিল। প্রকৃতির অবিকৃত ও অকৃত্রিম শোভা পর্য্যবেক্ষণ করিতে তিনি এত আনন্দ প্রকাশ করিতেন যে, সে আনন্দ সময়ে সময়ে বাতুলতায় পরিণত হইত। পরস্পর বিরোধী ভাবের সমাবেশই তাহার রচনার প্রাণ-মন-মুগ্ধকারিতার বিশেষ কারণ। কোথাও ভাবস্রোত অনাবিল ভাবে, মৃদুমন্দ গমনে নাচিয়া নাচিয়া পাঠকের মনে প্রীতির সঞ্চার করে, কোথাও ইহার প্রচণ্ড তরঙ্গ-নিচয় বীভৎস ভাবের উদ্রেক করে, আবার কোথাও বা, নিন্দা ও শ্লেষের কশাঘাতে দাম্ভিকের অভিমান বিদূরিত করিয়া দেয়—শেষোক্ত শ্রেণীর রচনাই কার্লাইলের বিশেষ ক্ষমতার পরিচায়ক, এ বিষয়ে তিনি বাট্লার ছুইফট, লুসিয়ান প্রভৃতির সমকক্ষ।

একটী বৃন্তে যেমন তিনটী ফুল প্রস্ফুটিত হইয়া বনের তিন দিক্ আমোদিত করে, তেমনি, একই ভাবের প্রচারক, ইংলণ্ডে কার্লাইল, এমেরিকায় এমার্শন এবং ফ্রান্সে ভিক্টর হুগো, তিন সুসভ্য দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার পূতিগন্ধময় নাস্তিকতা প্রশমিত করিয়া, বিনয় বিমিশ্র সৌরভ বিস্তার করিয়াছিলেন। তিন জনেই মনুষ্যের ক্ষুদ্রতা, নিরালম্ব ভাব, এবং প্রকৃতির দুজ্ঞেয়তা ও মহত্ত্ব প্রাণে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এই সত্য প্রচারই তাঁহাদের জীবনের একমাত্র ব্রত হইয়াছিল।

বর্ত্তমান সময়ে মনুষ্যের কর্ম্ম কাণ্ড সম্বন্ধে অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি অনেক মতের অবতারণা করিয়াছেন। কেহ কেহ লোকের কর্ম্মকারিতাকেই জীবনের সুখের একমাত্র উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আবার কেহ বা এইরূপও বলেন যে, জীবনে বিশ্রামান্বেষণই মানবের স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়, মানব বিশ্রামান্বেষণ করে বলিয়াই যন্ত্রাদির অবতারণা। কার্লাইল পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর সর্ব্বপ্রধান এবং স্পেন্সার পশ্চাতোক্ত শ্রেণীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই দুই মতের মধ্যে কোন মত সত্যের অধিকতর নিকটবর্ত্তী, তাহা চিন্তাশীল পাঠক নির্দ্ধারণ করিবেন, কিন্তু ইহা নিশ্চয় বলা যাইতে পারে যে, মানবের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে কার্লাইল যেমন সুন্দর যুক্তিযুক্ত কথা বলিয়াছেন, এমন আর কেহই বলেন নাই। তিনি জলদ গম্ভীর স্বরে মানবকে বলিতেছেন ;—

"Do the duty which lies nearest thee. Work while it is called to day, for the Night cometh, wherein no man can work." তোমার নিকটতম কর্ত্তব্য সম্পাদন কর—অদ্যই কর্ম্ম কর, কারণ নিশা আগমন করিতেছে। এবং নিশাগমে কোন মানবেরই কর্ম্ম করিবার সাধ্য নাই।" সমাজ সংস্কার, ও জগতের অন্যান্য কল্যাণকর ব্যাপারে লিপ্ত হওয়া কতদূর যুক্তিসঙ্গত, তাহা লইয়াও আজ কাল চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের মধ্যে একটু মতের বৈপরীত্য আছে। কেহ কেহ বলেন, সমাজ আপনা হইতেই বিবর্ত্তিত হইয়া ক্রমে উন্নত হইতে উন্নততর অবস্থায় উপনীত হইতেছে। আমরা এই বিশাল সমাজ-বারিধির বুদ্বুদ, আমাদের উৎপত্তি, অবনতি ও ক্রিয়া কলাপ সমস্তই সেই বারিধির ক্রিয়া সম্পাদনের উপর নির্ভর করে। কোন সংস্কারকই সমা-

জকে অভিলষিত অবস্থায় টানিয়া লইয়া যাইতে পারেন না। যাঁহারা সমাজকে একটা বিস্তীর্ণ জৈবনিক (Organism) বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, তাঁহাদের মতে যে অনেক সত্য আছে, তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু অনেকেই এই মতের প্ররোচনায় সংস্কার কার্য্য হইতে বিরত হন। কার্লাইল তাঁহার প্রতিভা-পূজা নামক প্রবন্ধে এই ভ্রম-সঙ্কুল মতের ঘোর প্রতিবাদ করিয়াছেন।

পিউরিটান সম্প্রদায়ের নেতা ক্রমোয়েল সম্বন্ধে অনেক ঐতিহাসিক ও সমালোচকেরই ভ্রম-সঙ্কুল বিশ্বাস ছিল, সকলেই তাঁহাকে ঘোর কপটী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের মহত্ব ও গভীর আধ্যাত্মিকতা তাঁহারা বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। প্রতিভা-পূজক কার্লাইল, পূর্ব্ব হইতেই এই সমস্ত ঐতিহাসিকের সিদ্ধান্তে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই। তিনি অদম্য উৎসাহ ও প্রভুত অধ্যবসায়ের সহিত তৎকালীয় পার্লেমেন্টের কাগজ পত্র অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করেন। বহুকালব্যাপী গবেষণার পর, তিনি ক্রমোয়েলের জীবনী প্রকাশ করেন। তিনি ক্রমোয়েলের জীবনের প্রত্যেক ঘটনায়, তাঁহার সরলতা ও অত্যাচারীর প্রতি বিজাতীয় ঘৃণার ভাব দেখাইয়াছেন। যে ব্যক্তি অতি সামান্য অবস্থা হইতে, সরলতার ও স্বদেশহিতৈষণার প্রভাবে রাজ্যের শীর্ষ স্থানীয় হইয়াছিলেন, তাঁহাকে কপটী বলিয়া স্থির-সিদ্ধান্ত করা তাঁহার নিকট অত্যন্ত একদেশদর্শিতার কার্য্য বলিয়া বোধ হইয়াছিল। প্রতিভা-পূজা নামক প্রবন্ধ, নিপুণ শিল্পীর শিল্পনৈপুণ্য যথেষ্ট প্রকাশ করিয়াছে। ইংরাজী ভাষায়, এই রূপ গ্রন্থ আর কয়খানি আছে, জানি না। ইংরেজী ভাষায় বার্ক ও সেরিডেনের বহ্নিময়ী বক্তৃতা জগদ্বিখ্যাত, কিন্তু কার্লাইলের এই গ্রন্থ ঐ সমস্ত বক্তৃতা অপেক্ষাও অধিক মনোহর ও উদ্দীপনা পূর্ণ। সাধু ও মহাজনগণের মাহাত্ম্য তিনি যত উপলব্ধি করিয়াছেন, আর কেহ তাহা করিবেন না। বিভিন্ন দেশের কবি, সমাজ সংস্কারক, ধর্ম্ম সংস্থাপক, ও লেখকদিগের মহত্ব ও প্রতিভা তিনি যে প্রকার হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, আর কে সেরূপ পারিবে? মহম্মদ, কবি বার্নস, নেপোলিয়ান্, গেটে, জনসন্ প্রভৃতির জীবনচরিত ত অনেকেই পাঠ করিয়া থাকেন, কে তাঁহাদের প্রতিভা, শক্তি ও প্রভাব এ প্রকার অনুভব করিয়া থাকেন? তিনি দোষ গ্রহণে ও অন্যান্য খুটি নাটি লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন না। আর্য্য কবি বলিয়াছেন;—

"অনন্ত শাস্ত্রং বহুবেদিতব্যং।
স্বল্পশ্চ কালো বহবশ্চ বিঘ্নাঃ॥
যৎ সারভূতং তদুপাসিতব্যং।
হংসো যথা ক্ষীর মিবাম্বুমিশ্রম্॥" শঙ্কর।

অনেকেইত জীবনচরিত পাঠ করিয়া থাকেন, কি গুণে মহাজনগণ বন্দনীয়, তাহা কয়জনে অনুধাবন করিয়া থাকেন? কার্লাইল সত্য সত্যই জলমিশ্রিত দুগ্ধ হইতে দুগ্ধটুকু চুষিয়া লইতেন, তিনি প্রত্যেক মহাপুরুষদিগের জীবনেই এই সত্যটী প্রতিভাত দেখিয়াছেন যে, সরলতা, ও চরিত্রের দৃঢ়তা ব্যতীত প্রতিভার সম্যক্ বিকাশ হয় না। "মানব-জীবন, অজাত-শ্মশ্রু বালকের ক্রীড়া কন্দুক নয়—ইহা সেই দুর্জ্ঞেয় আদিকারণের একটী বিধান।" আজ কাল অনেক স্থূলদর্শী দার্শনিক মানব-জীবনকে

এক আণবিক ক্রিয়া মনে করেন, ইহার মহত্ত্ব ও গুরুত্ব তাঁহাদের অনুভূতির বিষয় নহে, তাঁহারা কার্লাইলের এই গ্রন্থ খানি পাঠ করিলে মানবের স্বাভাবিকী শক্তি ও প্রতিভা কতদূর বিকশিত হইতে পারে, তাহা বুঝিতে পারিবেন। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, জগতের ইতিহাস কার্য্যত এই মহাপুরুষদিগের জীবন কাহিনী ভিন্ন আর কিছুই নহে।

কার্লাইল মানব প্রতিভার অনির্ব্বচনীয় শক্তি-মত্তা বিলোকন করিয়াই বোধ করি মহাপুরুষদিগের জীবনের ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট বিশেষত্ব—মতের অবতারণা করিয়াছেন। এই মতটী ভ্রমাত্মক কি না, তাহা বলিতে চাই না; কিন্তু যিনি জ্ঞাননেত্রে একবার মানবের ক্রিয়াকলাপ সন্দর্শন করেন, তিনিই ইহার দূরদর্শীতা দেখিয়া অবাক্ হইবেন। যখনই ভাবা যায় যে, মানব, প্রকৃতির শক্তি গুলিকে করায়ত্ত করিয়া, অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার সমস্ত সম্পাদন করিতেছে, তখনই মানব শক্তি অসীম বলিয়া প্রতীত হয়। ক্রমে ক্রমে বিকশিত হইয়া, ইহা কোথায় যাইয়া পৌছিবে, তাহা কে বলিতে পারে? এমন লোক কি কেহ আছেন, যিনি বলিতে পারেন, মানব শক্তির এই সীমা, ইহার পর পারে আর তাহার যাইবার সাধ্য নাই (Thus for and no further.)? মানব জাতির এই আশ্চর্য্য শক্তি দেখিয়া প্রত্যক্ষ-বাদীরা মানব-জাতি সাধারণকে পূজা করিয়া থাকেন। আর এক দিকে যখন ভাবা যায় যে, আমি একাকী, এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে আমার বলিবার কিছুই নাই, তখনই সমস্ত স্পর্দ্ধা ও গর্ব্ব শূন্যে মিশাইয়া যাইবে।

দ্বিতীয়তঃ।—ঐতিহাসিক গ্রন্থ নিচয়—ইহাদের মধ্যে ফরাসী রাষ্ট্র বিপ্লবের ইতি-হাসই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—এই গ্রন্থ খানিকে ঐতি-হাসিক গ্রন্থ নিচয়ের মধ্যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ স্থান দিলেও বোধ হয় যথেষ্ট হয় না। ঘটনার উল্লেখ প্রভৃতিতে অন্যান্য অনেক গ্রন্থ ইহা অপেক্ষা উচ্চ, কিন্তু ইতিহাস-বিজ্ঞান বলিলে যাহা বুঝা যায়, তাহা এই খানিই। গিবনের রোম সাম্রাজ্যের অবনতি ও পতনের ইতি-হাস অনেক পরিমাণে একখানি উপাদেয় ইতিহাস-বিজ্ঞান। কেবল কতকগুলি শুষ্ক নীরস ঘটনা লিপিবদ্ধ করিলেই কি ইতি-হাস লেখা হয়? যে সমস্ত গূঢ় ঘটনা এক এক জাতির উন্নতি ও অবনতির নিদান, তাহা কয়খানি-ইতিহাসে লিপিবদ্ধ থাকে? কেবল রাজা ও সম্রাটদিগের জন্ম মৃত্যু, ব্যভিচার বা অত্যাচারের কাহি-নীই কি ইতিহাস? কার্লাইল তাঁহার গ্রন্থে, প্রকৃত ইতিহাস কি, তাহা শিক্ষা দিয়াছেন। বাস্তবিক আমরা যাহাকে ইতিহাস বলি, তাহা কতকগুলি অর্থশূন্য কিম্বদন্তী মাত্র। এই ইতিহাসে জগতের একটা অনির্ব্বচনীয় ঘটনার আমূল বিবরণ কার্য্য-কারণ সূত্রে এবং দার্শনিকভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে কোথাও কবিজনোচিত মনোহারিণী বর্ণনা, কোথাও গণিতজ্ঞের সূক্ষ্ম গণনা, আর কোথায় নিন্দুকের তীব্র উপহাস। তিনি তাঁহার উপযুক্ত বিষয়ই বাছিয়া লইয়াছি-লেন। তিনি অতি সুন্দররূপে জাতীয় জীবনে স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষার অঙ্কুরোদগম, অত্যাচার প্রশমনার্থ দুর্ব্বলের প্রাণগত যত্ন ও অধ্যবসায়, এবং মত্ততার ক্ষীণবুদ্ধি প্রজার রুধির-পিপাসা বর্ণনা করিয়াছেন। আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় এই ইতিহাস এবং ইটালীর অভ্যুত্থানের ইতি-

হাস এবং হৃদয়বান্ ম্যাট্সিনি ও বীরশ্রেষ্ঠ গ্যারিবল্ডির স্বজাতি-প্রেমের বিবরণ, প্রত্যেকের অধ্যয়নীয়। এই ইতিহাসখানির সম্যক পর্য্যালোচনা করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। কার্লাইলই সর্ব্বপ্রথমে ইংলণ্ডে জর্ম্মান্ লেখকদিগের গবেষণা ও চিন্তাপূর্ণ লেখার স্বাদ গ্রহণ করেন। যদিও স্কট্ প্রভৃতি অনেক খ্যাত-নামা ব্যক্তি জর্ম্মান্ সাহিত্য ও দর্শনে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু কার্লাইল ভিন্ন কেহই জর্ম্মানদিগের চিন্তা-সুধা পান করেন নাই। আমাদের দেশে যাঁহারা বাস্তবিক বীণাপানির অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী, তাঁহাদের উচিত যে, উপযুক্ত যত্ন ও অধ্যবসায় সহকারে জর্ম্মান্ ভাষায় অধিকার লাভে প্রয়াসী হন। জর্ম্মানেরা আমাদের পূর্ব্ব পুরুষদিগের দর্শন কাব্য প্রভৃতি অত্যন্ত আগ্রহের সহিত অধ্যয়ন করিতেন, আমাদেরও কর্ত্তব্য যে তাহাদের চিন্তা কাননে প্রবেশ করি। ভাবরাজ্যে অন্যান্য ইয়ুরোপীয় জাতি অপেক্ষা জর্ম্মান দেশের সহিত আমাদের মিলন হইবার অধিক সম্ভাবনা। মনোবিজ্ঞান, ও ভাষা বিজ্ঞান আর কেন দেশে এত উন্নতি লাভ করে নাই। আর যে দেশের সাহিত্যে গেটে, সিলার, ফিক্‌টে, হিগেল, কান্ট প্রভৃতি মনস্বীগণের চিন্তা ও বাক্য নিবদ্ধ, তাহার অনুশীলন করিতে কাহার না সাধ হয়?

কয়েক দিন হইল, সুবিখ্যাত ইতিহাস-লেখক ফ্রুড্, কার্লাইলের জীবনী সাধারণ্যে প্রচার করিয়াছেন, তাহা পাঠে অনেকেই বিস্মিত হইয়াছেন। কার্লাইলের প্রতি যাঁহাদিগের বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল, তাঁহারাও বীত-শ্রদ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে, মানবের প্রতিভা যতই কেন উচ্চ শ্রেণীর হউক না, হৃদয়-রাজ্যের উপযুক্ত শাসনের অভাবে, অনেকেই এই সংসার-সাগরে অশিক্ষিত কর্ণধারের ন্যায়, জীবনতরী সময়ে সময়ে বিপথগামী করেন। অতএব আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই।

শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস।

ভবভূতি।

বীরচরিত।

রামচন্দ্রের লোকাতীত বিক্রমে, পরশুরাম পরাজিত হইলেন। ব্রহ্মতেজ, ক্ষত্রতেজের নিকট অভূতপূর্ব্ব পরাভব প্রাপ্ত হইল। আমরা বলিয়াছি যে, পরশুরাম অহঙ্কারের প্রতিমূর্ত্তি; জগতে যে তাঁহার অপেক্ষা কেহ বীর আছে, ইহা তাঁহার সহ্য হয় না। তিনি তপোবনে সকলকেই অবজ্ঞা করেন; অন্যের কথা দূরে থাকুক, সত্ত্বগুণ-প্রধান, গোত্র নিদান বশিষ্ঠ দেবের প্রাধান্য স্বীকার করিতেও তাঁহার অপমান বোধ হয়। যে দুর্জ্জয় অহঙ্কারে তিনি জগতস্থ প্রাণীগণকে তৃণ জ্ঞান করিতেন, রামচন্দ্রের ভুজবলে তাহা চূর্ণীকৃত হইল। পরশুরামের জীবনে, একটী ঘোরতর পরিবর্ত্তন, উপস্থিত হইল। গর্ব্বিত মাতৃহন্তা পরশুরাম, বিনীত ঋষি কুমার জামদগ্ন্যে পরিবর্ত্তিত হইলেন। কিন্তু তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী রামচন্দ্রের হৃদয়ে জয়লাভ করিয়াও অহঙ্কার

নাই, আত্মাভিমান নাই, ভুবনৈক ধনুর্দ্ধর পরশুরামকে পরাজিত করিয়াছি বলিয়া, গর্ব্ব নাই, গর্ব্বের কথা দূরে থাকুক, উল্লাস পর্য্যন্ত নাই। তাঁহার প্রশংসা শব্দে বিদেহ নগর মুখরিত হইতেছিল; পিতা দশরথ, শ্বশুর জনক, আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া, তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছিলেন; আত্মীয়গণ, তাঁহার অলৌকিক কর্ম্মে বিস্মিত হইয়া, তাঁহাকে অভিনন্দন ও আলিঙ্গন করিবার জন্য ব্যগ্র হইতেছিলেন; কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে আত্মপ্রসাদ পর্য্যন্ত নাই। তিনি যে কোন অমানুষ কার্য্য করিয়াছেন, যেন এ বিশ্বাসও তাঁহার হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হইতেছিল না। উল্লাস অনুভব দূরে থাকুক, তিনি আরও আত্মকৃত কার্য্যের জন্য কুণ্ঠিত।

তিনি পরশুরামকে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন; ভগবন্, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, যদি না বুঝিয়া অপরাধ করিয়া থাকি, আমাকে ক্ষমা করুন।

"দেবাৎ কৃত স্তয়িময়া বিনয়াপরাধ
স্তুবং প্রসীদ ভগবন্ অয়মঞ্জলিস্তে।"

পরশুরাম, রামচন্দ্রের পরাক্রমে বিস্মিত হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহার বিনয় বাক্য শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তিনি বলিলেন বৎস, তুমি আমার নিকট অপরাধ করিয়াছ? না,—বরং উপকারই করিয়াছ।

"অপরাদ্ধং বৎস; ত্বয়া জামদগ্ন্যস্য?
ন উপকৃতম।"

এই রূপ কথোপকথনের পর রামচন্দ্র ও পরশুরাম, উভয়ে একত্রে, বশিষ্ঠ,দশরথ প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য গমন করিলেন। পরশুরাম আত্মাভিমানের অবতার ছিলেন, এক্ষণে তিনি বিনয়ের অবতার। অকৃতাপরাধে বশিষ্ঠ দেবের অপমান করা যে, তাঁহার কর্ত্তব্য হয় নাই, দুর্জ্জয় অহঙ্কারে একথা তিনি পূর্ব্বে বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু এখন তাঁহার হৃদয়ে সে জ্ঞান সমুদিত হইল। পানাসক্ত ব্যক্তি যেমন মদিরার উত্তেজনায় দুষ্কর্ম করিয়া অবশেষে তাহার জন্য অনুতাপ করে, তিনি তেমনই আত্মকৃত কার্য্যের জন্য অনুতাপে দগ্ধ হইতেছিলেন। তিনি বশিষ্ঠ দেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"ভগবন্ মৈত্রাবরুণ, এষ জমদগ্নিপুত্রঃ প্রণম্য কৌশিকেন সার্দ্ধং মত্রভবতো বিজ্ঞাপয়ামি।"

বৃদ্ধাতিক্রম সংভৃতস্য মহতো নির্ণিক্তয়ে
পাপ্মনঃ

প্রায়শ্চেতন মাদিশস্ত গুরবো রামেণ দাত্তস্য মে
প্রাগ্ধর্ম্মস্য ভবস্তএব পরম দ্রষ্টার আসন্ পুরা
নষ্কজ্ঞানমনেকধা প্রবচনৈর্য্যাদয়ঃপ্রাণয়ন্।

পরশুরামের কথা শুনিয়া, শমগুণ-প্রধান বশিষ্ঠদেব আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। পরশুরামের দুর্ব্যবহারে তিনি মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন,এক্ষণে তাঁহার বিনয় বাক্য শুনিয়া, তাঁহার আর আনন্দের সীমা রহিল না।

যখন পরশুরামের উদ্ধত ব্যবহার দর্শনে জনক, দশরথ, শতানন্দ, এমন কি বিশ্বামিত্র পর্য্যন্তও ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, বশিষ্ঠদেব তখনও অবিচলিত ছিলেন। অন্তরে বেদনা পাইলেও তাহার প্রকৃতির ব্যতিক্রম ঘটে নাই। তিনি পরশুরামের অশিষ্টাচার দর্শনে কেবল মাত্র বলিয়াছিলেন;—

"সংমূষিতেন চরয়া মুহুরীক্ষিতশ্চেৎ
বৎসস্য ভার্গবশিশো দুরিতং হি তৎস্যাৎ॥"

"হউক্, পরশুরাম আমার অপমান করিতেছে করুক, কিন্তু আমি তাহার দিকে ক্রোধ কটাক্ষপাত করিলেই, বৎসের আমার

অমঙ্গল ঘটিবে; আমি তাহাকে কিছু বলিব না।”

একণে সেই পরশুরামই যে, এতদূর বিনীত হইয়াছেন, ইহাতে তাঁহার হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। তিনি পরশুরামকে অন্তরের সহিত আশীর্ব্বাদ করিলেন। রাজা জনক ও দশরথও যথোচিত মিষ্ট বাক্যে পরশুরামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন। পরশুরামও তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য সম্ভাষণে পরিতুষ্ট করিয়া, এবং সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, তপোবনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময়, রামচন্দ্রকে আপনার দুর্জ্জয় শরাসন প্রদান করিয়া, বলিয়া গেলেন; "বৎস, আজ হইতে আমি শস্ত্র ত্যাগ করিলাম; আমারই শস্ত্র প্রভাবে দণ্ডকাবাসী রাক্ষসগণ, ঋষিগণের উপর অত্যাচার করিতে সাহস করিত না। তাঁহারা নিরাশ্রয়,তাঁহাদিগের অপর রক্ষক নাই,আজ হইতে তাঁহাদিগের রক্ষার ভার তোমারই উপর অর্পিত হইল; তুমি তাঁহাদিগকে রাক্ষস হস্ত হইতে রক্ষা করিও।" পরশুরাম প্রস্থান করিবার পূর্ব্বে বিশ্বামিত্র এবং বশিষ্ঠও স্ব স্ব তপোবনাভিমুখে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের প্রস্থান কালীন কথোপকথন অতি সুন্দর; কিন্তু প্রত্যেক সুন্দর স্থল উদ্ধৃত করিতে হইলে, আমাদিগের প্রবন্ধে স্থানাভাব হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং আমরা সেই সকল স্থল, পাঠক মহাশয়কে স্বয়ংই অবলোকন করিবার জন্য অনুরোধ করি।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ভবভূতি সকল স্থলে বাল্মীকির অনুসরণ করেন নাই; স্থানে স্থানে তাঁহাদিগের পার্থক্য, অতি গুরুতর। রামচন্দ্রের বনপ্রস্থান, এবং বালীবধ, ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। রামায়ণে আমরা দেখিতে পাই যে, রামচন্দ্রের বিবাহের বহুদিন পরেই, রাজা দশরথ, তাঁহার অভিষেকের আয়োজন করিলেন; কৈকেয়ী মন্থরার পরামর্শে ঈর্ষা পরবশ হইয়া, তাঁহার উদ্দেশ্যে ব্যাঘাত প্রদান করিলেন। রামচন্দ্রের অভিষেক অসম্পন্ন রহিল, তিনি পিতার সত্য রক্ষার উদ্দেশে, চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য, নির্ব্বাসন দণ্ড গ্রহণ করিলেন। কিন্তু ভবভূতি, বীরচরিতে রামচন্দ্রের বনপ্রস্থান, সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র ভাবে সংঘটিত করিয়াছেন; করিবারও তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, আমরা নিম্নে তাহা বিবৃত করিবার চেষ্টা করিব।

আমরা বলিয়াছি যে, উৎকর্ষতা গুণে বাল্মীকির সৃষ্টি অতিক্রম করা মনুষ্যশক্তির অতীত। বাল্মীকি একবার যাহা লিখিয়াছেন, জগতের অপর কোন কবির পক্ষেই তাহাতে নূতনত্বের সমাবেশ করা সহজ কথা নহে, ভবভূতিও তাহা জানিতেন, এবং জানিতেন বলিয়াই, তিনি আপনার নৈপুণ্য প্রদর্শনের জন্য নূতন পথ আবিষ্কৃত করিতে এবং স্থানে স্থানে বাল্মীকি-বর্ণিত ব্যক্তিগণকে নূতন ভাবে সমাবেশিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ঈর্ষাপরায়ণা কৈকেয়ীর সহিত পুত্রবৎসল পত্নী-ভীত দশরথের কথোপকথন,রামায়ণের একটী অত্যুৎকৃষ্ট অংশ। নাটকাংশে ইহা অতুল্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রমণীর স্বভাবত কোমল হৃদয়, ঈর্ষায় এবং লোভে যে কতদূর কঠিন হইতে পারে, সত্যপরায়ণ অথচ স্নেহ-প্রবণ হৃদয় যে সমস্যার মধ্যে পতিত হইলে আত্মার সহিত কিরূপ যুদ্ধ করিয়া, হৃৎপিণ্ড উৎপাটিত করিয়া, তাহা হইতে উত্তীর্ণ হয়,

বাল্মীকি রামচন্দ্রের বন-প্রয়াণ কাণ্ডে তাহা অতি সুন্দর-রূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন। এক্ষণে স্বভাবতই পাঠকের হৃদয়ে এইরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, ভবভূতি, এরূপ সুন্দর অবসর প্রাপ্ত হইয়াও আপনার নৈপুণ্য প্রদর্শনে পরাঙ্মুখ হইলেন কেন? এ প্রশ্নের উত্তর আমরা পূর্ব্বেই দিয়াছি। বাল্মীকি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর, তাহাতে নূতন কথা কিছু বলিবার নাই; বনমল্লিকার অটোডি রোজ মাখাইলে, তাহার সুগন্ধের উৎকর্ষতা সাধন হয় না। ভবভূতি সেই জন্যই, জানিয়া শুনিয়া, অসাধ্য সাধনে বিরত হইয়াছেন। ভবভূতির আরও একটী উদ্দেশ্য ছিল, আমরা উপযুক্ত স্থলে তাহার উল্লেখ করিব।

আমরা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, জামদগ্ন্য পরাভব, সীতা হরণ এবং লঙ্কাজয়, সকলই মাল্যবানের কূটমন্ত্রণার বিষময় ফল। স্বজাতির মঙ্গলের জন্য এবং দৌহিত্র রাবণের শ্রীবৃদ্ধিআকাঙ্ক্ষায় তিনি অকৃতাপরাধে রামচন্দ্রের সর্ব্বনাশে এবং খরদূষণ প্রভৃতি জ্ঞাতিগণের উৎসাদনে প্রবৃত্ত হইলেন। কোন্ সাধু রাজনীতিজ্ঞ শত্রুর সর্ব্বনাশ করিলে, যদি স্বপ্রভুর মঙ্গল সাধিত হয়, তবে সে লোভে বিরত থাকিতে পারেন? মাল্যবান, পূর্ব্বেই রামচন্দ্রের হরশরাসন ভঙ্গজনিত অপরাধের উপযুক্ত দণ্ড দিবার জন্য, পরশুরামকে তাঁহার সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত করাইয়াছিলেন। আমরা পূর্ব্বে এই সকল কথার উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু মাল্যবানের উদ্দেশ্য বিফল হইল; তিনি যাহা ভাবিয়াছিলেন, রাবণের দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা ঘটিল না, রামচন্দ্রের বিক্রমে পরশুরাম পরাভূত হইলেন; তখন মাল্যবান আবার নূতন পাশ প্রসারিত করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি নিজেই তাহাতে আবদ্ধ হইলেন। মাল্যবান, রামচন্দ্র এবং পরশুরাম, উভয়ের মধ্যে বিবাদ উত্থাপন করিয়া দিয়া, তাহার পরিণাম কি হয়, দেখিবার জন্য আকাশ মার্গে শূর্পণখার সহিত অবস্থান করিতেছিলেন। হঠাৎ রামচন্দ্রের জয়ধ্বনিতে আকাশ পরিপূর্ণ হইল; সে শব্দ বজ্রনিনাদের ন্যায় মাল্যবানের কর্ণে প্রবেশ করিল, তিনি চমকিত হইলেন; এবং শূর্পণখাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বৎসে, দেখিলে দেবগণের ব্যভ্হার, ইন্দ্র প্রভৃতিও বন্দীর ন্যায় রামের উপাসনা করিতেছে।" শূর্পণখা বলিলেন, "মাতামহ, সে কথা আর বলিতেছেন কেন, এই জয় শব্দে আমারও হৃদয় উৎকম্পিত হইতেছে।" তখন মাতামহ ও দৌহিত্রী রামচন্দ্রের সর্ব্বনাশের জন্য পুনর্ব্বার পরামর্শ আরম্ভ করিলেন। রামচন্দ্রকে বিনষ্ট করাই উভয়ের শেষ সিদ্ধান্ত হইল। রাজা দশরথ, ইতি পূর্ব্বে কৈকেয়ীর পরিচর্য্যায় পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে যে বরদ্বয় প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন, মাল্যবান তাহা অবগত ছিলেন। তিনি শূর্পণখাকে, কৈকেয়ীর পরিচারিকা মন্থরার বেশ ধারণ করিয়া, রাজা দশরথের নিকট সেই বরদ্বয় প্রার্থনা করিবার জন্য পরামর্শ দিলেন। মাল্যবান ভাবিয়াছিলেন যে, যদি একবার রামচন্দ্রকে, অযোধ্যা হইতে বহুদূরে বিরাধ দনু কবন্ধাধিষ্ঠিত দণ্ডকারণ্যে, অসহায় অবস্থায়, লইয়া যাইতে পারা যায়, তাহা হইলে তাঁহার আর নিস্তার লাভের সম্ভাবনা নাই।

শূর্পণখা রাক্ষসী হইলেও রমণী; মাল্যবানের কূট মন্ত্রণার অর্থ, তাহার বোধগম্য হইল না। শূর্পণখা জিজ্ঞাসা করিল "মাতামহ, রামের ন্যায় প্রবল শত্রুকে দেশের নিকট লইয়া যাইবার আবশ্যক কি? বিশেষত রাম ত এখনও আমাদিগের কোন অহিতাচরণ করে নাই, তবে তাহার প্রতি এই মর্ম্মান্তিক "অপ্রতিসমাধেয়" বৈরাচরণের লাভ কি? মাল্যবান বলিলেন, "বৎসে, তুমি বুঝিতেছ না। রাম আমাদিগের অনিষ্ট করে নাই, এ কথাই বা আর কেমন করিয়া বলিব? যে দিন সে তাড়কাকে বধ করিয়াছে, সেই দিন হইতেই ত তাহার সহিত আমাদিগের শত্রুতার সূত্রপাত হইয়াছে, বিশেষত রাম আমাদিগের প্রকৃতি বৈরী। রাম ধর্ম্মরক্ষক, আমরা ধর্ম্মদ্বেষী, তবে রামের সহিত আমাদিগের সদ্ভাবের সম্ভাবনা কোথায়? ছলে বলে, অথবা কৌশলে, তাহার বিনাশ সাধন আমাদিগের একান্ত কর্ত্তব্য। একবার রামকে দণ্ডকারণ্যে লইয়া যাইতে পারিলে, বিরাধ দনু কবন্ধ প্রভৃতি হিংস্র স্বভাব রাক্ষসগণের হস্তে তাহার পরিত্রাণ নাই। যদিই বা রাম ভাগ্য ক্রমে তাহাদিগের নিকট নিস্তার পায়, কিন্তু মহাবীর বালীর হস্তে কিছুতেই তাহার নিষ্কৃতি লাভের সম্ভাবনা নাই। বালী রাবণের বাল্য সখা; আমি তাহাকে রামের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিব। জগতে বালীর সমকক্ষ যোদ্ধা কেহই নাই, রাম তাহার সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইলে নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। তাহা হইলেই আমাদিগের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল।" কূট বুদ্ধি রাজনীতিজ্ঞগণ, বুদ্ধিমান হইলেও বড় একদেশদর্শী, তাঁহারা সকল বিষয়েরই কেবল একদিক দেখিয়াই পরিতৃপ্ত থাকেন। মাল্যবানও কেবলই একদিক্ দেখিয়াছিলেন; আপনার কূট মন্ত্রণার বিপর্য্যাসে যে কি ভয়ঙ্কর পরিণাম হইবে, সে কথা ভাবিবার তাঁহার অবসর হয় নাই। তিনি শূর্পণখাকে মন্থরা বেশে দশরথকে প্রতারিত করিবার জন্ত পরামর্শ দিয়া, লঙ্কায় প্রস্থান করিলেন। মাতামহের যুক্তি শূর্পণখার বড় ভাল বোধ হইল না, কিন্তু তাঁহার আদেশ উল্লঙ্ঘন করা অকর্ত্তব্য ভাবিয়া, শূর্পণখা মন্থরা বেশে রামচন্দ্রের সমীপে উপস্থিত হইল।

পরশুরাম, বন গমনের সময়, রামচন্দ্রের নিকট যে প্রার্থনা করিয়া গিয়াছিলেন, তিনি তাহা বিস্মৃত হন্ নাই। তাঁহার করুণ হৃদয়, অসহায় ঋষিগণের অবস্থা স্মরণ করিয়া ব্যথিত হইতেছিল। রাক্ষসগণের ক্রূর প্রকৃতি এবং নিষ্ঠুরাচারের কথা তাঁহার অবিদিত ছিল না। তিনি তাহাদিগের অপরাধের প্রতিবিধানের জন্ত, উপযুক্ত অবসরের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহার মনে চিন্তা হইল যে, তাঁহার গুরুজনগণ যেরূপ স্নেহ-পরায়ণ, তাহাতে তাঁহারা যে, তাঁহাকে দণ্ডকারণ্যে গমন করিতে অনুমতি দিবেন, তাহা কোন ক্রমেই সম্ভবপর নহে। পরশুরাম শস্ত্র ত্যাগ করিয়াছেন, তিনিও গুরুজনদিগের উপরোধ অতিক্রম করিতে পারিতেছেন না, তাঁহার মনে চিন্তা হইল, তবে সেই অসহায় ঋষিগণের উপায় কি হইতেছে? হয় ত তাঁহারা ক্রূরস্বভাব রাক্ষসগণের হস্তে উৎসাদিত হইয়াছেন। তিনি ভাবিতেছিলেন;—

"জন্তশস্ত্রে ভৃগুপতৌ পরতন্ত্রে তথা ময়ি
কষ্টমুৎসাদিতাঃ ক্রুরৈর্যাতুধানৈ স্তপোধনাঃ।

এমন সময় লক্ষণ, মন্থরা বেশধারিণী শূর্পণখাকে সঙ্গে লইয়া, তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন। রাম মন্থরাকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া, বিমাতার কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। মন্থরাও রামচন্দ্রকে আশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপন করিয়া, কৈকেয়ী প্রেরিত একখানি পত্র প্রদান করিল। সেই পত্রে কৈকেয়ী, দশরথস্বীকৃত বরদ্বয়ের উপলক্ষ করিয়া, সসীত, সলক্ষণ, রামচন্দ্রের চতুর্দ্দশ বর্ষব্যাপী বনবাস প্রার্থনা করিয়াছিলেন। লক্ষণ পত্রপাঠ করিয়া চমকিত হইলেন; কিন্তু রামচন্দ্রের আনন্দের আর সীমা রহিল না। দণ্ডকারণ্যে গমন করিবার জন্য তাঁহার হৃদয় ব্যাকুলিত হইতেছিল, এক্ষণে কৈকেয়ীর আদেশ, তাঁহার পক্ষে উদ্দেশ্য সাধনের অনুকূল দৈবানুগ্রহ বলিয়া বোধ হইল। তিনি যে অবসরের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, বিধাতা স্বয়ংই যেন তাহা উপস্থিত করিয়া দিলেন। তিনি পুলকিত হৃদয়ে পিতার আদেশ লাভ করিবার জন্য, তাঁহার সমীপে গমন করিলেন। এদিকে রাজা দশরথ, ভরত ও যুধাজিতের অনুরোধে রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার জন্য সমস্ত আয়োজনের আদেশ দিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল; রামচন্দ্রের ন্যায় পুত্রের পিতা হইয়া, আনন্দে উৎফুল্ল না হয় কে? তিনি সুমন্ত্রকে বলিলেন,—"সুমন্ত্র, রামের অভিষেক সামগ্রীর আয়োজন কর, এবং যে আমার নিকট যাহা আশা করিয়া আসিয়াছে, তাহার সে আশা পূর্ণ কর।" এই সময় রামচন্দ্র, পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—'বাবা, আপনার নিকট আমার একটী প্রার্থনা আছে।" দশরথ বলিলেন,—"বৎস, তোমার আবার প্রার্থনা কি?" রামচন্দ্র পিতার কথা শুনিয়া বলিলেন,—"আপনি মধ্যমা মাতাকে যে বরদ্বয় প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত আছেন, আজি তাহা পূর্ণ করুন, এই আমার প্রার্থনা।" দশরথ পুত্রের কথা শুনিয়া বলিলেন; "বৎস ইহা আর অধিক কথা কি?

"সত্যসন্ধা স্থিরযবঃ কিং বৎস, বিচিকিৎসসে।
যদি দূতেৎপি কস্তস্থ প্রাণানপি ধনারতে?"

কৈকেয়ীর ন্যায় প্রিয়তমা পত্নীর উপরোধ, রামচন্দ্রের ন্যায় পুত্রপ্রার্থী দশরথের পক্ষে আর কি বলা সম্ভব? তিনি জানিতেন না যে, বারিগর্ভ মেঘের অভ্যন্তর হইতেও বজ্র নিপতিত হয়। সরলস্বভাব বৃদ্ধ রামচন্দ্রের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। লক্ষণ, অগ্রজের আদেশে সেই বজ্রময়ী লিপি পাঠ করিলেন। যদি কেহ সে সময় দশরথের নিকট তাঁহার বধাজ্ঞা পাঠ করিত, তাহা হইলে বোধ হয়, তিনি অধিকতর আকুলিত হইতেন না। তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হইলেন। রামচন্দ্র ও লক্ষণ পিতাকে সমাশ্বস্ত করিতে লাগিলেন; রাজা জনকও সে সময়ে সে স্থানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি একেবারেই মর্ম্মাহত হইলেন। রঘুবংশে এরূপ রাক্ষসাচার তিনি প্রত্যাশা করেন নাই; তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। কিন্তু ভবিতব্যের অন্যথাচরণ করিবার সাধ্য কাহার? রামচন্দ্রের বন গমনই স্থির হইল। লক্ষণ, অগ্রজের আদেশে সীতাকে সঙ্গে লইয়া আসিলেন। ভরত এতক্ষণ স্তম্ভিতের ন্যায় এক দিকে দণ্ডায়মান ছিলেন তাঁহার হৃদয় যন্ত্রণায় দগ্ধ হইতেছিল, তিনি ভাবিয়াছিলেন, রামচন্দ্রকে রাজপদে প্রতি-

ষ্ঠিত দেখিয়া, জীবন সার্থক করিবেন। কিন্তু তাঁহার অদৃষ্টে সে সুখ ঘটিল না; তাঁহারই মাতার আদেশে রামচন্দ্রকে জটাচীরধারী বেশে বন গমন করিতে হইল, তিনি উদাসীনের ন্যায় নীরবে সে দৃশ্য দেখিতে বাধ্য হইলেন। তিনি এতক্ষণ হৃদয়ের বেগ নীরোধ করিয়া রাখিয়া ছিলেন, কিন্তু আর পারিলেন না। যুধাজিৎকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"মামা, মামা, এই কি তোমাদিগের বংশের উপযুক্ত? যুধাজিৎও ভগীর ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন; তিনি বলিলেন—"বৎস কি বলিব। আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। দেখিয়া শুনিয়া, আমি জ্ঞান শূন্য হইয়াছি।" ভরত এবং যুধাজিৎ, উভয়েই রামচন্দ্রকে বন গমন সঙ্কল্প হইতে নিবারণ করিবার জন্য যথা সাধ্য অনুরোধ করিলেন; কিন্তু রামচন্দ্র তাঁহাদিগের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলেন না। ভ্রাতৃবৎসল ধর্ম্মপরায়ণ ভরতের হৃদয়ে মাতার দুর্ব্যবহার, বৃশ্চিকবৎ দংশন করিতেছিল; রামচন্দ্রকে বন গমনোন্মুখ দেখিয়া তিনি অধীর হইলেন। আত্ম জীবনে মাতার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য তিনি সঙ্কল্প করিলেন। মাতুলের পরামর্শে, তিনি রামচন্দ্রের পাদুকা যুগল সিংহাসনে স্থাপন করিয়া জঠাচীর ধারণ পূর্ব্বক প্রতিভূরূপে অযোধ্যা রাজ্য পালন করিতে স্বীকৃত হইলেন। জগতে লক্ষ্মণের ন্যায় ভ্রাতা দুর্লভ, কিন্তু ভরতের ন্যায় ভ্রাতা অপ্রাপ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। লক্ষ্মণ ও ভরত, উভয়েই অগ্রজকে প্রাণের অধিক ভাল বাসিতেন এবং দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতেন; উভয়েই তাঁহার অনুরোধে, সংসারের সুখ, যৌবনের ভোগাভিলাষ; বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন; কিন্তু লক্ষ্মণের জীবনে তবু শান্তি ছিল, ভরতের জীবনে তাহারও অসদ্ভাব। ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়ার মুখ দেখিয়া এবং তাঁহাদিগের সেবা করিয়া, লক্ষ্মণ, সকল ক্লেশ বিস্মৃত হইতেন, কিন্তু ভরতের জীবনে সে সুখও ছিল না। পর্ণপ্রান্ত ভ্রাতা এবং ভ্রাতৃজায়ার সেবা করিয়া যে তিনি হৃদয় পরিতৃপ্ত করিবেন, বিধাতা সে সুখও তাঁহার অদৃষ্টে লিখেন নাই। পিতা দশরথ, জ্যেষ্ঠ পুত্রের বনগমনের অল্পদিনের মধ্যেই প্রাণত্যাগ করিলেন। রামচন্দ্র এবং লক্ষ্মণ উভয়েই বিদেশে; অযোধ্যার সেই কোলাহল পূর্ণ বিশাল রাজভবন শূন্যময় হইল। ভরত সেই শূন্যময় পুরীর মধ্যে শ্মশানস্থিত সন্ন্যাসীর ন্যায়, জননীর পাপের প্রায়শ্চিত্তরূপ মহাযজ্ঞের আয়োজন করিলেন। তাঁহার অভিলাষ সম্পন্ন হইল। তাঁহার চতুর্দ্দশ বর্ষব্যাপী তপস্যায় দেবতা পরিতুষ্ট হইলেন; রামচন্দ্র আবার নির্ব্বিঘ্নে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। অগ্রজের বনগমনের পর ভরত অযোধ্যা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সেখানকার দৃশ্য তাঁহার নিকট বড় শোচনীয়। যে ক্রীড়াভবনে চারি ভ্রাতায় একত্রে ক্রীড়া করিতেন, এখন তাহা শূন্য; সেখানে প্রবেশ করিতে তাঁহার ক্লেশ বোধ হইত। সভাগৃহে সেই শূন্য সিংহাসনের দিকে চাহিতে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইত; পিতার কথা তাঁহার মনে পড়িত, পিতৃসম জ্যেষ্ঠের ক্লেশ তাঁহার হৃদয়ে জাগরিত হইত, মাতার নৃশংস আচরণ স্মরণ করিয়া, লজ্জায় এবং ক্ষোভে তিনি মর্ম্মাহত হইতেন। তিনি অযোধ্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নন্দীগ্রামে রাজপদ স্থাপন

করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু রাজা হইয়াও তিনি তপস্বী, সম্রাট হইয়াও তিনি ভিক্ষুক। রামচন্দ্র পিতৃসত্য প্রতিপালন জন্যই জটাচীর গ্রহণ করিয়া, সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন, কিন্তু ভরত ইচ্ছাক্রমেই সংসারের সকল সুখ ত্যাগ করিয়া, ভ্রাতার সন্ন্যাস ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইলেন। আমরা সেই জন্যই বলিতেছিলাম যে, জগতে ভরতের ন্যায় ভ্রাতা, অপ্রাপ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বাল্মীকি তুমি ধন্য, মর্ত্ত্যলোকে জন্ম গ্রহণ করিয়াও তুমি অমর, তোমাকে নমস্কার। যে আদর্শচিত্র, তুমি তোমার সন্তানগণের জন্য আলিখিত করিয়া গিয়াছ, জগৎ হইতে তাহা কখনও বিলুপ্ত হইবে না। যে পবিত্র রত্ন, তুমি তোমার উত্তরাধিকারীগণের জন্য রাখিয়া গিয়াছ, তাহা চির সমুজ্জ্বল; যুগ যুগান্তের ঘর্ষণেও তাহা বিমলিন হইবে না। যে জাতি তোমার প্রাণে অনুপ্রাণিত, শত শত বৎসরের নিষ্পেষণেও তাহা গতজীব হইবে না; তোমার অমৃতময় কাব্য, সেই মৃতপ্রায় দেহে আবার নবজীবন সঞ্চারিত করিবে।

রামচন্দ্র, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত বনগমনের জন্য পুরজনদিগের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। পুত্র ও পুত্রবধূকে তদবস্থায় বনগমন করিতে দেখিয়া, দশরথ স্থির থাকিতে পারিলেন না, তিনি সংজ্ঞাহীন হইলেন; ভরত ও জনক, তাঁহাকে সেখান হইতে স্থানান্তরিত করিলেন। রামচন্দ্রের বনগমন সংবাদ, ক্ষণকালের মধ্যেই চতুর্দ্দিকে প্রসৃত হইল। বিদেহনগর মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে তাঁহার অভিষেক কোলাহলে পরিপূর্ণ ছিল, এক্ষণে তাহার বনগমন সংবাদে তাহা একেবারেই পর্য্যাকুল হইল। ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞ পাত্র স্কন্ধে লইয়া, বাজপেয়ার্জ্জিত ছত্রে রামচন্দ্রের আতপ ক্লেশ নিবারণের জন্য ধাবিত হইলেন। অযোধ্যার পুরবাসীগণ পত্নী গৃহীত হোমাগ্নির সহিত সৈনিকগণের সঙ্গে সঙ্গে ধাবমান হইলেন।* এমন কি, গলিত বয়স্ক ব্যক্তিগণ পর্য্যন্তও হোমধেনু অগ্রে লইয়া, রামচন্দ্রের অনুবর্ত্তী হইবার উদ্যোগ করিলেন। রামচন্দ্র, কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও পত্নীর সহিত, আত্মীয়গণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, দণ্ডকাভিমুখে যাত্রা করিলেন। বীরচরিতের চতুর্থ অঙ্ক পরিসমাপ্ত হইল।

চতুর্থ অঙ্কের অনেক স্থলেই ভবভূতি বাল্মীকি বর্ণিত বিষয় পরিত্যাগ করিয়া, আত্মশক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার এরূপ করিবার উদ্দেশ্য, আমরা ইতিপূর্ব্বেই বিবৃত করিয়াছি। কিন্তু বাল্মীকির অনুসরণ না করিয়া, অন্যান্য স্থলে তিনি যেমন নৈপুণ্য প্রদর্শনে সক্ষম হইয়াছেন, চতুর্থ অঙ্কে সেরূপ হইতে পারেন নাই। রামচন্দ্রের চরিত্রের উৎকর্ষতা সাধন করিতে যাইয়া, তিনি যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার উদ্দেশ্য নিষ্ফল হইয়াছে। স্থানে স্থানে কবিত্বের ও কল্পনার বিকাশ সত্ত্বেও তাঁহার বীরচরিতের চতুর্থ অঙ্ক, আমাদিগের বিবেচনায় অস্বাভাবিক এবং গ্রন্থপ্রতিপাদ্য বিষয়ের বস্তু সমর্থনের অনুপযোগী। আমরা এক দিন পর্য্যন্ত ভবভূতির দোষোদ্ঘাটনের অবসর পাই নাই। তাঁহার প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া, আমরা তাঁহার

* স্কন্ধারোপিত যজ্ঞপাত্র নিচয়াঃ যৈর্বাজপেয়ার্জ্জিতৈঃ ছত্রৈর্বারয়িতুং তবার্ককিরণানেতে মহাব্রাহ্মণাঃ। সাকেতাঃ সহ সৈনিকের্গৃহতপস্বী গৃহীতাগ্নয়ঃ প্রাক্প্রস্থাপিত হোমধেনব ইমে ধাবন্তি বৃদ্ধা অপি॥

প্রশংসা করিয়াই আসিতেছি ; কিন্তু প্রশংসার সঙ্গে, দোষের বিষয় দেখিতে পাইলে তাহার উল্লেখ করিতেও আমরা বাধ্য। আমরা সেই জন্য চতুর্থ অঙ্কে সমুল্লিখিত বিষয়ের দোষালোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

১ম। রামায়ণের মন্থরা, ঈর্ষা-কলুষিতা কুটিলমতি রমণী ; তাঁহারই কুমন্ত্রণায় কৈকেয়ী রামচন্দ্রের সর্ব্বনাশে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। সমগ্র রামায়ণই মন্থরার কুপরামর্শের বিষময় পরিণতি মাত্র। বাল্মীকি মন্থরাকে উপলক্ষ করিলেও কৈকেয়ীকে কুবুদ্ধি হইতে নিষ্কৃতি দেন নাই ; স্ত্রী চরিত্র যে কিরূপ পরিবর্ত্তনশীল, এবং রমণী হৃদয় যে কত কুসুম সুকুমার এবং বজ্রসারময় পদার্থে সংগঠিত, রামায়ণের কৈকেয়ী তাহার অত্যুৎকৃষ্ট প্রমাণ। কিন্তু ভবভূতি, কৈকেয়ী, এমন কি মন্থরাকেও পর্য্যন্ত অপরাধিনী করিতে ইচ্ছা করেন নাই। তাঁহার মতে রামচন্দ্রের বনবাস, মাল্যবান ও শূর্পণখার কুপরামর্শের ফল। আর্য্যরমণীর পক্ষে যে এরূপ রাক্ষসাচার সম্ভব, ভবভূতি তাহা ভাবিতে পারেন নাই ; তিনি সেই নৃশংস আচরণের পাপ, অনার্য্যবংশীয়া শূর্পণখার স্কন্ধে অর্পণ করিয়াছেন। আমরা এই প্রবন্ধের প্রারম্ভে বলিয়াছিলাম যে, বিভিন্ন বংশীয় ও বিভিন্ন প্রকৃতি ব্যক্তিগণের চরিত্র চিত্রিত করিতে যাইয়া, তাঁহাদিগকে আরোপিত দোষে দূষিত করিবার লোভ অনেকেই সম্বরণ করিতে পারেন না ; ভবভূতি অন্যান্য স্থলে কৃতকার্য্য হইলেও এই সার্ব্বজনীন দোষের নিকট এস্থলে পরাভূত হইয়াছেন, আমরা তজ্জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করি।

২। রামায়ণে বর্ণিত আছে যে, রাজা দশরথ, রামচন্দ্রের বিবাহের অনেক দিন পরেই তাঁহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু বীরচরিতে, দশরথ, পুত্রের বিবাহের অব্যবহিত পরেই তাহার অভিষেকের আয়োজন করিতে আদেশ দিলেন। আমাদিগের বিবেচনায় ইহা কোন ক্রমেই সুসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। বিশেষত রামচন্দ্রের অভিষেক অযোধ্যায় না হইয়া বিদেহনগরে হওয়া যে কতদূর যুক্তিযুক্ত ও স্বাভাবিক, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। সূর্য্যবংশীয় রাজকুমারের অভিষেক, একটী সামান্য বিষয় নয়। কত দেশের কত রাজা, তাহাতে নিমন্ত্রিত হইবেন, কত সমারোহ আনন্দ উৎসব হইবে ; কত দিগ্‌দিগন্তরের ঋষি, মুনি, লোক জন আসিয়া রাজকুমারকে আশীর্ব্বাদ ও অভ্যর্থনা করিবেন। কতদিন ধরিয়া সেই বৃহৎব্যাপারের আয়োজন করিতে হইবে। তাহা না হইয়া, অকস্মাৎ বিদেহনগরে, পরাধিকারে তাহা সম্পন্ন হওয়া কতদূর সম্ভব, তাহা আমরা বলিতে পারি না। বিশেষত ভবভূতি ত কোন স্থানেই বলেন নাই যে, রামচন্দ্রের বিবাহের সময় কৌশল্যা প্রভৃতিও, দশরথের সঙ্গে, মিথিলা নগরে আসিয়াছিলেন। তবে দশরথ, তাঁহাদিগের অসাক্ষাতে, হঠাৎ পুত্রের জীবনের এরূপ একটী সুমহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন কেন ? গৃহিণীর অসাক্ষাতে সংসারের একটী ক্ষুদ্র কার্য্য সম্পন্ন হইবার রীতিও হিন্দুসংসারে নাই ; তবে দশরথ অকারণে সেই চিরপ্রচলিত প্রথার অন্যথাচরণ করিবেন কি জন্য ? কৌশল্যা তাঁহার সর্ব্বপ্রধানা মহিষী ; রাম, কৌশল্যার একমাত্র পুত্র। একমাত্র

পুত্রের অভিষেক, এরূপ লোকের অজ্ঞাত ও অজ্ঞত ভাবে সম্পন্ন করিয়া, তিনি কৌশল্যার হৃদয়ে বেদনা দিবেন কি জন্য? বিশেষত বৃদ্ধাবস্থায় পত্নীর সহিত উপযুক্ত পুত্র ও পুত্রবধূকে সংযত ও পট্টবস্ত্রে সজ্জিত দেখিতে কতই আনন্দ। যৌবনের সুখ, পত্নীকে লইয়া, প্রৌঢ়াবস্থার সুখ, পত্নীর সহিত পুত্র ও পুত্রবধূকে সুখী দেখিয়া; দশরথ ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনাকে সে সুখে বঞ্চিত করিবেন কেন? আমরা সেই জন্যই বলিয়াছি যে, কৌশল্যার অসাক্ষাতে, বিদেহনগরে রামচন্দ্রের অভিষেক সম্পাদন, আমাদিগের বিবেচনায় কোন ক্রমেই সুসঙ্গত ও স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয় না।

৩। আমরা বলিয়াছি যে, ভবভূতি, যে সকল স্থলে বাল্মীকির অনুসরণে বিরত হইয়াছেন, সেই সকল স্থলেই আপনার নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু রামচন্দ্রের বনপ্রয়াণের জন্য তিনি যে কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহা তাঁহার প্রতিভার সম্যক্‌রূপ উপযুক্ত হয় নাই। রামচন্দ্রের চরিত্রের উৎকর্ষতা সাধনই তাঁহার উদ্দেশ্য, কিন্তু তাঁহার অবলম্বিত কৌশলে তাঁহার সে উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে সাধিত হয় নাই। তিনি বর্ণন করিয়াছেন যে, রামচন্দ্র, পরশুরামের মুখে দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিগণের অসহায় অব[illegible]। এবং রাক্ষসগণের নিষ্ঠুরাচারের কথা অবগত হইয়া, দণ্ডকারণ্যগমনের জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন। এমন সময়ে ঘটনা সমবায়ে, তাঁহার অভিলাষ পরিপূর্ণ হইবার সুবিধা উপস্থিত হইল। তিনি যাহার জন্য উৎসুক ছিলেন, ভাগ্যক্রমে তাহা বিধাতা মিলাইয়া দিলেন! তিনি আপনার অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দিয়া প্রফুল্ল চিত্তে বন গমন করিলেন, বনবাসের ক্লেশ তাঁহাকে উদ্দেশ্য সাধনে পরাঙ্মুখ করিতে পারিল না। ইহা হইতে আমরা রামচন্দ্র চরিত্র সম্বন্ধে কি বুঝিব? নিশ্চয়ই আমাদিগকে বুঝিতে হইবে যে, রামচন্দ্র বড় করুণ স্বভাব, রাজ পুত্র হইয়াও তিনি পর দুঃখে দুঃখী, অন্যের কষ্ট দূর করিবার জন্য, অত্যাচারীকে উপযুক্ত শাস্তি দিবার জন্য, তিনি নিজের সুখ বিসর্জ্জন করিতেও প্রস্তুত। তাঁহার এই সকল সদ্গুণের কথাই, আমাদিগের মনে উদিত হইবে। এ সকল সামান্য সদ্গুণের কথা নয়; নব বিবাহিতা গুণবতী পত্নী, স্নেহপরায়ণা পিতামাতা, অতুল ঐশ্বর্য্য, এ সকল পরিত্যাগ করা, অল্প প্রাণের কার্য্য নহে। অরণ্যবাসের কষ্ট, রামচন্দ্র অবগত ছিলেন না, তাহা নহে। রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধের ক্লেশ, তাঁহার জানা ছিলনা, তাহা নয়। কিন্তু সকল জানিয়া শুনিয়াও, তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক অরণ্য গমনে প্রস্তুত হইলেন; অবশ্যই এ সকল মহাপ্রাণের কার্য্য। যদি বাল্মীকির সমুদ্ভাবিত উপায় আমরা অবগত না থাকিতাম, তাহা হইলে হয়ত ইহাকেই মনুষ্য চরিত্রের উৎকর্ষতার উচ্চতম আদর্শ বলিয়া মনে করিতাম। কিন্তু ভবভূতির চিত্র, মনুষ্যলোকে দুর্ল্ভ হইলেও অপ্রাপ্য নহে, বাল্মীকির চিত্র, মনুষ্যলোকে অপ্রাপ্য। ভবভূতি, রামচন্দ্রের চরিত্রের উৎকৃষ্টাংশই প্রদর্শন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহা ঐকদেশিক। এ সংসারে পরীক্ষা দান, সকলের ভাগ্যে ঘটেনা। কেহ কেহ সংসারের সুখ এবং সম্পদ ভোগ করিয়াই জীবন অতিবাহিত করিয়া যান; সংসারের দুঃখের অংশ তাঁহাদিগের চক্ষুতে পতিত হয় না। আবার

কেহ বা, নিরবচ্ছিন্ন দুঃখের মধ্যেই জন্ম গ্রহণ করিয়া, কেবলই দুঃখ ভোগ করিয়াই জীবন শেষ করেন; তাঁহাদিগের জীবনে সুখ ঘটেনা। এই উভয় শ্রেণীর লোকের মধ্যে কাহারও চরিত্র পরীক্ষিত হয় না। সুখ এবং দুঃখের সন্ধিস্থলই, মনুষ্য চরিত্রের পরীক্ষার স্থান; ভাগ্য বিপর্য্যয়েই লোকের চরিত্র পরীক্ষিত হয়। রামচন্দ্রের জীবন, বাল্মীকি কেবলই সেই সন্ধিস্থলে পরিপূর্ণ করিয়াছেন। রামচন্দ্র, সেই সকল স্থলে অনন্যসাধারণ ধীরতা প্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়াই, তিনি মনুষ্য হইয়াও দেবতা; তাঁহার চরিত্র, হিন্দুসন্তানের আদর্শ। বনগমন কালীন রামচন্দ্রের অবিচলিত গাম্ভীর্য্য, তাঁহার সমাসাপূর্ণ জীবনের একটী উৎকৃষ্টতম পরিচয় স্থল। কোথায় সংযমের পর তিনি পৃথিবীর সিংহাসনে অধিরূঢ় হইবেন, না তাঁহাকে বনচর হইতে হইল। পিতামাতার চরণে প্রণাম করিয়া, কোথায় তিনি অভিষেকের মন্ত্রপাঠ করিতে বসিবেন, না তাঁহাকে জটাচীর সংগ্রহের জন্য ব্যস্ত হইতে হইল। মুহূর্ত্তের মধ্যে মনুষ্য জীবনে ইহা অপেক্ষা আর কি অধিক পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে? কিন্তু রামচন্দ্র সেরূপ অবস্থায়ও অকুণ্ঠিত; তাঁহার মুখে বিষাদ নাই, হৃদয়ে উদ্বেগ নাই, তিনি বন গমন করিলে যে পিতার সত্য রক্ষা হয়, তিনি সুখী হন, ইহাই তাঁহার যথেষ্ট পুরস্কার। তিনি অনুদ্বিগ্ন চিত্তে পিতামাতার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, বনবাসের জন্য প্রস্তুত হইলেন। আমরা বলিয়াছি যে, রামচন্দ্র মনুষ্য; কিন্তু মনুষ্য হইলেও হৃদয়ের সমতায় তিনি দেবতা। যত দিন জগতে হৃদয়ের পূজা প্রচলিত থাকিবে, ততদিনই তিনি মনুষ্যজাতির পবিত্র ভক্তি-উপহার প্রাপ্ত হইবেন।

আমাদিগের এ সকল কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, ভবভূতি তাঁহার রামচন্দ্রের বন গমন কালে এই পরীক্ষা স্থলের সমাবেশ করেন নাই। বীরচরিতের রামচন্দ্র, বন গমনের জন্য একান্ত ব্যগ্র ছিলেন; সাংসারিক সুখ অপেক্ষা, রাক্ষসদিগকে জয় করিয়া কীর্ত্তি লাভ এবং তাহার সঙ্গে পরোপকার সাধন, তাঁহার নিকট উৎকৃষ্টতর বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। দণ্ডকারণ্যে গমন করিবার জন্য, তিনি কেবল উপযুক্ত অবসরেরই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন; এমন সময় কৈকেয়ীর আদেশ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল, সুতরাং তাহা তাঁহার পক্ষে একরূপ অনুকূল অবস্থাই হইল। সুখের প্রত্যাশা করিয়া, অকস্মাৎ দুঃখের ভীষণ মূর্ত্তি দেখিলে লোকে যেরূপ চমকিত হয়, তাঁহার জীবনে তাহা ঘটিল না। প্রোজ্জ্বল আলোক হইতে হঠাৎ তাঁহাকে নিবিড় অন্ধকারে আসিতে হইল না। তাঁহার প্রার্থনার অনুকূল বস্তুই তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। সুতরাং সুখ দুঃখের সন্ধিস্থলে পাতিত করিয়া, বাল্মীকি তাঁহার রামচন্দ্রকে যে কঠোর পরীক্ষা হইতে নিরাপদে উত্তীর্ণ করিয়াছিলেন, ভবভূতির রামচন্দ্রের তাহা ঘটিল না। বিপদে পতিত হইয়া, তাঁহার রামচন্দ্র কিরূপ ক্লেশ সহিষ্ণু, কিরূপ ধৈর্য্যশীল, তাহা লোকে জানিতে পারিল না। ভবভূতি তাঁহার রামচন্দ্রের পরদুঃখ কাতরতা, স্বার্থ ত্যাগ, করুণ স্বভাব প্রভৃতি সদ্‌গুণের পরিচয় দিয়াছেন সত্য; কিন্তু যাহাতে মনুষ্যের প্রকৃত মনুষ্যত্বের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়,

তিনি তাঁহার রামচন্দ্রের সেই অবিচলিত গাম্ভীর্য্যের কথার উল্লেখ করেন নাই। সুতরাং তাঁহার চিত্র, সুন্দর হইলেও আদর্শ চিত্র নহে। আমরা সেই জন্যই বলিয়াছি যে, ভবভূতি বাল্মীকির অনুসরণ না করিয়া, অন্যান্য স্থলে যেরূপ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন, চতুর্থ অঙ্কে তদ্রূপ করিতে সমর্থ হন নাই। উপযুক্ত স্থানে আমরা আর একবার এ সকল কথার উল্লেখ করিব। ক্রমশঃ।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু।

পরীক্ষিত কথা।

১। যে সত্য সম্বন্ধে কোন প্রকার সন্দেহ বা দ্বিধা নাই, তাহা প্রাণপণে পালন করিতে চেষ্টা কর। একটী সত্য পালিত হইলে তবে অন্য সত্য পাইবে। সত্য বুঝা ও সত্য পালন করা, দুই স্বতন্ত্র জিনিষ। যে সত্য বুঝিয়াও তাহা পালন করে না, তাঁহার উন্নতি হইবে কিরূপে?

২। দলাদলিতে বা অন্যের দোষানুসন্ধানে মজিয়া আত্ম-হারা হইবে না। আপনাকে বজায় না রাখিতে পারিলে কিছুতেই উন্নতি হইবে না।

৩। অন্যের দোষ কিম্বা ত্রুটীর বিষয় যখনই হৃদয়ে উপস্থিত হইবে, তখনই আপন দোষ বা ত্রুটীর কথা মনে করিবে; কারণ, অন্যের দোষ স্মরণে হৃদয় অবনতি প্রাপ্ত হয়। অন্যের মহত্ত্ব চিন্তনে হৃদয়কে সর্ব্বদা নিযুক্ত রাখিবে, কারণ মহত্ত্বের আদর্শে হৃদয় মন উন্নত হয়। আপনার দোষ বা ত্রুটী স্মরণ করিতে করিতে অনুতাপ উপস্থিত হয়। অনুতাপ-অশ্রুপাত ভিন্ন হৃদয়ের মলিনতা ধৌত করিতে কেহ পারে না। ঈশ্বরের সৃষ্টির মধ্যে এমন কোন্ বস্তু আছে, যাহাতে বিশেষত্বময় মহত্ত্ব নাই! এমন মানবই বা কে আছে, যে আপনার জীবনে ত্রুটী বা দোষ দেখিতে পায় না। আপন ত্রুটী এবং অন্যের মহত্ত্ব চিন্তাকে জীবনের সম্বল কর।

৪। প্রত্যেকের ভিতরেই কিছু কিছু পাইবার আছে, স্মরণ রাখিবে। যাহাকে ভয়ানক পাপে লিপ্ত দেখিতেছ, তাহার মধ্যেও এমন অনেক জিনিষ আছে, যাহা আর কোথাও পাইবে না; কারণ ঈশ্বরের সৃষ্টিতে সকলেরই কিছু না কিছু বিশেষত্ব আছে। ইহা মনে রাখিয়া সকলকেই হৃদয় পাতিয়া আলিঙ্গন করিবে। পাপীকে ঘৃণা করিবার অধিকার পাপীর নাই। ঘৃণা যেখানে, অহঙ্কারও সেখানে। অন্যকে ঘৃণা করিতে গেলেই অহঙ্কারী হইয়া পড়িবে। অহঙ্কার মনুষ্যত্ব লাভের প্রধান প্রতিবন্ধক। অহঙ্কার মানুষের অভাবকে ঢাকিয়া রাখে। আপনার অভাব যে দেখিতে পায় না, সে আর কি প্রকারে উন্নতি লাভ করিবে?

৫। সৃষ্টির সকল জীবকেই ভালবাসিতে চেষ্টা করিবে, কিন্তু কেহকেই ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করিবে না। সকল পদার্থ বা জীবেই ঈশ্বরের সত্তা বিদ্যমান, কিন্তু কোন সৃষ্ট বস্তুতে ঈশ্বরত্ব আরোপ করিলে ঈশ্বরত্ব লোপ পাইয়া যাইবে। সাগরের এক গণ্ডূষ বারি হাতে পাইয়া, কখনও মনে করিবে না, সাগর পাইয়াছ। যে যাহা, তাহাকে তাহা জানিয়াই আদর করিবে। একেকে অন্য বলিয়া ভুল করিবে না।

৬। যত দূর সম্ভব, সকল প্রকার সৎ-

কার্য্যে যোগ রাখিতে চেষ্টা করিবে; কার্য্যের স্রোতে নিমগ্ন থাকিলে পাপ-প্রলোভন বা রিপু তোমাকে স্পর্শও করিতে পারিবে না। সৎকার্য্যের সোপান ধরিলে তবে শেষে নির্ব্বাণ-মুক্তি প্রাপ্ত হইবে।

৭। এটা বড়, ওটা ছোট, কখনই এ গণনা করিবে না। এক জনের বা এক বস্তুর কার্য্য যখন অপর জন বা অপর বস্তুর দ্বারা সাধিত হইতে পারে না, তখন কে ছোট, কে বড়? আপনাপন বিশেষ কার্য্য-সাধনের জন্য সকলেই বড়। আবার ঈশ্বরের সহিত তুলনায় সকলেই ছোট—অতি ক্ষুদ্র। সৃষ্টির সৌন্দর্য্য—বৈচিত্র্যে; সুতরাং বৈচিত্র্যের আদর করিতে শিখিবে।

৮। মুখে এক, ভিতরে আর এক, রাখিবে না। ভিতরে ও বাহিরে এক রূপ হইতে চেষ্টা করিবে। যে সত্য পালনের জন্য সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠিত হও, সে সত্য মুখে বলিও না; কারণ তাহা তোমার সত্য-বোধ হয় নাই। সত্য শুনা ও সত্যে বিশ্বাস, দুই এক কথা নহে।

৯। কাহারও মনে কষ্ট দেওয়া মানুষের ধর্ম্ম নহে, আপন কর্ত্তব্য পালন করাই ধর্ম্ম। আমার কর্ত্তব্য পালন করিলে তুমি যদি মনে কষ্ট পাও, নাচার, কি করিব? তোমার মুখের দিকে চাহিয়া আমার কর্ত্তব্য পালনে বিরত থাকিতে পারি না; এইরূপ নির্ভীক হইয়া কর্ত্তব্য পালন করিবে। ধর্ম্মানুমোদিত কোন কর্ত্তব্যেরই উদ্দেশ্য অন্যকে কষ্ট দেওয়া হইতে পারে না।

১০। একজনের কথা শুনিয়া আর এক জনের প্রতি বিরক্ত হইবে না। মানুষ মানুষকে সকল সময়ে চিনিতে পারে না। যে যেরূপ চিন্তায় রত, সে অন্যের মধ্যে তাহারই অনুরূপ দেখে, আর কিছুই দেখিতে পায় না; সুতরাং মানুষের প্রকৃত মহত্ত্ব বা প্রকৃত দোষ মানুষের পক্ষে বুঝা বড়ই কঠিন।

১১। যে কেবলই পর-নিন্দা করে, পর ছিদ্র অন্বেষণ করে,সে নিজে ভয়ানক পাপী, মনে রাখিবে। আপন পাপকে ঢাকিবার জন্যই সে অন্যের নিন্দা প্রচার করে। সুতরাং পর-নিন্দুকের প্রতি আস্থাবান হইয়া অন্যের প্রতি বিরক্ত হইবে না। যে উচ্চরবে অন্যের দোষ কীর্ত্তনে সর্ব্বদা রত থাকে, দেখিয়াছি, তাহার মনের ভিতরে বিষম পাপ-গরল পোষিত হইতেছিল। নিন্দুকের ন্যায় প্রবঞ্চক ও কপট পৃথিবীতে আর নাই।

১২। সৎপ্রসঙ্গ বা সদালাপ মনোযোগ সহকারে শুনিবে, শুনিয়া সার সংগ্রহ করিবে। বৃথা কূটতর্কে কখনও রত হইবে না। কূট তর্ক সত্য আবিষ্কারের পরিবর্ত্তে সত্যকে ঢাকিয়া রাখে। সত্যপালনই সত্য-আবিষ্কারের মূল মন্ত্র।

১৩। বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠান পদ্ধতির প্রতি কখনই অনুরাগ দেখাইবে না। দেখা গিয়াছে, বাহিরের অনুষ্ঠানে মাতিয়া অনেকে হৃদয়কে হারাইয়া ফেলিয়াছে,—লক্ষ্য ভুলিয়াছে। লক্ষ্যকে প্রাণের মূলে রাখিয়া সাধন করিবে, ভিতরের দিকে সর্ব্বদাই দৃষ্টি রাখিবে,—আত্মচিন্তা ভুলিয়া বাহ্য অনুষ্ঠানের চিন্তা করিবে না। মূল কথা, যাগযজ্ঞে, গৈরিক বস্ত্রে, বা বাহ্য-দীক্ষায় তাহার কি করিবে, যে হৃদয়ে গরল পোষণ করিতেছে!

১৪। প্রেম ভক্তি হৃদয়ে সমুদিত হইলে মত-মূলক ঘৃণা বিদ্বেষ আর থাকিতে পারে না;—মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, সদ্দলের

প্রতিই ভালবাসা যায়। আত্মানুসন্ধান করিয়া সর্ব্বদাই জানিতে চেষ্টা করিবে যে, সাধনার সহিত ঘৃণা বিদ্বেষ লোপ পাইতেছে কি না ? যদি লোপ না পাইয়া থাকে, তবে আরো কঠোর তপস্যা করিবে। যখন ঘৃণা বিদ্বেষ তিরোহিত হইবে, তখন প্রেমময়ের বিশ্ব-প্রেম হৃদয়ে অবতীর্ণ হইবে। ঘৃণা বিদ্বেষ যত দিন আছে, ততদিন আত্মসংযম রূপ কঠোর তপস্যা করিবে।

১৫। সাধনার বা মুক্তির পথ, লোকাদিষ্ট পথ নহে। প্রাণের ভিতরে ডুবিয়া যে পথ পরিষ্কার রূপে দেখিতে পাইবে, সেই পথই ধরিবে। লোকের ভয়ে, সমাজের ভয়ে যদি বিবেকের আদিষ্ট পথ পরিত্যাগ কর, তবে তোমার বিশেষত্বের রাজ্য তুমি পাইবে না,—ঈশ্বরের উদ্দেশ্য তোমা দ্বারা সিদ্ধ হইবে না। এই জন্যই পৃথিবীতে এত পাপের সৃষ্টি হইতেছে। মানুষের কথায় ভুলিয়া মানুষ কত জঘন্য কার্য্যই করিতেছে! মানুষের আদিষ্ট পথে না গেলে মানুষ কখনও পাপের পথ পাইত কি না, সন্দেহ। অতএব মানুষের কথা না শুনিয়া সর্ব্বদাই বিবেকের কথা শুনিবে। বিবেকের কথা না মানিলে ধর্ম্ম টিকে না।

১৬। যদি ধর্ম্ম চাও, তবে সংসারকে উপেক্ষা করিতে শিখিবে;—অন্যের প্রশংসা বা নিন্দা শ্রবণে কখনই বিচলিত হইবে না; কারণ উহাদের কোনই মূল্য নাই;—মানুষ মানুষকে প্রকৃতরূপে চিনিতে পারে না। সকল বস্তুকেই ঈশ্বরের সৃষ্ট বলিয়া জানিয়া ভালবাসিবে, কিন্তু কাহারও আসক্তিতে মজিবে না। ভালবাসা এবং আসক্তিতে মজা, এক কথা নহে। ভালবাসার মায়ায় বদ্ধ হইয়া যখনই বুঝিবে যে, কর্ত্তব্য পালনে আর বল পাইতেছ না, তখনই বুঝিবে, আসক্তি তোমাকে ঘিরিয়াছে;—বীরের ন্যায় তখন আসক্তি দড়ি ছিঁড়িবে। প্রকৃত বীরত্ব এইখানে। কর্ত্তব্য পালন, ধর্ম্মের প্রধান সোপান। বিবেক, কর্ত্তব্যের নেতা। এই সোপান অবলম্বন করিয়া থাকিবে, কখনই যেন পা পিছলিয়া না যায়। কর্ত্তব্য পালনের জন্য পৃথিবীর সর্ব্বস্ব যখন পরিত্যাগ করিতে পারিবে, তখনই বুঝিবে, তোমার আসক্তি ছিঁড়িয়াছে; নচেৎ সুস্থির থাকিবে না, ক্রমাগত চেষ্টা করিবে। কর্ত্তব্য পালনের জন্য দেহ বিসর্জ্জন দিয়াই খ্রীষ্ট বৈকুণ্ঠ লাভ করিয়াছেন, মনে রাখিবে। ক্রমশঃ

গোলাপ ফুল।

সাধে কি গোলাপ ফুলে
আমি ভালবাসি সই;
আমার মনের কথা,
শোন্ সখি তোরে কই।
—আমি যারে ভালবাসি,
তার মৃদু মৃদু হাসি,
সুধাংশু কিরণ সম
মাঝে মাঝে পড়ে খসি;
সে অমূল্য ধন পেয়ে
চির পিপাসিত হিয়ে,
পৃথিবী হৃদয় মাঝে
রাখে সখি লুকাইয়ে;
সে হাসি জমাট হয়ে
ধরা বক্ষ বিদারিয়ে,
বাগানে গোলাপ রূপে
ফুটে ফুটে উঠে ওই।

শ্রীআনন্দচন্দ্র মিত্র।

ইন্দুবালা।

দশম পরিচ্ছেদ।

রজনী প্রভাত হইয়াছে,—আকাশ পরিষ্কার হইয়াছে। নবস্নাতা প্রকৃতি প্রফুল্ল অরুণ কিরণে রঞ্জিত হইয়া শোভা পাইতেছে। ইন্দুর নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছে, নিদ্রাতে শরীর অনেকটা বিগত-শ্রম বোধ হইতেছে। তিনি এখন পরিব্রাজক এবং নির্ম্মলের সহিত অল্প অল্প কথা কহিতেছিলেন। তাঁহার মুখে কখন কখন ক্ষীণ রশ্মিবৎ হাসি দেখা যাইতেছিল। তিনি বলিলেন, তাহার শরীর অনেক ভাল, তবে বড় দুর্ব্বল বোধ হইতেছে। কিন্তু পরিব্রাজক এবং নির্ম্মলের বোধ হইল, তাঁহার একটু জ্বর হইয়াছে। বস্তুত তাঁহার একটুক জ্বর হইয়াছিল। সে দিন ঐ প্রকারে যাইল, পরে অল্প অল্প কাশি দেখা দিল, বৈকালে প্রতিদিন অল্প জ্বর ও মুখ লাল হইতে লাগিল, ক্রমে শরীর ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল। কিন্তু ইন্দু বলিতেন যে, তাঁহার শরীর ভাল আছে, কোন উদ্বেগের কারণ নাই। তাঁহার নিকট পরিব্রাজক, না হয় নির্ম্মল, এক জন বসিয়া থাকিতেন। বড় আশঙ্কা হইল। পরিব্রাজক ইন্দুর পীড়ার আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত নির্ম্মলের নিকট শুনিলেন। উভয়েরই বড় আশঙ্কা হইল। নির্ম্মলের নিকট ইন্দুর ঔষধ ছিল সেই ঔষধ, পূর্ব্বে কলিকাতার যে প্রসিদ্ধ ডাক্তারগণ তাঁহাকে চিকিৎসা করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের ব্যবস্থা ও নিয়ম অনুসারে সেবন করান হইতে লাগিল। তাহাতে কিছু উপকার বোধ হইল। ক্রমে ক্রমে কিছু সবল হইলেন। নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপ আবার জ্বলিয়া উঠিল। ইন্দু এক্ষণ অনেকক্ষণ গল্প করিতেন, তাঁহার মন যেন প্রফুল্ল হইল। পরিব্রাজক কোন্ কোন্ দেশে কি কি করিয়াছিলেন, ও কি কি দেখিয়াছিলেন, তাহা শুনিতেন। তাঁহার সেই অমৃত সমান মধুর বচন পান করিয়া তৃপ্ত হইতেন না। পরিব্রাজক ইন্দুকে প্রায় কথা কহিতে দিতেন না। যখন তাঁহার শরীর কতকটা সহজ হইয়াছে, তখন একদিন ইন্দু পরিব্রাজককে বলিলেন,—"অমল, আমরা দেশে ফিরিয়া যাইলে তুমি কি আমাদের সহিত যাইবে?"

অমল বলিলেন—"যাইব।"

ইন্দু।—"থাকিবে?"

অমল।—"থাকিব।"

ইন্দু।—"তবে আমি মরিব না।"

অমল।—"আমি তোমাকে মরিতে দিব না।"

ইন্দু।—অমলের হাত ধরিয়া চক্ষু নিমীলিত করিলেন। পরে বলিলেন, "অমল, আমার সঙ্গে যাইবে ত?"

অমল।—"যাইব।"

ইন্দু।—"আমায় আর ছাড়িয়া চলিয়া আসিবে না ত?"

অমল।—না।"

ইন্দু।—"তুমি জান অমল, এই দীর্ঘ বৎসরে আমি তোমার জন্ত কত কষ্ট সহ্য করিয়াছি, কত কাঁদিয়াছি?"

অমল।—"জানি।"

ইন্দু।—"কাহার জন্য আমার শরীর এই বয়সে শীর্ণ হইয়া গিয়াছে—কাহার জন্য এই জীবনের আরম্ভ না হইতে মরিলাম!"

অমল।—ইন্দু—ও কি কথা বলিতেছ?—তোমার শরীর ত দিন দিন সুস্থ হইতেছে।

ইন্দু।—অমল, মিথ্যা আশায় আর আমি আমাকে প্রতারিত করিব না, তোমাকেও করিব না। আমার সংসারের যে কয়েক দিন নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহা ফুরাইয়া আসিতেছে। তোমার সহিত ইহলোকে আমার আর অধিক দিন সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই। কল্য আমি একটা স্বপ্ন দেখিতেছিলাম।

অমল।—কি—"স্বপ্ন?"

একাদশ পরিচ্ছেদ।

স্বপ্ন।

ইন্দু বলিতে আরম্ভ করিলেন—"যেন শৈশবে তোমার সহিত আমার যেখানে দেখা হয়—আমাদের উদ্যানে আমি আর তুমি দাঁড়াইয়া, আবার যেন তোমার আর আমার সেই অল্প বয়স হইয়াছে। তোমার এক হাত আমার কাঁধে, আর এক হাত একটা নক্ষত্রের পানে। তুমি নক্ষত্রের ও অদৃষ্টের কথা কি বলিলে, আমার স্মরণ নাই। কিন্তু তখন সেই চন্দ্রালোকে তুমি আর আমি ঘাসের উপর বসিলাম। তুমি উঠিলে আবার বসিলে; তোমার ও আমার মধ্যে এক খণ্ড তৃণ পড়িয়াছিল। সেই তৃণটী দেখিতে দেখিতে বিস্তৃত হইয়া যাইল, ক্রমে দেখি তাহা তৃণ নহে, তাহা নদী,—ভয়ানক বিস্তৃত, ভয়ানক বেগে বহিতেছে। আর চন্দ্রালোক নহে, প্রচণ্ড মধ্যাহ্ন রবি—বালুকাময় সৈকত—তুমি এক পারে আমি অপর পারে;—আর মধ্যে সেই ভয়ানক বিস্তৃত নদী গর্জ্জিয়া বহিয়া যাইতেছে। নদী এত বিস্তৃত যে এপার হইতে ওপারের কথা ভাল শুনা যায় না, দৃষ্টি ভাল চলে না। আমি যেন বালুকাময় সৈকত হইতে তোমাকে দেখিতে লাগিলাম। আমি অনেকক্ষণ তাকাইয়া থাকিলাম, ভাবিলাম, তুমি সাঁতার দিয়া আসিবে, কিন্তু নদীর যে প্রখর স্রোত, ভীষণ আবর্ত্তন—ক্রমে আশা রহিল না। তবু ভাবিলাম, তুমি বীরপুরুষ, দৈববল-সম্পন্ন, আসিবে। তুমি যেন হাত দিয়া আমাকে চলিয়া যাইতে সঙ্কেত করিলে, আর আকাশের দিকে হাত তুলিলে, এবং আমাকে তোমাকে হাত দিয়া লক্ষ্য করিলে। আবার আমাকে চলিয়া যাইবার জন্য সঙ্কেত করিলে। আমি শুনিলাম না, আমি দাঁড়াইয়া থাকিলাম। তুমি আমার দিকে চাহিয়া থাকিলে, ক্রমে যেন তোমার মুখ বড়ই বিষণ্ণ হইয়া আসিল। তুমি কিছু বলিলে না, পিছন ফিরিয়া দূরে চলিয়া যাইলে। যেমন দৃষ্টির বহির্ভূত হইলে, আমি সাঁতরাইয়া তোমাকে ধরিবার নিমিত্ত জলে পড়িলাম। অমনি যেন আকাশ এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত বিদীর্ণ করিয়া একটা কি শব্দ হইল! আমাকে জলের আবর্ত্তনে কোথায় লইয়া গেল—আমার স্মরণ নাই। তাহার পর আমি দেখি, আমি আবার সেই সৈকতে অগ্নিসম বালুকার উপর পড়িয়া রহিয়াছি। মাথার উপর অগ্নিবর্ষী সূর্য্য—তৃষ্ণায় প্রাণ যায়—শরীর অবশ—উঠিবার শক্তি নাই। সূর্য্য অস্ত যাইল। অন্ধকার সম্মুখে স্তূপের মত একটা কি দেখিলাম,—অতি উচ্চ আকাশে ভেদ করিয়াছে। আকাশের এক স্থানে একটী আলোকময় ছিদ্র

দেখিলাম। তাহা হইতে রশ্মির প্রপাত নির্গত হইল, সূক্ষ্ম স্বর্ণ সূতার ন্যায় অনেক রশ্মি ক্ষরিত হইতেছে। তাহার মধ্যে একটী রশ্মি বাম হস্তে ধরিয়া একটী স্বর্গীয় দেবকন্যা, আমি নীচে যেখানে ছিলাম, সেইখানে আসিলেন; আমার হস্ত, বাম হস্ত ধরিয়া বলিলেন, ইন্দু, তোমাকে আর সংসারে দুঃখ সহিতে হইবে না। তাঁহার স্পর্শমাত্রে আমার শরীর লঘু হইয়া যাইল। তিনি আমাকে লইয়া উঠিলেন। আমি পশ্চাতে তাকাইলাম। দেবকন্যা বলিলেন, তুমি যাঁহার নিমিত্ত পশ্চাতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছ, তাঁহাকে শীঘ্র পাইবে। আমি তাঁহার সহিত উঠিলাম। দেখিলাম, সেই ছিদ্র একটী প্রশস্ত দ্বার। তাহার মধ্য দিয়া প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, অনন্ত অসীম শোভা, কিন্তু তোমায় না দেখিয়া মন অস্থির হইল। দেবকন্যার মুখের পানে বিনীত ভাবে তাকাইলাম। দেবকন্যা অঙ্গুলি নির্দ্দিষ্ট করিলেন। দেখিলাম, এক খানা আদর্শ, তাহাতে তোমার মূর্ত্তি। দেবকন্যা বলিলেন, যে কয়েক দিন উঁহার আসিতে বিলম্ব হইবে, তুমি উঁহাকে আদর্শে দেখিতে পাইবে। তিনি মর্ত্ত্যলোকে কি করিতেছেন, তাহা তুমি উহার মধ্যে দেখিতে পাইবে। আমি যাহা দেখিলাম, তাহা বলিব না। আমার শোকে তোমার বড় যন্ত্রণা। তারপর কি যন্ত্র বাজিয়া উঠিল, অমনি একটী দেবদূত কি গান করিতে করিতে একটী রশ্মি ধরিয়া নামিলেন, গান করিতে করিতে তোমাকে আমার নিকট আনিয়া দিলেন। অমনি আবার কি বাজিয়া উঠিল, অমনি তিনটী দেবকন্যা আর তিনটী দেবপুত্র আমাদিগের দুইজনের হাত ধরিয়া মধুর মিলন গান গাইতে ২ আমাদিগকে লইয়া যাইলেন। একটা অপূর্ব্ব কুঞ্জবনে আমাদিগের আবাসস্থান দিলেন। সেখানে অনেক দেবকন্যা, অনেক দেবতনয়, অনেক পণ্ডিত ধার্ম্মিক মনুষ্য—অনেক সঙ্গীত, অনেক কবিত্ব ও অনেক অনেক জ্ঞান,—অনন্ত শোভা;—এই সকল ভাল করিয়া না দেখিতে দেখিতে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। এইটী বোধ হয় তোমার এবং আমার জীবন বৃত্তান্তের সাঙ্কেতিক বর্ণনা। আমার আর মরিতে কিছু কষ্ট হয় না। তোমাতে আমাতে আবার স্বর্গে সাক্ষাৎ হইবে—সেই কি সুখের দিন!

অমলেন্দু নিস্তব্ধ ও বিস্মিত হইয়া শুনিতেছিলেন। দেখিলেন, ইন্দুর মুখ রক্তবর্ণে প্লাবিত হইয়াছে; চক্ষু উজ্জ্বল হইয়াছে, ও বেগে নিশ্বাস পড়িতেছে। বলিলেন—"ইন্দু, একটু বিশ্রাম কর, নতুবা বড় কষ্ট হইবে।"

ইন্দু। "না, কষ্ট হইবে না। অমল আর দুই একটী কথা আছে। আজিগে বলিয়া থুই। শরীরের যে অবস্থা, কবে চলিয়া যাইব, তাহার স্থিরতা নাই। দাদা আমাকে বড় ভালবাসেন। এ জীবনে সকল আশা ভরসা, সুখ প্রতিপত্তি আমার নিমিত্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন, স্নেহময়ী মাতার ন্যায় আমার শুশ্রূষা করিয়াছেন, এবং আমার বিন্দু মাত্র সুখের নিমিত্ত নিজের প্রাণ দিতে সকল সময় প্রস্তুত আছেন। আমি মরিয়া যাইলে তাঁহার মনে বড়ই আঘাত লাগিবে। হয়ত সেই আঘাতে তাঁহার মৃত্যুও হইতে পারে। তোমার মানসিক বল আছে, তুমি তাঁহাকে দেখিও। বাবা এবং মা বোধ হয় শীঘ্রই আসিবেন। তাহা হইলে তোমাকে আর দেখিতে হইবে না। আমি

তাহার নিকট আমার প্রকৃত অবস্থা সাহস করিয়া বলিতে পারি না।” এই বলিয়া ইন্দু চুপ করিলেন। নির্ম্মল ইন্দুর নিমিত্ত কতকগুলি জিনিষ আনিতে বাসায় গিয়াছিলেন, ফিরিয়া আসিলেন, ইন্দু বলিলেন, দাদা আমার জন্ত আপনি অত কষ্ট স্বীকার কেন করেন?

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

গ্রামের ৫ ক্রোশ দূরে একটী ক্ষুদ্র রেলওয়ে ষ্টেসন আছে। সেই খানে নির্ম্মল, ইন্দুর পীড়ার বিষয় টেলিগ্রাফ করিতে গিয়াছিলেন। টেলিগ্রাফ এই—“ইন্দু আবার বড় অসুস্থ, একজন ডাক্তার আর আপনি শীঘ্র আসিবেন।” আর কয়েক দিন যাইল। ইন্দুর জীবন নিবু নিবু করিতেছে, মুখচ্ছবি ম্লান হইয়া আসিতেছে। আর আশা নাই—

ইন্দু।—“দাদা, মা কবে আসিবেন?”

নির্ম্মল।—“বোধ হয় অদ্য রাত্রিতে।”

ইন্দু।—“অদ্য রাত্রিতে আসিলে সাক্ষাৎ হইতে পারে। কল্য আসিলে সাক্ষাৎ হইবে কি না সন্দেহ। দাদা, আপনাকে একটা কথা বলিব ভাবিতেছি।”

নির্ম্মল।—“কি কথা দিদি!”

ইন্দু।—“কয়েক দিন পরে এ সংসারে আমি আর থাকিব না। আমার অবর্ত্তমানে আপনি মার একমাত্র সম্বল ও অবলম্বন। আমাকে অকালে মরিতে হইল। বাবা ও মার পক্ষে, আপনারও পক্ষে ইহা বড়ই শোকের কারণ, তাহা আমি জানি। কিন্তু ঈশ্বরের যাহা ইচ্ছা, তাহাই হইল। আমি জানি, আপনি আমাকে বড় ভাল বাসেন, আমি আপনাকে যত ভালবাসি তাহা হয়ত প্রকাশ হয় নাই, কার্য্যের দ্বারা প্রকাশ হইল না। কিন্তু আপনার ইষ্টের জন্যে আমি অনায়াসে সকল সময় আমার প্রাণ দিতে পারিতাম। কিন্তু তথাচ আমার জীবন বড়ই স্বার্থপর বোধ হইতেছে। সকল সময়ই নিজের দুঃখেতে আমি বড়ই মগ্ন ছিলাম। অনেক সময় আমি কর্ত্তব্য কাজও করিতে পারি নাই। কিন্তু আমার দুঃখময় জীবনের সকল ঘটনাত আপনি জানেন, আপনাকে আর কি বলিব? তবে যা বলিতেছিলাম—দাদা, আমি মরিলে মা বড় শোকাকুলা—”

নির্ম্মল এতক্ষণ অতি কষ্টে চক্ষুর জল চক্ষেতে রাখিয়াছিলেন, আর পারিলেন না, দর দর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। ইন্দু বলিল,—দাদা, একটু স্থির হইয়া আমার কথা শুনুন। এ সংসারে আমার আর অতি অল্প সময় আছে। আপনি কাতর হইবেন না। আমি বলিতেছিলাম, আপনি আমার মৃত্যুর পর আপনার জীবনের প্রতি উপেক্ষা করিবেন না, আপনি সংসারে উদাসীন হইবেন না। আপনার নিজের জন্যে যদি জীবনে আস্থা না করেন, দুঃখিনী মাকে ভুলিবেন না, তাহার জন্য আপনি সংসারে থাকিবেন। আর—আর আপনি বিবাহ করিবেন। কেন না করিবেন?”

নির্ম্মল।—ইন্দু, থাকুক, তোমার বড় পরিশ্রম হইতেছে।

ইন্দু।—আর একটা কথা। পিতা আমার নিমিত্ত যথেষ্ট অনুতাপ ভোগ করিয়াছেন। তাঁহার জন্য আপনি আমার কথা লইয়া তাঁহাকে কখন কষ্ট দিবেন না।

নির্ম্মল।—ইন্দু, তুমি এখন আর কথা কহিও না।

ইন্দু ক্ষণকালের নিমিত্ত নিদ্রা যাইলেন।

নিস্মল

...লেন, ইন্দু কেমন

...নহে ।"

...যাইয়াছে ।"

নিস্মল ।—আসুন ।

নিঃশব্দে উত্তরে ...লেন । ঘরে

জননী ...রত চক্ষু

...নীর চক্ষু

পিতা ... শেষ দেখা হইল ।

নিস্তব্ধ । অমল ও নিস্ম...

পার, ...

পাশ্চাত্য শিক্ষা ও হিন্দুধর্ম্ম।

ঘাতের পর প্রতিঘাত নৈসর্গিক নিয়ম। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশে ইংরাজিশিক্ষার নবীন-আলোকে অঙ্কিত-দৃষ্টি যুবকগণের চক্ষে হিন্দুধর্ম্ম হেয়, অপকৃষ্ট, কুসংস্কারের সমষ্টি-মাত্র বোধ হইত। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে আবার সেই হিন্দুধর্ম্ম কোন কোন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট অদ্ভুত মহিমাপূর্ণ, জ্ঞানখনি, ও বিজ্ঞানের চরমোৎকর্ষ বলিয়া প্রতিভাত। শুধু ইহাই নহে, হিন্দুধর্ম্ম অবমাননার কালে, গভীর নিনাদে পাশ্চাত্য শিক্ষার-মহিমা ঘোষিত হইয়াছিল; হিন্দু-ধর্ম্মের পুনরুত্থানে আবার পাশ্চাত্যশিক্ষার সংকীর্ণতা ও অনুদারতার উপর রোষ-কষা-য়িত তীব্র কটাক্ষ। একের সম্মান, অন্যের অপমান,—পূর্ব্বে হইয়াছে, এখনও হই-তেছে। দুইয়ের সামঞ্জস্য কখন হইল না।

আমরা এখানে 'হিন্দুধর্ম্ম' এই বাক্যে গভীর দর্শনশাস্ত্র-নিহিত ব্রহ্মজ্ঞান বুঝিতেছি না; হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত কার্য্যকলাপ, হিন্দু পদবাচ্য ব্যক্তিগণের আচার ব্যবহার, ও হিন্দুসমাজের চিরন্তন বিশ্বাস-পরম্পরা বুঝি-তেছি।

কেনই বা পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রথমাবি-র্ভাবে হিন্দুধর্ম্ম ঘৃণিত হইয়াছিল? কেনই বা আবার অধুনা স্থল বিশেষে আদৃত হই-তেছে? এই প্রশ্নদ্বয় উত্তর করিতে হইলে অনেকগুলি বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যক।

মনুষ্যচরিত্র বিভিন্ন উপাদানে গঠিত। বুদ্ধিবৃত্তি, ইচ্ছাবৃত্তি, অহঙ্কার, রিপু প্রভৃতি পরস্পর-বিরোধী মনোভাব লইয়া মানব চরিত্র নির্ম্মিত। ইহাদের মধ্যে কোন এক-টার অযথা প্রাবল্য হইলে অপরগুলি সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি পায় না। ইচ্ছা অদম্য হইলে, যুক্তি পরিচালনার ব্যাঘাত ঘটে। অহঙ্কার বা রিপু উচ্ছৃঙ্খল হইলে, পূর্ব্বোক্ত বৃত্তিদ্বয় সম্যক্ কার্য্যকরণে অক্ষম হয়। বিচারশক্তির স্থির বিকাশের নিমিত্ত সমুদায় মানসিক উপকর-ণের সামঞ্জস্য আবশ্যক। কিন্তু এই প্রকার সামঞ্জস্য সাধারণত অসম্ভব। পূর্ব্বসংস্কা-রের প্রবল আকর্ষণী শক্তি, নূতনত্বের রুচির কান্তি, ও ব্যক্তিগত বিশ্বাসের কারণহীন দৃঢ়তা, অনেক স্থলে মানসিক স্থৈর্য্য বিনাশ করিয়া ধীর বিবেচনা বিলোপ করে। কোন একটী বিষয়ের গভীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হই-বার পূর্ব্বে মনকে সুপ্ত মীন হ্রদের ন্যায় অচ-ঞ্চল রাখিতে হয়। তাহা হইলেই হ্রদবক্ষের উপর গগন-বিরাজিত শশিকলার ন্যায়, মনে সম্পূর্ণ সত্য প্রতিবিম্বিত হয়। অন্যথা হইলে, —অহঙ্কার-লোষ্ট্র-বিক্ষেপে তরঙ্গায়িত হইলে, —প্রতিফলিত-চন্দ্র-বৎ, সত্য শতখণ্ডে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়, ও স্থিরজ্যোতি বিকীরণে পরাঙ্মুখ হইয়া একপ্রকার অস্ফুট চঞ্চল আলোকমাত্র প্রদান করে।

মানব কেবলমাত্র বুদ্ধিমান্ না হইয়া, বিসদৃশ মনোবৃত্তি সমূহে নির্ম্মিত হওয়ায়, সূক্ষ্মদর্শী বিচারে প্রায়শঃ অপারক। বিশেষত কোন একটী সামাজিক অথবা মানসিক বিপ্লবের সাধারণ আলোড়নে বিধ্বস্ত হইলে, বুদ্ধিমত্তার পরিমাণ আরও হ্রাস হয়, ও অন্যান্য বৃত্তিসকলের প্রাদুর্ভাব হয়, অতএব যথার্থ বিবেচনা, যথার্থ সত্যনির্ব্বাচন আরও সুদূরপরাহত হইয়া পড়ে। নবীন জীবনের

প্রবল প্রবাহে পূর্ব্ববিশ্বাসের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়। চিরবদ্ধ বারিরাশি, অকস্মাৎ নব-জলাবর্ত্তে ঘূর্ণায়মান হইলে, আপনার বেগ ধারণ করিতে পারে না; বাঁধ ভাঙ্গিয়া, কূল উছলিয়া, গ্রাম ডুবাইয়া, প্রলয়োর্ম্মির ন্যায় অগ্রসর হয়। কোথায় বা ধানের ক্ষেত, কোথায় বা উলুর বন; গাছ, আগাছা; ভাল মন্দ; প্রয়োজনীয়, নিষ্প্রয়োজনীয়, কিছুই বিচার করে না,—সমুদায়ই উন্মত্ত তরঙ্গে প্লাবিত করিয়া যায়। এখানে আরও একটা কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক। পূর্ব্বাবস্থার নিশ্চেষ্টতা যত অধিক, পরবর্ত্তী বিপ্লব সেই পরিমাণে ভীষণ হইবে। পূর্ব্ববিশ্বাস যে পরিমাণে একদেশী, তাহার বিপক্ষে প্রতিঘাতও সেই পরিমাণে অপরদেশী হইবে।

এখন দেখা যাউক, ইংরাজী শিক্ষার পূর্ব্বে আমাদের দেশের অবস্থা কি প্রকার ছিল। মুসলমান রাজ্যের ভগ্নাবস্থা ও ইংরাজ-রাজ্যদৃঢ়ীকরণের মধ্যবর্ত্তী সময়, বাঙ্গালী মনোবৃত্তির ইতিহাসে মরুভূমি। পূর্ব্বাবধিই পক্ষপাতী শাস্ত্রকারের কঠোর শাসনে জনসাধারণের জ্ঞানার্জ্জন এক প্রকার অসম্ভব ও উচ্চশিক্ষা সম্পূর্ণ একদেশী ছিল। কিন্তু যাহাও ছিল, রাজনৈতিক ঘটনাবলীর তীব্র তাড়নে তাহারও উচ্ছেদ হইবার উপক্রম হইল। বিপ্লবের পর বিপ্লব,—মুসলমানের পর ইংরাজ, পলাশীর পর দাওয়ানী, দাওয়ানীর পর দুর্ভিক্ষ, দুর্ভিক্ষের পর নন্দকুমার, দশশালা ও চিরস্থায়ী,—মনের শান্তি বিনাশ করিল, বুদ্ধি অস্থির করিল। যখন সকলে আপনার ধন, মান, প্রাণ লইয়া ব্যস্ত, তখন লেখাপড়ায় মন দিবার সময় কোথায়? এই সময়ে শিক্ষার অবস্থা যথার্থই শোচনীয় ছিল। বাঙ্গালা শিক্ষা ত প্রচলিত ছিলই না; বরং পণ্ডিতাভিমানী টোলাধ্যাপকেরা বাঙ্গালাকে "ভাষা" বলিয়া ঘৃণা করিতেন। যে টুকু সংস্কৃত বিদ্যা ছিল, টোলেই তাহার উৎপত্তি, টোলেই নিবৃত্তি। বুদ্ধিবৃত্তির বলাধানের জন্য যে প্রকার মনশ্চালনা প্রয়োজন, তাহার কিছুই ছিল না। অনর্থক তর্ক যাহাকে "বিচার" উপাধি দেওয়া হইত, শূন্য বাগাড়ম্বর যাহাকে পাণ্ডিত্য বলা যাইত, দশ বৎসর ব্যাকরণ মুখস্থ করা যাহাকে লোকে বিদ্যোপার্জ্জন কহিত, পুঁথি হইতে গোটাকতক শ্লোকাবৃত্তি যাহা দ্বারা ধনী মহলে মান বৃদ্ধি হইত,—এইত সংস্কৃত বিদ্যার অবস্থা! ইহাও আবার ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন জাতি শিখিত না, এবং ব্রাহ্মণের মধ্যে অতি যৎসামান্য ভগ্নাংশ শিখিত; অতএব ইহার বিস্তৃতি কতদূর ছিল, ও কি পরিমাণে দেশের উপকার সাধন করিতে সমর্থ হইত, তাহা অনায়াসেই অনুমান করা যাইতে পারে। বাঙ্গালার ত কথাই নাই। কড়ি, বিছুটি ও নাড়ুগোপাল প্রভৃতি দ্বারা যিনি শুভঙ্করের বাজারি হিসাব মুখস্থ করিতে পারিলেন, তিনি একজন দিগগজ মুহুরি হইলেন, ও জমীদারী সেরেস্তায় নায়েবীপদের উপযুক্ত হইলেন। যিনি দাতাকর্ণ ও গুরুদক্ষিণা পড়িয়া বঙ্গভাষায় মোক্তমুলর হইলেন, ও লিখিতে বসিলেই বানান ও ব্যাকরণে উক্ত ভাষার পার্ব্বণ-শ্রাদ্ধ করিতে পারিলেন, তিনি পাড়ার মধ্যে গণ্য ও পরামর্শদাতা হইয়া পড়িলেন। ইহার উপর যদি দুই একটা চাণক্যশ্লোক ভাঙা সংস্কৃততে আওড়াইবার ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে আপনাকে নবদ্বীপের বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের সমকক্ষ মনে করিতেন। ইতিমধ্যে যাঁহারা ইংরাজের

চাকরী করিবার মানসে ইংরাজি শিখিতে আরম্ভ করিলেন. বৃদ্ধ মহলে তাঁহাদের বড়ই মান। "সেল্‌ফ্‌ ইন্‌ষ্ট্রক্টর" "টানেস্‌ ভাইস" ও "ইস্‌মাল মারে" পড়িয়া বাঙ্গালা ব্যাকরণের সাহায্যে যাঁহার দুই চারিটা ইংরাজী কথা জুড়িবার ক্ষমতা জন্মাইল, ও প্রভৃত অঙ্গ ভঙ্গির দ্বারা সাহেবের নিকট আপনার মনের ভাব কথঞ্চিৎ ব্যক্ত করিতে সক্ষম হইলেন,তিনি "হউসে" কেরানীগিরি করিতে ও পাড়ার দরখাস্ত লিখিতে লাগিলেন। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, রীতি মত ইংরাজী শিক্ষার পূর্ব্বে যে শিক্ষা প্রণালী প্রচলিত ছিল, তাহা অতীব অকিঞ্চিৎকর। উদরান্নের চেষ্টাতেই উহা পর্য্যবসিত হইত। মানুষের যে মন বলিয়া একটা পদার্থ আছে, যাহার উন্নতি করিতে হয়, যাহার উন্নতিই মানুষের সুখের প্রধানতম কারণ, যাহাতে নানাবিধ সুন্দর ও গভীর ভাব নিহিত আছে, শরীরের ন্যায় যাহার ক্ষুৎপিপাসা আছে, ও শরীরের ন্যায় যাহার ক্ষুৎপিপাসা শান্তি করিতে হয়, এ সকল তাঁহারা আদৌ ভুলিয়া গিয়াছিলেন। পূর্ব্বতন বিশ্বাসে অন্ধ হইয়া, বর্ত্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট হইয়া, মন শূন্য শরীর লইয়া তাঁহারা জীবন অতিবাহিত করিতেন। দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, (সওয়ায়-কৃত্তিবাস, কাশীরাম, কবিকঙ্কন, ভারতচন্দ্র) প্রকৃতির সমস্যা, মানবের তত্ত্ব, সমাজের গতি—কিছুরই ধার ধারিতেন না। তাঁহারা অনেক বিষয় বিশ্বাস করিতেন, কিন্তু জানিতেন না কি কারণে অনেক কার্য্য করিতেন, কিন্তু লোকে করে বলিয়া করিতেন। দেব-দেবীকে যথেষ্ট ভক্তি করিতেন, কিন্তু মূল তত্ত্বের দিকে কখনও দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেন না। মহাসমারোহের সহিত বুলবুলের লড়াই, প্রভৃত বাদ্যভাণ্ড সহকারে ঘুড়ি ওড়ান, কালীপ্রসাদী হাঙ্গামা, হরুঠাকুরের পাঁচালী, ফুল আকড়াই, কৃষ্ণযাত্রা, তরজা, লইয়া অবসর সময় কাটাইতেন। আমরা এ কথা বলিতেছি না যে, তাঁহাদের প্রশংশনীয় কিছুই ছিলনা। কেবল মাত্র ইহাই বলিতে চাই যে, ইংরাজী শিক্ষার পূর্ব্বে বঙ্গের মনোবৃত্তির স্রোতে গভীর ভাঁটা পড়িয়াছিল। অচিরে বান ডাকিল। শীর্ণ স্রোতস্বতী হিমালয়ের তুষারচ্যুত স্নিগ্ধ বারিরাশিতে পূর্ণ হইল না। সমুদ্রের অপর পার হইতে লবণ সলিল উত্তাল-তরঙ্গে ক্ষীণ স্রোতের বাধা অতিক্রম করিয়া নদী বক্ষ স্ফীত করিল। স্রোত ফিরিল; পূর্ব্বের স্রোত প্রতিকূলগামী হইল। ইংরাজী শিক্ষা আসিয়া বঙ্গের শিক্ষার শূন্য সিংহাসন গ্রহণ করিল।

যখন ইংরাজী শিক্ষা আসিয়া বাঙ্গালা অধিকার করিল, তৎকালীন বঙ্গের মানসিক অবস্থার কথঞ্চিৎ আভাস দেওয়া হইয়াছে। যাঁহারা ইংরাজী উচ্চশিক্ষা পাইলেন, তাঁহাদের স্বদেশ, স্বভাষা, স্বপ্রথা সমূহের প্রতি কিরূপ ভাব হইতে পারে, দেখা উচিত। আমরা বলিতে চাইনা যে, তাঁহারা তাহাদের প্রতি যে অনাস্থা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা উচিত হইয়াছিল। আমরা কেবল দেখিব, তাহা স্বাভাবিক কিনা। তাঁহারা তিমিরাচ্ছন্ন অজ্ঞানকারা হইতে বিজাতীয় হস্তদ্বারা বিজাতীয় আলোকে নীত হইয়াছিলেন। কারণহীন বিশ্বাসের পরিবর্ত্তে, তাঁহারা সকারণ ব্যাখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যখন বাঙ্গালায় সাহিত্য আলোচনা ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, তখন সেক্সপিয়র-প্রমুখ অসীম সাহিত্য

ভাণ্ডার তাঁহাদের সম্মুখে মুক্তদ্বার। যখন হামাওয়াশীল-বাকী বঙ্গের চূড়ান্ত অঙ্কশাস্ত্র, তখন তাঁহারা নিউটনের "প্রিনসিপিয়া"র গভীর তত্ত্বে মগ্ন। ইতিহাস পড়িলেন,—দেখিলেন, ইংলণ্ডের শাসন নীতি ও সমাজ-নীতি; বুঝিলেন, ইউরোপে সভ্যতার ক্রমিক অথচ অনিবার্য্য বিস্তারের কারণ; জানিলেন, স্বাধীনচিন্তা ও বিদ্যাচর্চ্চা উন্নতির একমাত্র উপায়। দর্শন পড়িলেন; তর্ক করিতে শিখিলেন; সন্দেহ জন্মিল; অবিশ্বাস প্রশ্রয় পাইল। বিজ্ঞানের সহায়ে প্রকৃতি-তত্ত্ববিষয়ে ভ্রমান্ধকার দূর হইল। প্রাক্তনের—ইংরাজী শিক্ষায় তাহাদের বিবেচনায় পুনর্জন্ম,—প্রাক্তনের বিশ্বাস সকল অতীব ঘৃনাই বোধ হইল। ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে তাঁহাদের মনে যে উচ্চ-আদর্শ বদ্ধমূল হইয়াছিল, তাহার সহিত তুলনায় চতুষ্পার্শ্বে যাহা দেখেন, সকলই যেন অসম্পূর্ণ, অকিঞ্চিৎকর, অসার। মন এক কেন্দ্র হইতে অপর কেন্দ্রে ধাবিত হইল। এই প্রকাণ্ড আলোড়নে বুদ্ধিবৃত্তি কখনই সুস্থির থাকিতে পারে না। ধৈর্য্যচ্যুতি হইল; বিচারশক্তি-ভ্রংশ হইল। তাঁহারা দেখিলেন যে, হিন্দুধর্ম্মাশ্রিত কতকগুলি বিষয় পাশ্চাত্য-শিক্ষাজনিত জ্ঞানের বিরোধী; তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিলেন, সমগ্র হিন্দুধর্ম্ম সারহীন, মূর্খতাপূর্ণ, ও ভণ্ডামিপূর্ণ। আরও একটী কারণ ছিল, যাহার দ্বারা এই সিদ্ধান্ত কোন প্রকারে পরিবর্ত্তিত না হইয়া বরং অধিকতর বদ্ধমূল হইয়াছিল। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ইংরাজীশিক্ষার পূর্ব্বে লোকে অনেক বিষয় বিশ্বাস করিতেন, কিন্তু জানিতেন না, কি কারণে। যদি কেহ অনুসন্ধিৎসু হইয়া কখন কারণ জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হইতেন, তাহা হইলে উত্তর পাইতেন—"বচন রহিয়াছে," "শাস্ত্রকারের মত," "করিতে হয়" ইত্যাদি, ইত্যাদি। সুতরাং মূলশূন্য কাণ্ডের ন্যায় তাঁহাদের মনে কতকগুলি কারণশূন্য বিশ্বাস প্রোথিত ছিল মাত্র। একত্র অবস্থান ভিন্ন এই সকল বিশ্বাসের সহিত মনের অন্য কোন গূঢ়তর জৈবনিক সম্বন্ধ ছিল না। হইতে পারে যে, বহুকাল একত্র অবস্থানে পরস্পরের সহিত এতই অনুরক্তি জন্মিয়াছিল যে, উভয়কে বিচ্ছিন্ন করা অনেক স্থলে আয়াসসাধ্য; এবং যেমন চলিয়া আসিতেছিল, সেই প্রকার চলিয়া আসিলে হয়ত শতাব্দীতেও পরস্পরের বিচ্ছেদ সাধিত হইত না। কিন্তু গূঢ় জৈবনিক সম্বন্ধ অভাবে বিজাতীয় আক্রমণে সেই বিশ্বাস পরম্পরা মনে যে স্থান অধিকার করিয়াছিল, তাহা রাখিতে পারিল না। ইংরাজী শিক্ষার স্রোত আসিয়া ক্রমে গোড়া আলগা করিল, অবশেষে উৎপাটন করিয়া ভাসাইয়া লইয়া গেল। বিশ্বাস সুদৃঢ় কারণ-ভিত্তির উপর সংস্থাপিত হইলে কখনই এইরূপ আকস্মিক লয় প্রাপ্ত হয় না। জৈবনিক সম্বন্ধ থাকিলে কখনই এমন অকাতরে বিসর্জ্জন দেওয়া যাইত না। ইংরাজীশিক্ষা প্রণালী জয় লাভ করিল। হিন্দু ধর্ম্ম বলিল—"যা বলি বিশ্বাস কর, কারণ জিজ্ঞাসিও না," ইংরাজি শিক্ষা বলিল—"যা বলি বিশ্বাস করিও না, কারণ না জানিলে।" দাসত্ব হইতে স্বাধীনতা যেরূপ প্রিয়, ইংরাজী শিক্ষা হিন্দুধর্ম্ম হইতে সেই রূপ প্রিয় হইল। কেবল যে পাশ্চাত্য জ্ঞান প্রিয় হইল, তাহা নহে; হিন্দুধর্ম্ম ঘৃণিত হইল। ইংরাজি

শিক্ষিত যুবারা ভাবিলেন,—কঠোর শিক্ষয়িত্রি! তুমি এত কাল মানবের মাহবস্থ মনকে জঘন্য দাসত্বে বদ্ধ রাখিয়াছিলে? প্রতিহিংসা পরবশ হইয়া হিন্দুধর্ম্ম নির্যাতনে প্রবৃত্ত হইলেন। হিন্দুবিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন না; হিন্দুবিশ্বাসের বিপরীত কার্য্য করিতে লাগিলেন। ডিরোজিওর (Derozio) মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া হিন্দুধর্ম্মের অসারতা ও অমূলকতা গভীর গর্জ্জনে ঘোষণা করিতে লাগিলেন। যেন অবতীর্ণ মেফিষ্টফিলিস্ (Mephistopheles) অধীর ক্রোধে, অসীম ঘৃণায়, পূর্ব্বস্মৃতি একাকারে ডুবাইবার মানসে অট্টহাসিল। হিন্দুর যাহা কিছু প্রিয়, যাহা কিছু পবিত্র, যাহা কিছু মূল্যবান্, সকলই ঘোরতর অবজ্ঞায় পাত্র হইল। "Beef and Burgundy!" বলিয়া চীৎকার করত Young Bengal রাজপথে দলবদ্ধ হইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। "Down with Hinduism!" এই মহামন্ত্র বজ্রনাদে ঘোষিত হইল। হিন্দুর চির-প্রচলিত আচার ব্যবহার, হিন্দুর চির-পূজ্য রীতি নীতি, নব্যেরা বিষচক্ষে দেখিলেন। গরু খাও, বিধবার বিবাহ দাও, পুরনারীকে অন্দর হইতে বাহিরে আন, বিবাহে স্বাধীনতা দাও, খ্রীধর্ম্মাপ্রাপ্ত কুমারীর পরিণয় স্থগিত রাখ,—এই রব চারিদিকে। হিন্দুসমাজ সংস্করণের জন্ম ইংরাজী কেতার সভা সৃষ্টি হইতে লাগিল। সভাপতি, সম্পাদক, মেম্বর,—ইহাদের বা কতই মান। ইংরাজীতে বক্তৃতা, ইংরাজীতে নিমন্ত্রন, ইংরাজী আদব কায়দা,—সকলেতেই ইংরাজীর দ্বিতীয় সংস্করণ। Native—অপদার্থ। বাঙ্গালায় কথা কহা—ইংরাজী শিক্ষার অপমান। বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনা—পাশ্চাত্য জ্ঞানের অপমান। দেব দেবীপূজা—কলঙ্কময় পৌত্তলিকতা। ব্রাহ্মণকে প্রণাম করা—কুসংস্কারের চরম সীমা। হৃদয়কে শূন্য করিয়া পূর্ব্ব সংস্কার সকলকে বিদূরিত করা হইয়াছিল; কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে অন্য কোন গভীর বিশ্বাস বদ্ধমূল না হওয়ায় ব্যালাষ্ট (ballast) হীন নৌকার ন্যায় অনেকের মন সন্দেহ-সাগরে টলমল করিতেছিল। এই শূন্যতায় হতাশ হইয়া, কতিপয় ধর্ম্মভীত আত্মা বিভিন্ন ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিল। খ্রীষ্টের বাঙ্গালী শিষ্য জুটিল। রামমোহন রায়ের নবপ্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মধর্ম্ম-দলভুক্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইল। ক্রমশঃ।

শ্রীবরদাচরণ মিত্র।

আসাম ও বাঙ্গালী।

আসাম প্রকৃতির 'কাম্য কানন'—স্বাধীন জীবের লীলাভূমি। অভ্রভেদী বিশাল বিস্তৃত হিমালয়ের শেষ সীমা হইতে কতই অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় শ্রেণী উদ্ভূত,—কতই অসভ্য স্বাধীন জাতি সকলের বিহার ক্ষেত্র সুশোভিত। কামাক্ষ্যা পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চশৃঙ্গ ভুবনেশ্বরীর মন্দিরের পার্শ্বে দাঁড়াইলে, আসামের কি এক অপরূপ দৃশ্য দেখা যায়। কামাক্ষ্যা পাহাড়ের পাদমূলে, কলনাদী, স্ফতিময় ব্রহ্মপুত্র কুল কুল রবে বহিতেছে,—তাহার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া উমানন্দ পাহাড় আপন মস্তক নদী-গর্ভ হইতে উত্তোলন করিয়াছে। সোণায় সোহাগা,—রূপে অপরূপ মিশিয়া

রহিয়াছে। দক্ষিণে গারো পাহাড় শ্রেণী, পূর্ব্ব দক্ষিণে খাসিয়া পাহাড়শ্রেণীর সুদূর-স্থিত ঘন মেঘ রাজির ন্যায় মনোহর দৃশ্য, উত্তর পশ্চিমে হিমালয়ের ভোট সীমান্তের গগন-ভেদী প্রকাণ্ড পর্ব্বত,—সকলের মধ্যে অপ্রকাণ্ড প্রভৃতি অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় শ্রেণী। মহান এবং ক্ষুদ্র—বড় এবং ছোট, শাদা এবং কাল, তরল আর কঠিন একত্রে মিলাইয়া প্রকৃতি অপরূপ সাজিয়া রহিয়াছে! প্রকৃতিদেবীর সমস্ত সম্বল অঙ্গাভরণ যেন ক্লান্ত হইয়া আসামে খুলিয়া রাখিয়াছেন! আসামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের বর্ণনা করিতে পারে, এমন কবি দেখি নাই। আসামের যে সকল মনোহর দৃশ্য দেখিয়াছি, প্রাণ খুলিয়া, হৃদয় ঢালিয়া কাহাকেও বুঝাইতে পারি, সে শক্তি নাই। কোন কোন পুস্তক খুলিয়া আসামের বর্ণনা পাঠ করিয়াছি, কিন্তু তাহা যেন আমার নিকট কিছুই-নয় বলিয়া বোধ হইয়াছে। আমি আবার চেষ্টা করিয়া অন্যের হাস্যাস্পদ হইব কেন? কিন্তু হৃদয়ের উচ্ছ্বাসকে কে সকল সময়ে প্রশমিত করিয়া রাখিতে পারে? একবার সে চেষ্টা করিব।

আমি বলিয়াছি, আসাম প্রকৃতির কাম্য কানন। আসামে শোভা সৌন্দর্য্যের অভাব কোথাও নাই। যেখানে যাও, যে দিকে চাও, সেই দিকেই অতুল শোভা। শোভার উপরে আরো শোভা,—রূপের উপরে আরো রূপ—ঘনীভূত—বিজড়িত। ব্রহ্মপুত্র আসামে যে কি লীলাই খেলিতেছেন, কি ভাবই ঢালিতেছেন, কি আনন্দই প্রচার করিতেছেন, যে না দেখিয়াছে, সে বুঝিবে না। আসামের উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত তরঙ্গায়িত ব্রহ্মপুত্র প্রবাহিত,—উভয় কূলে পাহাড় শ্রেণী—সুদূরে এবং নিকটে। কোথাও ব্রহ্মপুত্র পাহাড়ের পদচুম্বন করিতেছেন, কোথাও পাহাড়কে বুকে করিয়া রহিয়াছেন,—কোথাও আপন অঙ্কে নিমগ্ন করিয়া রাখিয়াছেন। পাহাড়ে ও নদীতে এমন কোলাকুলি, এমন ঢলাঢলি আর কোথা আছে? যেখানে উভয় কূলে পাহাড়, সেখানে সঙ্কুচিত হইয়া নদী যেন পাহাড়ের জন্য স্থান করিয়া দিতেছেন;—আর যেখানে পাহাড় অনেক দূরে, সেখানে উন্মাদের ন্যায় তরঙ্গ বিহ্বল হৃদয়কে আরো প্রসারিত করিয়া ছুটিতেছেন;—যেন পাহাড় বিরহে ক্রোধোন্মত্ত। পাহাড় আর ব্রহ্মপুত্র ভিন্ন যে সকল স্থান আছে,—তাহা প্রায়ই অরণ্যময়। সর্ব্বত্রই গভীর বনরাজি—বিশাল হইতেও বিশালতর। আসামের শাল বনে বন্য হরিণ, বন্য ভল্লুক, বন্য ব্যাঘ্র, বন্য মহিষ বা বন্য বরাহ,—এই সকল স্বাধীন জীব তোমার জীবন নাশের জন্য বিচরণ করিতেছে, দেখিতে পাইবে; কিন্তু লোকের সমাগম বড় একটা দেখিতে পাইবে না। প্রকৃতির যে অমৃতময় ভাণ্ডারে কাম রূপ পাইয়াছিলেন, সে কামরূপময় আসাম আজ লোকসমাগম-হীন, কেবল স্বাধীন অসভ্য জীবের এবং পশুর আবাস ভূমি। নদীতে স্বাধীন জলচর জীব, অরণ্যে স্বাধীন বন্য জন্তু, পাহাড়ে স্বাধীন অসভ্য জাতি। কিন্তু আসাম-উপত্যকা-প্রদেশ একপ্রকার পুরুষত্ব-হীন—নীতিহীন,—চরিত্রহীন। আসাম তিন ভাগে বিভক্ত;—ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা-প্রদেশ, পাহাড়-প্রদেশ, এবং সুরমা উপত্যকা প্রদেশ। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা-প্রদেশ সকল আবার উপর আসাম এবং নিম্ন আসাম নামে খ্যাত। গোয়ালপাড়া, কাম-

রূপ, তেজপুর, শিবসাগর, নওগাঁও ও ডিব্রুগড়—ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ভুক্ত। গারো-পাহাড়, খাসিয়া এবং জৈন্তা পাহাড় এবং নাগা পাহাড়, পাহাড়-প্রদেশ নামে খ্যাত; এবং শ্রীহট্ট ও কাচার সুরমা উপত্যকা-প্রদেশ ভুক্ত। এতদ্ভিন্ন আকা, লুসাই প্রভৃতি নামধারী অসংখ্য অসংখ্য স্বাধীন জীব-নিবাস আছে। সাধারণত আসামের লোক সংখ্যা নিতান্ত অল্প। অনেক স্থানই জঙ্গলে পরিপূর্ণ;—আবাদ হয় না, চাষ হয় না। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ভূমিতে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আজ কাল ইংরাজি শিখিয়া, সদাশয়, মিষ্টভাষী হইয়াছেন, কেহ কেহ বা হ্যাট্ কোটধারী হইয়াছেন বটে, কিন্তু অধিকাংশই অজ্ঞানান্ধকারে নিমগ্ন। খুব ভাল লোকও দুই চারি জন দেখিলাম, কিন্তু সে যেন সমুদ্রে শিশির বিন্দু। অজ্ঞানতা ও অসভ্যতা বিজড়িত। উচ্চ জাতি ভিন্ন অন্য জাতির মধ্যে বিবাহ প্রথা প্রচলিত নাই, বলিলেই ঠিক কথা বলা হয়। বিহু-প্রথার কথা শ্রবণ করিলে সকলেরই হৃদয়ে ঘৃণার উদ্রেক হয়। সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলা যায় না। তবে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সাধারণত ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা-প্রদেশের নিম্নশ্রেণীর লোকেরা নীতি-হীন, চরিত্র হীন, ধর্ম্ম হীন,—মনুষ্যত্ব হীন! ব্যভিচার নিম্নশ্রেণীর মধ্যে দোষ বলিয়াই গণ্য নহে,—পিতা কন্যাকে গবর্ণমেণ্টের উচ্চকর্ম্ম-প্রাপ্ত বড় লোকের সহবাসে রাখিতে পারিলে সম্মান বোধ করে! পুরুষ জাতি সাধারণত নির্জ্জীব—আশাশূন্য,—স্ত্রীলোকের পদানত। স্ত্রীস্বাধীনতা আসামের সর্ব্বত্রই দেখা যায়। স্ত্রীলোকেরা উপার্জ্জন করে, পুরুষেরা ঘরে বসিয়া খায়। পাঠকগণ শুনিয়া চমকিত হইবেন, আসামের অধিকাংশ স্থলে প্রকাশ্য বেশ্যা নাই;—তাহার কারণ, ভদ্র পরিবার ভিন্ন, বাড়ীতে বাড়ীতে সকলে ঐ ঘৃণিত বৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকে। অহিফেন সেবনে পুরুষজাতির চরিত্র মহত্ত্ব একেবারে লোপ পাইয়াছে। আতিথ্য-প্রথা কোথাও নাই, বন্য জন্তুর হাতে তোমার প্রাণ যায় যাউক, তবু কেহ তোমাকে বাড়ীতে স্থান দিবে না। তবে গুপ্ত-প্রণয় খুলিতে পারিলে, দ্বার অবারিত! বাঙ্গালীর প্রতি আসামীদিগের ভয়ানক ঘৃণা! ইহার কারণ আর কিছুই নহে, পূর্ব্বে অনেক চরিত্রহীন বাঙ্গালী কামরূপে যাইয়া ভেড়া হইয়া যে মহা অনিষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে, সে অনিষ্টের কথা ইহারা সহজে ভুলিতে পারিতেছে না। আজও তাহারা এমন বাঙ্গালীর আদর্শ পায় নাই, যাহা দেখিয়া গত কথা ভুলিতে পারে। তাই বিজাতীয় ঘৃণা। আসামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিয়া বড়ই আনন্দ পাইয়াছিলাম। কিন্তু ব্রহ্মপুত্র-উপত্যকা-বাসীদিগের চরিত্র হীনতার কথা শুনিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারি নাই। তারপরে যখন শুনিলাম, বাঙ্গালীদিগের প্রতি ইহাদিগের বিজাতীয় ঘৃণা, তখন প্রাণ বড়ই অস্থির হইল। যে বাঙ্গালীর সহবাস ভিন্ন আসামের আর মঙ্গলের পথ নাই, সেই বাঙ্গালীর প্রতি ইহাদের বিজাতীয় ঘৃণা প্রাণে বড়ই যাতনা দিয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট সাধ্যানুসারে বাঙ্গালী বিদ্বেষে ইন্ধন দিতেছেন দেখিয়া আরো কষ্ট হইল। ভাষাভেদ করিয়া উভয় জাতির মধ্যে এক গভীর অন্তরায় খুলিয়াছেন! কূট রাজনীতির যেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, ভারতের দুই জাতি কোন

রকমে এক না হয়। এই সকল দেখিয়া নীরবে অনেক অশ্রুপাত করিয়াছি! কিন্তু সে সকল কথা এখন থাকুক।

আসামে আতিথ্য প্রথা নাই বলিয়া আমরা বড়ই কষ্ট পাইয়াছিলাম,—অনেক দিন উদরে অন্ন পড়ে নাই,—অনেকসময় কেবল প্রকৃতির শোভা দেখিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইয়াছে। দ্বিপ্রহরের রৌদ্র-দগ্ধ শরীর লইয়া, ভুর্কেশ্বরীর মন্দির, বশিষ্টাশ্রম, অশ্বকান্ত প্রভৃতি পাহাড় সন্দর্শনে অনেক সময় ক্ষুধার যে কষ্ট পাইয়াছিলাম, তাহা কখনও ভুলিব না। পয়সা দিয়াও অনেক স্থানে কিছুই পাওয়া যায় নাই। প্রাণান্তেও লোকেরা কাহাকেও সাহায্য করিবে না। ব্যবসা বাণিজ্যও ইহারা বুঝে না। খাটী আসামীর দ্বারা পরিচালিত দোকান আমরা উপত্যকা প্রদেশে কোথাও দেখিলাম না। পথক্লান্ত বাঙ্গালী পথিক যদি আসাম-গৃহীর গৃহে ক্লান্তি দূর করিতে পারিত, তবে অনেক সহৃদয় সুশিক্ষিত বাঙ্গালীর হৃদয় যে ইহাদের উন্নতির জন্য চেষ্টিত হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। আসামীদিগের নিকট বাঙ্গালীরা যেমন ব্যবহার পায়, বাঙ্গালীরাও আজকাল তেমনই ব্যবহার করেন। কেহ কাহাকে ডাকিয়াও জিজ্ঞাসা করে না, করিলেও ইহাদিগকে প্রায়ই উপেক্ষা করিয়া থাকে। কেহই ইহাদের উন্নতির কথা ভাবে না। আসামের উন্নতি কেমনে হইবে, জানি না।

পাহাড়ীদিগের মধ্যে গারো, খাসিয়া, নাগারাই প্রধান। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আরো অনেক সামান্যং পাহাড়ী জাতি আছে;—ইহারা প্রায়ই নানা প্রকার অত্যাচার করিয়া থাকে। শুনিয়াছি, সদিয়া হইতে ব্রহ্মকুণ্ড (ব্রহ্মপুত্রের উৎপত্তিস্থান) তীর্থে যাহারা গমন করে, তাঁহাদের অনেকেরই ভাগ্যে স্বদেশ-প্রত্যাবর্ত্তন ঘটে না। পাহাড়ীজাতিদিগের অত্যাচার নিবারণের জন্য গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বদাই চেষ্টিত, কিন্তু আজও সম্যক কৃতকার্য্য হইয়াছেন, বলা যায় না। তবে অনেকটা যে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। গারো পাহাড়, খাসিয়া পাহাড় একপ্রকার গবর্ণমেণ্টের অধীনে আসিয়াছে। নাগা পাহাড় কতকাংশ গবর্ণমেণ্ট দখল করিয়াছেন, কতক এখনও স্বাধীন। এই অসভ্য জাতি সকল নামত গবর্ণমেণ্টের অধীন হইলেও, ইহারা একপ্রকার স্বাধীন। খাসিয়া পাহাড়ের কথা এই প্রবন্ধে আমরা কিছু বিশেষ করিয়া বলিব। খাসিয়া পাহাড় শ্রেণীর মধ্যে শিলং নামক স্থানে আসামের প্রধান কমিসনারের আফিসাদি স্থাপিত। খাসিয়া পাহাড় শ্রেণীর গৌহাটীর দিকের অংশ অরণ্যময়, বন্য হিংস্র জন্তু পরি পূর্ণ। শিলং পাহাড়ের নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহ বৃক্ষশূন্য। শিলং পাহাড়ে কেবল অনেক সরল বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। গৌহাটী হইতে শিলং ৬৩ মাইল পথ; আবার শিলং হইতে শ্রীহট্ট ৬০ মাইল পথ; এই সমস্ত পথ আমরা হাটিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম। গৌহাটি হইতে শিলং যাইতে বর্ণিহাট, নংপো, নয়াবাঙ্গলা প্রভৃতি কয়েকটী আড্ডা আছে। প্রত্যেক আড্ডায় গবর্ণমেণ্টের ডাক বাঙ্গালা আছে, এবং ইতর লোকদিগের জন্য এক এক খানি প্রকাণ্ড সরাই ঘর আছে। এই জনপ্রাণীহীন ভীষণ অরণ্যময় পাহাড়ে গবর্ণমেণ্ট স্থানে স্থানে এই রূপ সরাই স্থাপন করিয়া পথিকদিগের যে কি মহৎ উপকার করিয়াছেন, তাহা এক মুখে

বলা যায় না। মধ্যে মধ্যে এই রূপ আড্ডা না থাকিলে কেহ সে ভীষণ পথে চলিতে পারিত না, কেহ বন্য জন্তুর করাল গ্রাস হইতে রজনীতে প্রাণ বাঁচাইতে পারিত না। অনেকে গৌহাটী হইতে শিলং পর্য্যন্ত টোঙ্গাতে এক দিনে গমন করেন; তাঁহাদের ভাগ্যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখা ঘটে কিনা, জানি না। গভীর নিস্তব্ধ ঘন বৃক্ষ রাজির ভিতরে ঝরনার কুল কুল শব্দ, প্রপাতের ঝর ঝর শব্দ, প্রভাত পাখীর মধুর কণ্ঠের স্বাধীন সঙ্গীত—প্রকৃতির মনোহর রূপ দেখিতে দেখিতে, উপভোগ করিতে করিতে যে কখনও সে বিজন পথে যায় নাই, সে নীরব জগতের ফুটিত সে গভীর সৌন্দর্য্য কি বুঝিবে? আমরা অনাহার ও অনিদ্রার পথকষ্ট সকলই ভুলিয়াছিলাম—প্রকৃতির সে নীরব অথচ জীবন্ত, ভীতিযুক্ত অথচ মধুময় শোভার মধুরিমা উপভোগ করিয়া। কখনও পদতল হইতে শ্বেতাভ পাত্‌লা মেঘ ভাসিয়া উঠিতেছে,—কখনও ঘন গভীর কাল মেঘ ভীমরবে ডাকিয়া ডাকিয়া চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া ফেলিতেছে,—কখনও বৃক্ষের ভিতর দিয়া মেঘ-রঞ্জিত ক্ষুদ্র সূর্য্যের রশ্মি বৃক্ষে বৃক্ষে পড়িতেছে, কোথাও ঝরণার কল কল নাদ, অম্বরভেদী প্রপাতের ঝর-ঝর রব আকাশে উঠিতেছে! পথ-কষ্ট ত দূরের কথা, জীবনের সকল কষ্ট, সকল দুঃখ কয়েক দিনের জন্য ভুলিয়াছিলাম, সেই শিলং এবং চেরাপুঞ্জের বিজন পথে।

শিলং পাহাড়ের দৃশ্য অতি চমৎকার। সেখানে ভীতিযুক্ত অরণ্য নাই,—হিংস্র জন্তু নাই, ব্যাঘ্র ভল্লুক নাই, দস্যুর ভয় নাই। ঈশ্বরের কৃপায় তিন দিনের দিন আমরা সকল প্রকার হিংস্র জন্তুর হাত হইতে রক্ষা পাইয়া শিলং পৌঁছিলাম। চতুর্দ্দিকে সরল বৃক্ষ শ্রেণী সোঁ সোঁ রবে বায়ু ভরে হেলিয়া দুলিয়া কত কি বলিতেছে,—কত কি নিস্তব্ধ ভাব ঢালিতেছে,—কত কি সুখের কথা প্রচার করিতেছে। দুই তিন দিন থাকিয়া আমরা দৃশ্য স্থানগুলি দেখিলাম। বাঙ্গালী এবং আসামী অনেক বন্ধুর সহিত হৃদ্যতা জন্মিল। যে কয়েকটী জলপ্রপাত সেখানে গভীর ভাব-মুক্তা ঢালিতেছে, তাহা দেখিলাম। শিলং-পিক নামক সর্ব্বোচ্চ স্থানে অধিরোহণ করিয়া অনন্ত পাহাড় শ্রেণীর অনন্ত সৌন্দর্য্য দেখিলাম। যেরূপ ভাষায় ব্যক্ত হয় না, যে সৌন্দর্য্য কথা বদ্ধ হয় না, তাহা বাস্তবিকই অনন্ত। পাহাড়ের নিম্নে পাহাড়, তাহার নিম্নে পাহাড়, তাহার নিম্নে আরো পাহাড়,—ক্রমাগত চতুর্দ্দিকে ক্রম-নিম্ন খোলা পাহাড় শ্রেণী শোভা পাইতেছে। সকলেরই উপরে সূর্য্যের রশ্মি প্রতিফলিত, সকলেরই উপরে বায়ু ভীষণরবে প্রবাহিত,—তাহার উপরে আমরা। কোথাও বৃক্ষ দৃষ্টিতে পড়েনা,—সব শূন্য, সব অনাবৃত,—সব অনন্ত। অনন্তদেবের অনন্তরূপ সেখানে ফুটিয়া ফুটিয়া যেন পড়িতেছে! দেখিতে দেখিতে মেঘ উঠিল,—অনেক পাহাড়কে ঢাকিয়া ফেলিল। অনেক সময়, দেখিতে দেখিতে পাহাড় মেঘে যেমন সমুদ্রের ন্যায় হইয়া যায়; সে দিন তেমন হইল না। সূর্য্যের রশ্মি মাখা বায়ুর সহিত মেঘের ক্রীড়া বড়ই আনন্দপ্রদ বোধ হইয়াছিল। শিলং দেখিয়া অনেকের হৃদয়ে সৌন্দর্য্যের আদর্শ সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু আমার মনে তাহা কিছুই হয় নাই। আমার মন এক স্বাধীন জাতির ভবিষ্যত চিন্তায়

সদাই নিমগ্ন ছিল। সে জাতির নাম খাসিয়া জাতি। খাসিয়া পাহাড় শ্রেণী সমস্তই এক প্রকার স্বাধীন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে সকল রাজা আছে, তাঁহারা অশিক্ষিত এবং অসভ্য, কিন্তু স্বাধীন। তাহারা গবর্ণমেণ্টকে কোন প্রকার কর দেয় না, বিচার বিধি ব্যবস্থা নিজেরাই করে, তবে হত্যা প্রভৃতি গুরুতর অপরাধের বিচার-ভার গবর্ণমেণ্টের উপর তাহারা ন্যস্ত করে। প্রজারা নামত রাজার অধীন; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহারা সকলেই এক প্রকার স্বাধীন। তাহাদিগকে জমীর খাজনা রাজাকে দিতে হয় না;—যাহার যত ইচ্ছা খোলা পাহাড়ে চাস করিতে পারে। শিলং নগরের জন্য গবর্ণমেণ্ট কতকটা স্থান রাজার নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন;—আর সমস্তই রাজার জমী; শিলং নগরে যাহারা বাস করে, তাহাদিগকে গৃহ-হিসাবে কিছু কিছু দিতে হয়। খাসিয়া পাহাড়ে বৎসরের অধিকাংশ সময়ই আলুর চাষ হইয়া থাকে। আমরা জ্যৈষ্ঠ মাসে গিয়াছিলাম, তখন দেখিলাম, কোন স্থান হইতে কৃষকেরা আলু তুলিতেছে, আর কোথাও বা রোপণ করিতেছে। স্ত্রী পুরুষ সকলেই চাষ করে। কোথাও কোথাও ধানের চাষও হয়। শিলং থাকিতে থাকিতেই, হাটে বাজারে, রাস্তা ঘাটে খাসিয়া স্ত্রী পুরুষ দেখিলাম। তাহাদিগের বলিষ্ঠ কর্ম্মপটু শরীর দেখিয়া হৃদয়ে বড়ই আনন্দ হইয়াছিল। স্ত্রী পুরুষ উভয়ই সবলকায়,—দৃঢ়, কর্ম্মঠ। স্ত্রী পুরুষ সকলেই চাস বাস করিয়া থাকে, কাঠ কাটে, অন্যান্য আবশ্যকীয় সমস্ত কার্য্যই করে। ইহাদিগের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা নাই, বাল্য-বিবাহ নাই, বিধবা বিবাহ ও পুনর্ব্বিবাহ প্রচলিত আছে। আসামের উপত্যকার নিম্ন জাতি সকল যেমনই নীতিহীনতার পূর্ণ বিকাশ, খাসিয়া জাতি তেমন নহে। ইহাদের নিকট সতীত্বের আদর আছে। দুঃখের বিষয়, শিলং নগরে, সাহেব এবং বাঙ্গালীর দোয়াক্মো, কোন কোন খাসিয়া রমণী স্বৈরিণীর ঘৃণিত ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছে। খাসিয়া জাতির বর্ণ উজ্জল—রক্তাভ কাঁচা সোণার ন্যায়। রমণীদিগের মধ্যে প্রকৃত সুন্দরী অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা পুতুল পূজা করে না। রূপান্তরে এক ঈশ্বরকেই মানে। পূজা অর্চ্চনা বড় একটা করে না। ইহাদিগকে খ্রীষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য অনেক নিঃস্বার্থ ইংরাজ-মিশনরি খাসিয়াপাহাড়ে বাস করিতেছেন। ইহাদিগের চেষ্টায় অনেকে শিক্ষার আলোক প্রাপ্ত হইয়াছে, সভ্যতার আস্বাদন পাইয়াছে। অনেকে গবর্ণমেণ্টের উচ্চ কর্ম্মও পাইয়াছে।

আমরা শিলং হইতে চেরাপুঞ্জি যখন রওয়ানা হইলাম, তখন কোন বন্ধু আমাদিগের সহিত দুইজন রমণী-মুটে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। তাহাদিগের ভাষা আমরা বুঝি না, আমাদের ভাষা তাহারা বুঝে না, অথচ আমরা অপরিচিত রাজ্যে ইহাদিগের সহিত চলিলাম। বিশ্বাস এইছিল যে, ইহারা কখনও প্রতারণা বা প্রবঞ্চনা করিবে না। বন্ধুদিগের সকলেই বলিয়াছিলেন, ইহারা প্রবঞ্চনা করিতে জানে না। শুনিয়াছি, কার্য্যোপলক্ষে ইহারা সরকারী জেলখানা হইতে সময়ে সময়ে পলায়ন করে বটে, কিন্তু কার্য্য শেষে আপনাআপনি আবার ফিরিয়া আসিয়া থাকে। শিলং হইতে চেরাপুঞ্জির পথ বড়ই সুন্দর—বৃক্ষ হীন, সাড়া শব্দ হীন—প্রকৃতির গভীর নিস্তব্ধ

ভাবে পূর্ণ। এমন গভীর জীবন্ত নিস্তব্ধতা আমি আর কোথাও দেখি নাই। গিরি-শঙ্কটের মধ্য দিয়া, পাহাড়ের গায়ে গায়ে পড়িয়া মধ্যে মধ্যে ঝরণার সোঁ সোঁ শব্দ সে নিস্তব্ধতাকে ভেদ করিতেছে, শুনা যায়। সে যে কি আশ্চর্য্য ব্যাপার, আমি লিখিতে পারি না। এই পথে দ্বিতীয় দিনে কিছু জনতা দেখিলাম। মন্‌ক্রিন নামক স্থানের রাজার বাড়ীতে নৃত্য হইবে, আমরা পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলাম। পথের মধ্যে দেখিলাম, দলে দলে স্ত্রীপুরুষ, কেহ বা হাটিয়া, কেহ বা অশ্বপৃষ্ঠে, কেহ বা লোকের পৃষ্ঠে * মন্‌ক্রিনের দিকে যাইতেছে। খাসিয়া রমণীদিগের বস্ত্র-ব্যবহার প্রণালী অতি সুন্দর, অতি পরিপাটী। কোন সভ্য জাতির মধ্যেও এরূপ কাপড় পরার রীতি আছে কি না, সন্দেহ। মস্তক ভিন্ন ইহাদের সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রে সুপ্রণালীতে আবৃত। ইয়ুরোপীয় মহিলাগণের বক্ষস্থল আবৃত থাকিয়াও যে প্রকার কুৎসিত রুচির পরিচয় দেয়, ইহারা তাহা দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারে না। ইহাদিগের কোন অঙ্গই ঐরূপ কুরুচির পরিচয় দেয় না। রমণীদিগকে প্রফুল্ল, বলিষ্ঠ, সুস্থ, মিষ্টভাষী, ও বিনয়ী বলিয়া বোধ হইল। অনেকের নিকট ইহাদিগের যথেষ্ট প্রশংসা শুনিলাম। ভারতবর্ষের অসভ্য জাতি খাসিয়া রমণীদিগকে স্বাধীন ভাবে ভ্রমণ করিতে, কার্য্য করিতে দেখিয়া প্রাণে যে কত আনন্দ হইয়াছিল, তাহা আর কি বলিব? দেখিলাম, কোথাও ইহারা কাঠ কাটিতেছে, কোথাও মাটী খুড়িতেছে, কোথাও মোট বহিয়া যাইতেছে। আমরা এই আনন্দ উপভোগ করিতে করিতে, পাহাড়ের উপর দিয়া হাটিয়া, যথা সময়ে চেরাপুঞ্জি পৌঁছিলাম। চেরাপুঞ্জিতে পৃথিবীর সকল দেশ অপেক্ষা অধিক বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। এই খানেই ১০।১২ বৎসর পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের প্রধান আড্ডা ছিল; কিন্তু অত্যন্ত বৃষ্টিপাতের জন্য গবর্ণমেণ্টের আফিসাদি উঠিয়া শিলং গিয়াছে। চেরাপুঞ্জি খাসিয়াদিগের প্রধান পুঞ্জি। এখানে খ্রীষ্টানদিগের একটী স্কুল আছে, রাজারবাড়ী আছে, পোষ্টাফিস আছে। এতদ্ভিন্ন ডাকবাঙ্গালা ও পূর্ব্বের ভগ্ন অট্টালিকার অবশিষ্টাংশ অনেক আছে। চেরাপুঞ্জির প্রাকৃতিক শোভা মনোহর! এখানে প্রায় বার মাস কিছু কিছু শীত থাকে। কয়েলার খনি, চুণের খনি, চেরাপুঞ্জিতে প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। চেরাপুঞ্জির অতি নিকটে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ মস্মাই-জল-প্রপাত! উচ্চতায় ইহার সমান জল-প্রপাত পৃথিবীতে আর নাই। থারিয়াঘাট হইতে চেরাপুঞ্জি পর্য্যন্ত ট্রাম রাস্তা প্রস্তুত হইতেছে, সত্বরই খুলিবে। স্থানে স্থানে ট্রাম রাস্তা৫০০,৬০০ শত ফিট প্রায়-লম্ব ভাবে উঠিয়াছে। এ প্রকার ট্রাম পৃথিবীর মধ্যে আর কেবল আল্পস্ পর্ব্বতে আছে। যে সকল স্থানে রাস্তা প্রায়-লম্ব ভাবে উঠিয়াছে, সে সকল স্থানে হাইড্রলিক-প্রেসার দ্বারা গাড়ী টানিয়া তোলা হইবে। ট্রাম রাস্তা খুলিলে চেরাপুঞ্জি একটা বাণিজ্য-প্রধান স্থান হইয়া উঠিবে। চেরাপুঞ্জিতে খ্রীষ্টান মিসনরিগণ প্রভূত কার্য্য করিয়াছেন;—অনেক গুলি পরিবারকে খ্রীষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া একটী

* শিলং অঞ্চলে, থারিয়াঘাট পর্য্যন্ত থোবার চলন আছে। বাহকেরা পীঠে মোড়ায় বসাইয়া পথিকদিগকে লইয়া যায়।

নূতন পল্লী সংস্থাপন করিয়াছেন। চেরাপুঞ্জির স্বাধীন রাজার ভ্রাতা খ্রীষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন। যাহারা খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী, তাহারা অপেক্ষাকৃত সভ্য। ইহাদের মধ্যে বড় ছোট ভেদাভেদ নাই;—রাজ পরিবারের মেয়েরা পর্য্যন্ত বাজারে যাইয়া ক্রয় বিক্রয় করে। যাহারা খ্রীষ্টান হইয়াছে, তাহাদিগের সহিত অপর খাসিয়াদিগের আদান প্রদান এবং আহার বিহার চলিয়া থাকে। খাসিয়ারা বরাহ মাংস প্রিয়। এই জন্য ইহাদিগের প্রতি কাহারও কাহারও ঘৃণা দেখা যায়; কিন্তু ইহাদিগের স্বভাব চরিত্র বড় ভাল। খাসিয়া-রমণীর সৌন্দর্য্য-মুগ্ধ অনেক বাঙ্গালী ইহাদিগের সহবাস-লালায়িত, কিন্তু সামাজিক শাসনের ভয়ে কেহই ইহাদিগকে প্রকাশ্য ভাবে বিবাহ করিতে প্রস্তুত নয়। শ্রীহট্ট-বাসী এক জন সম্ভ্রান্ত খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী মহাত্মা কেবল প্রকাশ্যে খাসিয়া মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার কয়েকটী কন্যা হইয়াছে; আজিও তাহাদিগের বিবাহ হয় নাই। খাসিয়ারা বড়ই বাঙ্গালী ভক্ত—বাঙ্গালীদিগকে ইহারা বড়ই শ্রদ্ধা করে। যে সকল খাসিয়া শিক্ষিত হইয়াছে, তাহাদিগের ইচ্ছা, বাঙ্গালীর সহিত আদান প্রদান চলে,—বাঙ্গালীর সহিত বিবাহাদি দিতে অনেকেরই ইচ্ছা। বাঙ্গালীকে বিবাহ করিতে অনেক বালিকার বাসনা আছে। খ্রীষ্টীয় মিসনারিরা যে প্রকার স্কুল করিয়াছেন, কোন বাঙ্গালী যদি সেই প্রকার চেরাপুঞ্জিতে একটী স্কুল স্থাপন করেন, তবে অনেক বালক বালিকা বাঙ্গালা পড়িতে প্রস্তুত আছে। শুনিলাম, চেরাপুঞ্জির রাজার আন্তরিক ইচ্ছা, সেখানে একটী বাঙ্গালা স্কুল হয়। আমরা রাজার সহিত এই সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে গিয়াছিলাম, কিন্তু রাজা তখন বাড়ীতে ছিলেন না। এই অসভ্য জাতির মধ্যে এমন অনেক মহত্ত্বের অস্ফুট লক্ষণ দেখা যায়, যাহাতে স্পষ্ট মনে হয়, সুশিক্ষিত হইলে, বলে কৌশলে, বিদ্যা বুদ্ধিতে ইহারা কালে শ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িল, ইহাদিগের সামাজিক আচার ব্যবহার লিখিতে পারিলাম না। বাল্য বিবাহ প্রচলিত না থাকায়,ইহাদিগের মধ্যে মনোনয়ন প্রথা মতে বিবাহ সম্পন্ন হয়। বিবাহভঙ্গ প্রথাও প্রচলিত আছে। কিন্তু যত দিন প্রকাশ্য ভাবে বিবাহ ভঙ্গ না হইবে, তত দিন ইহারা অন্য কাহারও সহবাস করে না। মৃত ব্যক্তির প্রতি ইহাদের বড়ই সম্মান। পরিবারের কেহ মরিলে, যত দিন সমস্ত আত্মীয় বান্ধব মিলিত না হয়, তত দিন তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা হয় না। এই প্রকারে কখনও কখনও এক বৎসর, কখনও বা দুই বৎসর পর্য্যন্ত, মৃত দেহ রক্ষিত হয়। সমাধির উপরে ইহারা বড় বড় প্রস্তর খণ্ড চিহ্ন স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করে। ইহারা যুদ্ধের সময় তীর ধনুক ব্যবহার করিয়া থাকে।

আমার মনে এই গভীর প্রশ্ন উদিত হইয়াছিল, এবং আজও তাহা মনের মধ্যে আন্দোলিত হইতেছে,—আমাদের মধ্যে কেহ কি এমন ব্যক্তি নাই, যিনি এই খাসিয়া জাতির উন্নতির জন্য জীবন ক্ষয় করিতে পারেন? আমরা আজ কাল বড়ই সাহেব ঘৃণা শিখিয়াছি, কথায় কথায় সাহেবদিগের নিন্দা করিয়া থাকি, কিন্তু এই সাহেবদিগের কত মহাত্মা, জীবনের

সকল প্রকার সুখ বিসর্জ্জন দিয়া, সাত সমুদ্র পার হইয়া আসিয়া যে ভারতের কত অসভ্য জাতির কত মহৎ উপকার করিতেছেন, ভাবিলে অবাক হইতে হয়! আমরা আমাদের দেশীয়দিগের জন্ম কিছুই করিতে পারি না, আর ইহাঁরা, একমাত্র ধর্ম্মের আকর্ষণে, কত দূর দেশ হইতে আসিয়া কি মহৎ কার্য্য করিতেছেন। বাঙ্গালা প্রদেশ লোকসংখ্যার আধিক্যে প্রপীড়িত, কিন্তু আসাম অরণ্যে পরিপূর্ণ, চাষ করিবার লোক নাই। কেহ মনে ভাবিবেন না, আসাম অনুর্ব্বর ক্ষেত্র। আসামের ন্যায় উর্ব্বর ক্ষেত্র বাঙ্গালার নাই। এই আসামের অর্দ্ধেকেরও অধিক স্থান অনাবাদি পড়িয়া আছে। খাসিয়াপাহাড় অনেক স্থানেই অনাবাদি। আমাদের দেশের কোন কোন মহাত্মা যদি আসামকে জীবনের লক্ষ্য করিতে পারেন, তবে সে সকল দেশেরও উপকার হয়, আমাদের দারিদ্র্য ও দূর হয়। কিন্তু কি পরিতাপের বিষয়, একজন বাঙ্গালীকে দেখিলাম না, যিনি আসামের উন্নতির জন্ম বিশেষত উর্ব্বর কর্ষিত-ক্ষেত্র খাসিয়াদিগের উন্নতির জন্ম কিছু করিতেছেন! এ কলঙ্ক, এদুঃখ আর রাখিবার স্থান নাই। গৃহের পার্শ্বে, বঙ্গের কোলে, আসামের কত অভাব দেখিয়া আমরা কিছুই করিতেছি না! কেবল কথায় কি দেশ উদ্ধার করা হয়? জীবন-রক্ত ঢালিয়া দিয়া যদি আসামের উন্নতির জন্ম কেহ চেষ্টা করিতে পারেন, তবে তিনিই দেশ উদ্ধারের বীজমন্ত্র বপন করিবেন। এমন উর্ব্বর অনাবিল ক্ষেত্র ভারতের আর কোথাও আছে কি না, সন্দেহ। এই সময়ে কেহ যদি এই বিভাগে কর্ত্তব্য-চক্ষুকে ফিরান, তবে দেখিবেন, বুঝিবেন, তাঁহার দ্বারা কি মহৎ কার্য্য সাধিত হইবে। চেরাপুঞ্জিতে একটী স্কুল স্থাপন করিয়া, খাসিয়াদিগের মধ্যে ধর্ম্মনীতি শিক্ষা দিয়া উপযুক্ত করিতে পারিলে এবং বাঙ্গালীর রক্তে খাসিয়ার রক্ত মিশ্রিত হইলে যে বংশ উৎপন্ন হইবে, তাহাদের দ্বারা ভারতের অনেক অভাব দূর হইতে পারিবে। নিশ্চয় দূর হইবে। চেরাপুঞ্জির বায়ু কোন অংশে দারজিলিঙ্গ অপেক্ষা মন্দ নহে। ক্ষেত্রের ত কথাই নাই। এই স্থানে যদি ম্যালেরিয়া-গ্রস্ত বাঙ্গলার দরিদ্র পরিবার সকল যাইয়া বাসগৃহ নির্ম্মাণ করেন, এবং খাসিয়াদিগের সহিত সামাজিক আচার ব্যবহারে মিলিত হন, তবে কালে বাঙ্গালীর আদর্শে, ইহাদিগের অনেক উপকার হইবে, এবং কালে ইহাদিগের দ্বারা অনেক মহৎ কার্য্য সাধিত হইবে। কিন্তু বাঙ্গলায় এমন লোক কোথায়? এমন সহৃদয়, সমদুঃখী কে আছেন, যিনি বক্তৃতা ছাড়িয়া কার্য্যে মনোযোগী হইবেন,—যশের আশা ছাড়িয়া জীবনকে নির্জ্জন প্রদেশে ভাসাইবেন,—কল্পিত সুখকে উপেক্ষা করিয়া পরের উপকারে মনোযোগী হইবেন! যত দিন এপ্রকার লোকের অভ্যুদয় অসম্ভব, ততদিন যেন বাঙ্গালী ইংরাজকে ঘৃণা না করে। হায়; যে ইংরাজদের অসংখ্য অসংখ্য মহাত্মা পরের উন্নতির জন্ম অক্লেশে জীবন দিতেছেন, তাঁহাদের মহত্ত্বে কি ভারত কখনও দীক্ষিত হইবে না? ইংরাজের দোষালোচনা লইয়াই কেবল যে রহিল, সে আর এই জাতির মহত্ত্ব কি বুঝিবে?

আমি-তত্ত্ব।

পৃথিবীতে আমি মহাশয়ের বড়ই দৌরাত্ম্য। ইহার গৌরবের ঘটায়, বাক্যের ছটায় প্রাণ আলাতন, হাড় ভাজা ভাজা। ঐ যে দেখিতেছ, অমুক ব্যক্তি, আজ কাল বড়মানুষ বিদ্বান্ যশস্বী হইয়া লোকের প্রশংসা সংগ্রহ করিতেছে, উহাকে এত বড় করিল কে বল দেখি? শর্ম্মারাম! আমিই উহাকে মানুষ করিয়াছি, কিন্তু এখন সে তাহা স্বীকার করে না। বঙ্গ-সমাজের মধ্যে যে কিছু উন্নতি দেখিতে পাও, ইহার অধিকাংশ আমার দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে। আর একটা আমি সে কথা শুনিয়া বলিয়া উঠিল, কি! এমন কথা! ও কি জানে না কাহার অন্নে ও মানুষ? আমার পিতামহ মানগোবিন্দ মজুমদারের বাসায় উহার বাপ সরকার ছিল, মা ছিল রাঁধুনী ব্রাহ্মণী, সে কথা কি অকৃতজ্ঞ জীব এখন ভুলিয়া গিয়াছে? কোন আমি মহাশয়ের পদই নিরাপদ নহে। উভয় আমির বিবাদ দেখিয়া তৃতীয় আমি বলিলেন, ডারুইনের মতে তোমরা দুইজনই হনুমানের প্রপৌত্র, বনমানুষের পৌত্র এবং ধাঙ্গড়ের পুত্র, কেন আর তবে আমি আমি করিয়া মরিতেছ, আমিটে কে তাহা অগ্রে অন্বেষণ করিয়া দেখ।

তাঁহার কথায় প্রথম আমিটে আরো চটিয়া উঠিল এবং আত্মগৌরবে স্ফীত হইয়া সে আপনাকে আরও বড় মনে করিতে লাগিল। কিন্তু দ্বিতীয় আমি নীরব হইল, এবং চিন্তা করিতে লাগিল। যখন চিন্তায় প্রবৃত্ত হইল, তখন তৃতীয় আমির কথায় আর সে রাগ করিতে পারিল না। বরং বিমর্ষভাবে মানবজীবনের আদিতত্ত্ব অনুসন্ধানে আরও নিমগ্ন হইল। যতই চিন্তা করিতে লাগিল, ততই আমি মহাশয়ের বিবিধ অলঙ্কারে সজ্জিত স্থূল দেহ খানি ক্রমে যেন শুষ্ক হইতে লাগিল। রাজ্য ঐশ্বর্য্য, মান সম্ভ্রম ক্রমে কমিয়া আসিল। যে দেহের এবং যে বংশমর্য্যাদা ও জাতি কুলের অভিমানে এত দিন তাঁহার মস্তক বিঘূর্ণিত হইত, তাহার প্রাচীন ইতিহাস অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি দেখিলেন, তৃতীয় আমি যাহা বলিয়াছে তাহা নিতান্ত সত্য কথা। তখন তাঁহার মনে বৈরাগ্য এবং তৎসঙ্গে অনুতাপের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। পূর্ব্বপুরুষদিগের আচার ব্যবহার পাঠ করিয়া শেষ আপনার প্রতি তাঁহার মহা ঘৃণা জন্মিল, তখন ভাবিলেন, হায়! এই দেহের এত অহঙ্কার! যখন বংশ, দেহ, জাতি কুলের অভিমান এইরূপে চূর্ণ হইল, তখন তিনি চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। মহা অন্ধকার, অনন্ত অন্ধকার, অকূল অসীম আকাশের ঊর্দ্ধে অধোতে কেবলই অন্ধকার।

অনন্তর আমি মহাশয় সেই নিবিড় অন্ধকার সাগরে পথহারা হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল বিচরণের পর দেখিলেন, সেই অন্ধকার রাশির মধ্যে আমি ভূত হইয়া লুকাইয়া রহিয়াছে। বিচারালোকের সম্মুখে তিষ্ঠিতে না পারিয়া সে ক্ষণকালের জন্য আত্মগোপন করিয়াছে, কিন্তু মরে নাই। জ্ঞানালোকের অন্তরালে

যে কিঞ্চিৎ অন্ধকার সঞ্চিত ছিল, তাহার মধ্যে বসিয়া সে এক একবার দাঁত খিচাইতে লাগিল। তাহার হনুমানপ্রকৃতি তখনও যায় নাই, কেবল একটু দুর্ব্বল হইয়াছে মাত্র। আমি মহাশয় অন্ধকারে ভূত হইয়া কখন বিকট বদনে লম্ফ ঝম্প প্রদান করেন, কখন আবার আপনি আপনার মূর্ত্তি দেখিয়া ভীত হন। শেষ তিনি ভাবিয়া স্থির করিলেন, বানরবংশসম্ভূত দেহ ব্যতীত আর এক সূক্ষ্ম আমি বর্ত্তমান রহিয়াছে। যে আমিত্ব ভূত ঘাড়ে চাপিয়া দেহাভিমান জন্মাইয়াছিল, এখনও সে আত্মাভিমানে বিলক্ষণ হৃষ্ট পুষ্ট। এই সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি আত্মতত্ত্বানুসন্ধানের জন্য আরও একটী নিম্ন স্তরে অবরোহণ করিলেন।

এইরূপে নামিতে নামিতে যতই তিনি আপনি আপনার নিকট পৌঁছিতে লাগিলেন, ততই বুঝিতে পারিলেন, সমস্তই মায়ার খেলা। দেহাভিমান, আত্মাভিমান, কেবলই ফাঁকির ব্যাপার। তখন তিনি যেখানে যান, যেটা ধরেন, দেখেন যে সকলেই বলে ব্রহ্ম! ব্রহ্ম! আমির আর নাম গন্ধ সেখানে নাই, তাহার পর অনেক দূর নীচে নামিয়া দেখিলেন, অতি সামান্য একটু খানি রাজ্য, গোটা কতক সিপাহি তাহার চারিদিকে প্রহরী, বিশেষ জাঁক জমক কিছুই নাই। কিন্তু তাহারই ভিতর আবার আমি মহাশয় এক জন স্বাধীন এবং স্বাধীন রাজা। তিনি সেখানে স্বাধীন বলিলেও হয়, আবার একান্ত অধীন দাস বলিলেও হয়। বিশেষ অনুসন্ধানে জানা গেল, সে সিপাহি গুলিও তাঁহার নিজের নয়, যিনি সেখানে রেসিডেণ্ট থাকেন, তাঁহারই। রাজা বাহাদুর যদি একটু অন্যায় কায় বা মন্দ চিন্তা করেন, অমনি রেসিডেণ্ট তাঁহার কাণ মলিয়া দিতে আইসে। রাজার সমস্ত কার্য্যের সাক্ষী হইয়া সে বুকে চাপিয়া বসিয়া আছে, একটু দোষ পাইলে তৎক্ষণাৎ অমনি তাহা সম্রাটের নিকট বলিয়া পাঠাইবে। এই সমস্ত দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া, এবং স্বচক্ষে রাজার দুর্গতি দেখিয়া আমি মহাশয় কপালে হাত দিয়া বলিলেন, হা দশা! এই বুঝি তোমার স্বাধীন রাজত্ব! ইহারই আবার এত বড়াই! রেসিডেণ্টের নাম শ্রীবিবেকচন্দ্র রায় বাহাদুর। তাঁহার তাড়নার উৎপাতে রাজা সর্ব্বদাই অস্থির।

অবশেষে এই স্থির হইল, আমি যিনি, তিনি সমস্তই ফাঁকি; কেবল বৃথা গোল করিয়া পৃথিবীতে এত দিন বেড়াইয়াছেন। এক অঙ্গুলি স্থানও তাঁহার নাই, স্বাধীনতা কেবল তাঁহার নাম মাত্র। আত্মচিন্তাকে কমিসন্ নিযুক্ত করাতে এত দিনে তাঁহার সকল জুয়াচুরি প্রতারণা ধরা পড়িল। কাজেই তিনি লজ্জায় আর তখন মাথা তুলিতে পারেন না, অপমানে তৃণ হইয়া মাটিতে মিশাইয়া গেলেন। আমি মহাশয় নিজের নামে যে কিছু কার্য্য পৃথিবীতে এত দিন করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার নিমিত্ত বিষম দণ্ড প্রতীক্ষা করিতেছে। হিসাব নিষ্পত্তির পর অবশিষ্ট যাহা কিছু তাঁহার রহিল, তাহার লক্ষণ এই;—তিনি সর্ব্বগত এক অনন্ত জলদগ্নি রাশির কিঞ্চিৎ উত্তাপ, মহাসমুদ্রের এক বিন্দু বারি, বিশ্বব্যাপী এক প্রকাণ্ড পদার্থের ছায়া, বিস্তীর্ণ আকাশে অসীম বায়ু মণ্ডলস্থ নিত্যস্থায়ী এক মহানাদের ক্ষণস্থায়ী প্রতিধ্বনি ও অনন্ত কল্পতরুর শাখাগ্রভাগের

একটী ক্ষুদ্র পল্লবাঙ্কুর। ইহা ভিন্ন আর তিনি কিছুই নহেন। এই সমস্ত জানিয়া শুনিয়া, দেখিয়া বুঝিয়া পুনরায় যদি আমি মহাশয় পূর্ব্ববৎ গ্রীবা বক্র এবং শিরঃ সঞ্চালন করেন, তাহা হইলে তিনি নিতান্ত মূর্খ, নির্লজ্জ এবং ভূতগ্রস্ত জীব।

শ্রীচিরঞ্জীব শর্ম্মা।

সামাজিক ব্যাধি।

রোগের কারণ নির্ণয়।

বর্ত্তমান সময় ইংলণ্ড ও এদেশে আন্দোলন চলিতেছে। এই উভয় আন্দোলনের লক্ষ্য স্বতন্ত্র, কিন্তু প্রকৃতি এক। ইংরাজগণ আপনাদের বালিকাদের নীতি রক্ষার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন—বাঙ্গালী ভদ্রলোকগণ এতদ্দেশীয় বালকদিগের নীতি রক্ষার জন্য চিন্তা করিতেছেন। ইংরাজী সংবাদ পত্র পাঠ করা যাঁহাদের অভ্যাস আছে, তাঁহারা ইংলণ্ডের বর্ত্তমান আন্দোলন বিষয়ক অনেক কথাই জানিয়াছেন, সে সকলের পুনরুক্তি করা নিষ্প্রয়োজন; তথাপি অপরাপর পাঠকদিগের অবগতির জন্য তৎসংক্রান্ত স্থূল স্থূল জ্ঞাতব্য বিষয় গুলি নির্দ্দেশ করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। ব্যাপারটা এই;—ইংলণ্ডে অনেক দরিদ্রের কন্যা, কর্ম্ম কাজের আশায় মফস্বল হইতে লণ্ডন সহরে আসিয়া থাকে। এই সকল বালিকাদিগের মধ্যে কেহ বা দরজীর দোকানে, কেহ বা পোষাক-বিক্রেতার দোকানে, কেহ বা মণিহারীর দোকানে, কেহ বা কলে, কেহ বা লোকের বাড়ীতে দাসীরূপে কাজ করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকে। আজি কালি অনেক বালিকা টেলিগ্রাফ আপীষে, ও অন্যান্য আপীষে কর্ম্ম করিয়া থাকে। এই সকল বালিকাদের অধিকাংশের বয়ক্রম ১২। ১৩ হইতে ২৪।২৫ পর্য্যন্ত। ইহাদের অনেকের পিতামাতা সঙ্গে থাকে না। ইহারা অনেক সময় স্বীয় স্বীয় দোকানের অধ্যক্ষদিগের অধীন বাসা বাড়ীতে বাস করে, কোন কোন স্থলে এক এক জন বাড়ীওয়ালীর ভাড়াটিয়া ভবনে দশ বারটী মেয়ে একত্র হইয়া বাস করে। যাহাদের জনক জননীগণও সহরে আছে, তাহাদিগকেও দৈহিক শ্রম করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে হয়; তদ্ভিন্ন তাহাদের পিতামাতা সচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে না।

বিগত কয়েক বৎসর একটী বিশেষ কারণে এই শ্রমিক বালিকার সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, ইংলণ্ডে "ট্রেড ইউনিয়ন" নামে এক প্রকাণ্ড ধর্ম্মঘট আছে। শ্রমিকদিগের মাহিয়ানার হার বৃদ্ধি করা ঐ ধর্ম্মঘটের উদ্দেশ্য। ইতিপূর্ব্বে কল বা অন্যান্য কারখানার অধ্যক্ষগণ স্বীয় স্বীয় অধীনস্থ শ্রমিকদিগকে গুরুতর পরিশ্রম করাইতেন, অথচ উপযুক্ত রূপ বেতন দিতেন না। সেই জন্য শ্রমজীবীগণ "ট্রেড ইউনিয়ন" নামক সভা স্থাপন করিয়া, ধর্ম্মঘট পূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় বেতন বৃদ্ধি করিয়াছে। পুরুষ শ্রমিক-

দিগের অধিকাংশই এই ধর্ম্ম ঘটের অন্তর্গত, সুতরাং তাহাদিগকে যথেষ্ট বেতন দিয়া কর্ম্ম করান দুষ্কর। কারখানার অধ্যক্ষগণ দেখিয়াছেন যে, পুরুষদিগের দ্বারা যে কাজ হইত, সুস্থ ও সবল বালিকাদিগের দ্বারা সেই কাজ অল্প ব্যয়ে হইতে পারে; এই জন্য অনেক কারখানাতে পুরুষের পরিবর্ত্তে স্ত্রীলোক শ্রমিক লওয়া হইয়াছে। এইরূপে লণ্ডন সহরে শ্রমার্থিনী যুবতীর সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। ইংলণ্ড মফস্বলের গ্রাম ও জনপদ সমূহে এই বার্ত্তা প্রচার হইয়াছে যে, লণ্ডন সহরে গেলেই কর্ম্ম জুটিতে পারে। এই বার্ত্তা প্রচার হওয়াতে, দলে দলে অরক্ষিতা যুবতী স্ত্রীলোক, এমন কি অনেক সুকুমারমতি বালিকা, কোন এক জন বন্ধুকে অবলম্বনমাত্র করিয়া লণ্ডনে আসিতেছে। এতদ্দেশে যেমন বর্দ্ধমান্, হুগলী, নদীয়া, প্রভৃতি জেলার অনেক চাষা লোকের মেয়ে ঝি হইবার আশায় কলিকাতার দিকে ধাবিত হইয়া থাকে, সেখানেও সেইরূপ বহু সংখ্যক পাড়াগেঁয়ে মেয়ে লণ্ডন সহরে আসিয়া থাকে। এই যে সহস্র সহস্র দরিদ্রের কন্যা কর্ম্মের প্রত্যাশায় সহরে আসে, ইহাদের পথে এক ঘোর বিপদ আছে। ইহারা যখন কর্ম্মের প্রত্যাশায় নিরাশ অন্তরে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায়, তখন একদল পাপ পিশাচের অনুচর নরশত্রু ইহাদিগকে ধরে। এতদ্দেশে কুলি একেণ্ট ও আড়কাটিদিগের প্রতারণার কথা অনেকেই জানেন। কখনও বা শুনা গেল যে, একজন দরিদ্র কায়স্থের সন্তান কর্ম্মের আশায় কলিকাতায় আসিতেছিল, একটী দোকানে কিয়ৎকাল বিশ্রামের জন্য বসিয়া আছে, এমন সময়ে এক জন ভদ্র বেশধারী লোক আসিয়া অনেক মিষ্ট আলাপে তাহাকে আপ্যায়িত করিয়া বলিল;—"মহাশয়, আমি আপনাকে একটী উৎকৃষ্ট স্থানে কর্ম্ম জুটাইয়া দিতে পারি, কলিকাতা হইতে গাড়িতে কিছু দূরে যাইতে হইবে, সেখানে গিয়া সকল প্রকার সুবিধা পাইবেন। তবে অগ্রে আমি একজন সাহেবের নিকট লইয়া যাইব, সে আপনাকে ভয় দেখাইয়া ফিরাইবার চেষ্টা করিবে, তাহাতে আপনি ফিরিবেন না; আমি যেখানে হাঁ বলিতে বলিব, সেখানে হাঁ বলিবেন, যেখানে না বলিতে বলিব, সেখানে 'না' বলিবেন।" এইরূপে গড়িয়া পিটিয়া, বুঝাইয়া শিখাইয়া, সেই হতভাগ্যকে কুলি ইনস্পেক্টরের নিকট উপস্থিত করিল। ইনস্পেক্টর সাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, সে ব্যক্তি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যাইতেছে। বিশেষ সমুদায় ঠিক হইয়া গেল; হতভাগ্য ব্যক্তি জাহাজে বা গাড়িতে আরোহণ করিল, ক্রমে আসামের চা বাগানে গিয়া উপনীত হইল। তখন দেখে, সে চা বাগানে দাসত্ব করিবার জন্য কয়েক বৎসরের মত বিক্রীত হইয়াছে। যে নীচ কার্য্য জীবনে করে নাই, তাহা করিতে হইতেছে; যে নীচ সঙ্গে কখনও মেশে নাই, সেরূপ সঙ্গে মিশিতে হইতেছে। আড়কাটিদিগের এইরূপ প্রবঞ্চনার কথা শ্রবণ করিয়া আমরা সময়ে সময়ে মনে কত কষ্ট পাইয়াছি!

লণ্ডনে যে সকল বালিকা কর্ম্ম-প্রার্থিনী হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহাদের অনেকের ও এই দশা ঘটে। তাহাদের অধিকাংশই একে অশিক্ষিত ও অজ্ঞ, তাহাতে দারিদ্র্যের যাতনায় প্রাণ অস্থির। এই সুযোগ পাইয়া উক্ত নরপিশাচদিগের অনুচরগণ ইহাদি-

গৃহে আনিয়া ধরে। ইন্দ্রিয়াসক্ত ধনিদিগের ইন্দ্রিয় সেবার জন্য বালিকা ধরিয়া দেওয়া ইহাদের ব্যবসায়। এই ব্যবসায় দ্বারা ইহারা বিলক্ষণ দশটাকা উপার্জ্জন করে। চতুর শৃগাল যেমন মেষের খোঁয়াড়ের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়ায়, সেইরূপ এই বিকৃত-হৃদয়, দয়ামায়াহীন নরনারীগণ, লণ্ডনের রাস্তায় রাস্তায় বালিকা ও যুবতী ধরিবার জন্য ঘুরিয়া বেড়ায়। যদি কোন মেয়েকে হাবা হাবা বা বিষণ্ণ বা পোষাকপ্রিয় ও হাব-ভাব-শালিনী দেখিতে পায়, অমনি তাহাকে বধ্য বলিয়া স্থির করে ও অমৃত সুধা রসনাতে লইয়া তাহাদের নিকট উপস্থিত হয়; এবং বাৎসল্য ও স্নেহ দেখাইয়া তাহাদিগের মন মুগ্ধ করে। তৎপরে হয় তাহাদিগকে নানাপ্রকার প্রলোভন দেখাইয়া তাহাদের সতীত্ব রত্ন বিসর্জ্জন দিতে সম্মত করে, না হয়, প্রবঞ্চনা পূর্ব্বক একটা বাড়ীতে লইয়া গিয়া বিপদে ফেলিয়া ঐ কার্য্যে তাহাদিগকে প্রবৃত্ত করে। কখন কখনও ইহাদের অনেককে এই জঘন্য কার্য্যের জন্য ইয়ুরোপের অন্যান্য দেশে প্রেরণ করা যায়। ধনিদিগের হৃদয় কি নিদারুণ! এই সকল অসহায়া, সরলমতি ও নির্ব্বোধ বালিকার সর্ব্বনাশ করাতে ইহাঁদের বিশেষ আনন্দ! যাহার নীতি দূষিত হয় নাই, তাহাকে দূষিত করাতে বিশেষ আমোদ! যে সুকোমল বয়সে প্রত্যেক বালিকা কৃপা ও স্নেহের পাত্রী, উঁহাদের নিজের গৃহে যে বয়সের বালক বালিকাগণ তাঁহাদের দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া সুখে বাস করিতেছে, সেই সুকোমল বয়সে, তাঁহারা সরলমতি বালিকাদিগকে জন্মের মত কুলের বাহির করিয়া ও পাপে প্রবৃত্ত করিয়া আনন্দ লাভ করেন। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, এক লণ্ডন সহরে অন্তত ৫০০০ বালিকা আছে, যাহাদের বয়ঃক্রম ১৩ হইতে ১৬ বৎসরের মধ্যে, অথচ যাহারা ইতি মধ্যেই পাপ পথে পদার্পণ করিয়াছে। হা ধর্ম্ম! মানব সমাজে এত অত্যাচারও সহ্য হয়!

এই রূপ ব্যাপার বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। মধ্যে মধ্যে ইংলণ্ডের সহৃদয় ব্যক্তিগণ পার্লেমেণ্ট মহাসভায় এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, এবং সময়ে সময়ে এই জঘন্য আচরণ নিবারণের জন্য অনেক প্রস্তাব ও উপস্থিত করা হইয়াছে। সম্প্রতি পার্লেমেণ্ট সভায় এতদর্থ একটী নূতন আইন বিধিবদ্ধ হইবার কথা হয়। এই সুযোগে "পেল মেল গেজেট" নামক সংবাদ পত্রের সম্পাদক এতৎ সংক্রান্ত কতকগুলি ভয়ানক বীভৎস ব্যাপারের বিবরণ মুদ্রিত করেন। এই সকল বিবরণ পাঠ করিয়া ইংলণ্ডে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। লোকের মন কতদূর উত্তেজিত হইয়াছে, তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, বালিকাদিগের রক্ষার জন্য কিছু দিন হইল পার্লেমেণ্ট মহা সভায় একখানি আবেদন পত্র প্রেরিত হয়, তাহাতে এত লোকে স্বাক্ষর করিয়াছে যে, স্বাক্ষরের কাগজে কাগজ যুড়িতে যুড়িতে কয়েক মাইল লম্বা হইয়াছে; শত শত ব্যক্তি বাদ্যোদ্যম সহকারে ঐ আবেদন বহন করিয়া পার্লেমেণ্ট মহাসভায় উপস্থিত করে। (২য়) পেল মেল গেজেটের যে যে সংখ্যক পত্রে ঐ সকল বিষয় প্রকাশিত

হয়, তাহা কিনিবার জন্য এত লোকের ভিড় হইয়াছিল যে, মুদ্রাকরগণ লক্ষ লক্ষ কাগজ মুদ্রিত করিয়াও যোগাইতে পারে নাই। অবশেষে সমাগত লোকগণ অসহিষ্ণু হইয়া উক্ত পত্রের আপীষের জানালা দরজা ভাঙ্গিতে আরম্ভ করে। (৩য়) এই জঘন্য পাপাচার নিবারণের জন্য হাইড পার্ক নামক উদ্যানে অনাবৃত স্থানে এক মেলা হয়, তাহাতে প্রায় এক লক্ষের উপরে লোক সমবেত হইয়াছিল। তাহাদের সঙ্গে ৩৪ দল ব্যাণ্ড, ও ১৪০ টী নিশান ছিল, এমন উত্তেজনা কেহ কখনও দেখে নাই। ইংলণ্ডের নর নারী যেন ক্ষেপিয়া গিয়াছে। ঘরে ঘরে গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে,কেবল একই কথা! সকলেই বলিতেছে—'এরূপ পাপাচরণ ত্বরায় দমন কর। আমাদের কন্যাদিগকে ধনিদের অত্যাচার হইতে রক্ষা কর।' বজ্র নির্ঘোষে এই শব্দ উচ্চারিত হইতেছে। সুপ্তোথিত প্রকুপিত সিংহের ন্যায় সমুদায় ইংলণ্ড গাত্র বিধূনন করিয়া মর্ম্মর ধ্বনিতে গগন মেদিনী কাঁপাইতেছে। কি ভয়ানক আন্দোলন !! এই আন্দোলনের শুভফল ইতি মধ্যেই ফলিয়াছে। যে নূতন রাজবিধি পার্লেমেণ্ট মহাসভার বিচারাধীন ছিল, তাহাতে অনেক কঠিন নিয়ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। নিম্ন লিখিত কঠোর নিয়ম সকল বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

(১ম) ১৩ বৎসরের ও ন্যূন বয়স্কা বালিকাকে যদি কেহ তাহার সম্মতি বা অসম্মতিতে বিপথে প্রবৃত্ত করে, তাহাকে যাবজ্জীবনের জন্য নির্ব্বাসিত করা হইবে।

(২য়) ১৬ বৎসরের ন্যূন বয়স্কা বালিকাকে তাহার সম্মতি বা অসম্মতিতে ঐ রূপ করিলে, দুই বৎসর কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

৩। অল্প বয়স্ক বালকগণকে ১৬ বৎসরের ন্যূন বয়স্কা বালিকার প্রতি ঐরূপ অন্যায় ব্যবহার করিতে দেখিলে বেত্রাঘাত দণ্ড করা হইবে।

৪। কোন ভদ্র লোকের যদি এরূপ সন্দেহ হয় যে, কোন কুস্থানে কোন বালিকাকে লুকাইয়া রাখিয়াছে, তবে তিনি অনুসন্ধান বিষয়ে পুলিষের সাহায্য পাইবেন।

৫। যদি ২১ বৎসরের ন্যূন বয়স্কা বালিকাকে কেহ প্রলোভন দেখাইয়া বাড়ী হইতে বাহির করিয়া লইয়া যায়, তাহার দুই বৎসর কারাদণ্ড হইবে।

৬। যদি কোন স্ত্রীলোককে (বয়স যতই হউক না কেন) কোন কুস্থানে প্রবেশ করিতে বাধ্য করা হয়, কিম্বা বিপদে ফেলিয়া ধরিয়া রাখা হয়, প্রমাণ হইলে, দুই বৎসর কারাদণ্ড হইবে।

৭। বয়স যতই হউক না কেন, কোন স্ত্রীলোককে যদি প্রতারণা পূর্ব্বক বা ভয় প্রদর্শন দ্বারা কেহ তাহার সতীত্ব বিক্রয় করাইবার প্রয়াস পায়, তাহার দুই বৎসর কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাস ভোগ করিতে হইবে।

এই সকল নিয়মেও ইংলণ্ডের লোক সন্তুষ্ট হন নাই। এখনও আন্দোলন চলিতেছে। পার্লেমেণ্টের নূতন সভ্য নির্ব্বাচনের সময় সন্নিকট, অনেকে আশা করিতেছেন যে, আগামী পার্লেমেণ্টে আরও কঠিনতর নিয়ম সকল প্রবর্ত্তিত হইবে।

আমাদের দেশের আন্দোলনটী আর এক কারণে উপস্থিত হইয়াছে। কিছু দিন হইল, একটী অল্পবয়স্ক যুবক, যাহার বয়ক্রম

বিংশতি বর্ষের অধিক হইবে না—এক বারাঙ্গনাকে হত্যা করিয়া প্রাণদণ্ড ভোগ করিয়াছে। মকদ্দমাতে এরূপ প্রকাশ পাইয়াছে যে, ঐ বালিকাকে হত্যা করিবার পূর্ব্বে, বিগত তিন বৎসর ধরিয়া সে তাহার প্রতি আসক্ত ছিল, সুতরাং সে যখন ১৬ কি ১৭ বৎসরের বালক, তখন হইতে বিপথে পদার্পণ করিতে শিক্ষা করে। অথচ তাহার পিতা মাতা কলিকাতা বাসী এবং সে নিজে কলিকাতার একটী বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিল। যাহার পিতা মাতা সর্ব্বদা নিকটে এবং যে বিদ্যালয়ের ছাত্র, সেও যদি ১৬।১৭ বৎসরে পাপপথে পদার্পণ করিল, তবে যাহারা অভিভাবক-হীন হইয়া সহরে থাকে, তাহাদের দশা না জানি কি হইবে, এই ভাবিয়া দেশের লোকে চমকিয়া উঠিয়াছেন এবং যুবকদিগের নীতির উন্নতির জন্য সকলে চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহা ভালই, কিন্তু শারীরিক রোগের চিকিৎসার সময় যেমন বিজ্ঞ চিকিৎসক সর্ব্বাগ্রে রোগের কারণ নির্ণয় করিবার প্রয়াস পান, সেইরূপ কোন প্রকার সামাজিক ব্যাধি দূর করিতে হইলেও তাহার মূলীভূত কারণ কি, তাহা অনুসন্ধান করাও কর্ত্তব্য। এই আলোচনাতে প্রবৃত্ত হইলে আমরা দেখিতে পাইব, উভয় দেশেই এক বিধ কারণ বর্ত্তমান।

প্রথম কারণ সহরে বাস। বর্ত্তমান সভ্যতার একটী প্রধান লক্ষণ, বড় বড় সহরের সৃষ্টি। মানব দেহ সম্বন্ধে শুনিতে পাওয়া যায় যে, দেহের যে অঙ্গের চালনা অধিক হয়, অপরাপর অঙ্গ হইতে রক্ত স্রোত অধিক পরিমাণে সেই অঙ্গের দিকে ধাবিত হয়; জ্বর বিকারে মস্তিষ্কের অবস্থা যখন অত্যাক্রান্ত হয়, তখন মস্তিষ্কের চারি দিকে রক্ত সঞ্চার হইতে থাকে। বর্ত্তমান সহরগুলি ঠিক বিকারগ্রস্ত রোগীর উষ্ণ মস্তিষ্কের ন্যায়। সহরে বাণিজ্য, সহরে বিদ্যোপার্জ্জন, সহরে শ্রমিকের শ্রমের সুবিধা, সহরে কল কারখানার ভিড়, সুতরাং চতুর্দ্দিকের পল্লী গ্রাম হইতে জন-স্রোত নিরন্তর সহরের দিকেই বহিয়া থাকে। যাহারা শ্রম করে, তাহারা সহরে আসে; যাহাদের পয়সা আছে, যাহারা আমোদ চায়, তাহারাও সহরে আসে। যেখানে বহুলোকের সমাগম, সেখানে কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সুতরাং যে ব্যক্তি বৈধ উপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিতে পারে না, সে অবৈধ উপায়ে উপার্জ্জন করিবার চেষ্টা করে। এই কারণে, সহরে প্রতারক ও পাপাচারী লোকের সংখ্যা বাড়িতে থাকে। বণিক বাণিজ্য প্রত্যাশায় ও বিদ্যার্থী বিদ্যালাভ কামনায় যেমন সহরে আসে, অধর্ম্মের অনুচরগণও তেমনি আপনাদের কুক্রিয়ার দ্বারা ধন লাভ করিবার জন্য সহরে আগমন করে। এইরূপে ইংলণ্ডের শ্রমার্থিনী বালিকাগণ দারিদ্র্যের তাড়নায়, জনক জননীর দুঃখ বিমোচন বাসনায়, অনন্যগতি হইয়া লণ্ডনের অভিমুখে যাত্রা করে। সহরে পিতামাতা ও অন্য অভিভাবকগণ সঙ্গে থাকে না; তাহারা দলবদ্ধ হইয়া এক এক স্থলে বাস করিতে থাকে; সেখানে সকলেই হয়ত পর ও অধিকাংশ সমবয়স্ক। সমবয়স্কদিগের দ্বারা লোকের চরিত্রের শাসন হয় না; বরং আমোদ প্রবৃত্তিরই সহায়তা হইয়া থাকে। এই অবস্থায় যখন দুষ্ট লোকের হাতে পড়িয়া যায়, তখন তাহাদিগকে রক্ষা করিবার কেহ থাকে না।

অধিকাংশই সমবয়স্ক, গুরুজন কেহ থাকে না; সুতরাং সহরের সহস্র প্রকার প্রলোভনের মধ্যে তাহাদের অনেকের কি দশা ঘটিতে পারে, তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন।

আর একটী কারণ উভয় স্থলেই বিদ্যমান। ইংলণ্ডের দরিদ্র শ্রমজীবিগণ যেরূপ অবস্থাতে ও যেরূপ ঘরে বাস করে, তাহাতে তাহাদের মনের কোন ভাল ভাবই স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে না। মানব মন সুখে থাকিবার জন্ত স্বভাবত যে সকল পদার্থ চায়, বিশেষত যুবক যুবতীদিগের মনে যে সকল পদার্থের আকাঙ্ক্ষা প্রবল থাকে, তাহার অল্পই ঐ সকল দরিদ্র লোক পায়। গীত বাদ্য ও বন্ধুতার সুখ, প্রীতিভোজনের সুখ, সপরিবারে ভাল ভাল স্থান দর্শনের সুখ দূরে থাকুক, শীতের প্রকোপ নিবারণের জন্ত বৎসরে যদি পাঁচ সুট কাপড়ের প্রয়োজন হয়, তাহাও তাহারা পায় না। যে সকল ঘরে তাহারা থাকে, তাহারও অবস্থা অতি শোচনীয়। অনেক স্থলে ৫।৭টী বয়ঃ-প্রাপ্ত বালক বালিকার সহিত একজন শ্রমজীবিকে এক ঘরে থাকিতে হয়। সেই ঘরের মধ্যেই ভাঁড়ার, সেই ঘরেই শয্যা, সেই ঘরেই সমুদায়, একপ অবস্থাতে লোকের মন কিরূপে থাকে, তাহা সকলে সহজেই বুঝিতে পারেন। পরিশ্রমের পর আর কি কাহারও এরূপ বাড়ীতে পা দিতে ইচ্ছা করে? এই কারণেই ইংলণ্ডের অনেক শ্রমজীবী সন্ধ্যাকালে আর বাড়ীতে আসে না, কর্ম্মস্থান হইতে ফিরিবার সময় কোন শুঁড়ীর দোকানে প্রবেশ করে। সেখানে আলাপ করিবার দুই দশজন লোক পায়, একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বসিবার স্থান পায়, দুটা খবর শুনিতে পায়, এবং সুরার মাদকতা শক্তির দ্বারা নিজের সাংসারিক দুর্গতির চিন্তা নিবারণ করিতে পারে। শুঁড়ীর দোকানে আমোদ প্রমোদ করিয়া রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় টলিতে টলিতে বাড়ীতে আসে, কিম্বা ধরিয়া তুলিয়া আনিতে হয়। এদিকে পরিবারগণ অন্ন বস্ত্র বিহীন; গোরুর গোয়ালের ন্যায় এক অন্ধকার ও অপরিষ্কৃত ঘরে যুবক যুবতী দলবদ্ধ হইয়া পড়িয়া আছে। তাহাদের দশা কি, তাহা একবার চিন্তা কর। এইরূপ গৃহে যে বালিকারা বর্দ্ধিত হয়, তাহারা যদি একটু সুখের আশা পায়, সে প্রলোভন তাহাদের পক্ষে কত কঠিন, তাহাও সহজে বুঝিতে পারা যায়। যদি কেহ আসিয়া বলে, আমি তোমাকে ভালবাসিব, তোমাকে ভাল পোষাক কিনিয়া দিব, তোমাকে রঙ্গভূমির অভিনয় দেখাইব, তোমাকে বিবাহ করিব, তবে অজ্ঞ সরলমতি বালিকার পক্ষে প্রতারিত হওয়া কিছুই আশ্চর্য্য নহে। সুতরাং তাহারা হঠাৎ ভুলিয়া যায় ও ধনিদের ফাঁদে পড়ে।

আমি অগ্রেই বলিয়াছি, এদেশেও এই কারণ বর্ত্তমান। একদিন কোন কালেজের ছাত্রদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম— "তোমরা যে দুই মাসের ছুটী পাও, তাহাতে স্বীয় স্বীয় গ্রামে গিয়া কি রূপে দিন যাপন কর?" তাহারা উত্তর করিল—"ছুটীর প্রথম প্রথম কয়েকদিন ভাল লাগে, তৎপরে প্রাণ অস্থির হইতে থাকে, কবে কালেজ খুলিবে, সেই দিনের প্রতীক্ষা করিতে থাকি।"— কি ভয়ানক কথা! সম্বৎসরের পর যুবকগণ দুই মাসের জন্ত ছুটী পায়, সম্বৎসরের মধ্যে একবার মাতা ভাই ভগিনী, খুড়া জেঠা,

প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনকে দেখিতে পায়, এরূপ স্থলে তাঁহাদের সহবাসে গিয়া এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করাই মানবের পক্ষে স্বাভাবিক। সে আনন্দ যে সরায় বিরক্তিতে পরিণত হয়,ইহা কি স্বাভাবিক ? যাহা শুনিয়াছি, তাহা যদি সত্য হয়, —এবং আপনাপন জীবনেও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়—তবে এতদ্দ্বারা ইহাই প্রমাণ হইতেছে যে,আমাদের পরিবার সকল এরূপ নয় যেখানে থাকিয়া একজন শিক্ষিত যুবকের প্রাণ পরিতৃপ্ত হইতে পারে। অর্থাৎ মানব চিত্ত সম্পূর্ণ সুখে বাস করিবার জন্য যে যে পদার্থ চায়, আমাদের যুবকগণ গৃহের মধ্যে তাহা পায় না। সে পদার্থ কি ? যুবকেরা জনক জননীর সঙ্গ অপেক্ষা কালেজের সহাধ্যায়ীদিগের সঙ্গ অধিক ভাল বাসিতেছে কেন ? ইহার উত্তর ;— কালেজের সহাধ্যায়ীদের নিকট অবাধে মন খুলিতে পারে, কত বিষয়ে কথোপকথন, তর্ক বিতর্ক এবং ভাব ও চিন্তা বিনিময় করিতে পারে। ইহা মানব জীবনের একটী প্রধান সুখ। এসুখটী আমাদের ঘরে নাই। আমাদের সামাজিক রীতি নীতি যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে পিতার নিকট পুত্র মন খুলিতে পারে না, তাঁহার সমক্ষে আমোদ প্রমোদ করিতে পারে না, গাইতে বাজাইতে, হাসিতে খেলিতে পারে না, ভয়ে ভয়ে বাস করিতে হয়। যেখানে ভয় ও সঙ্কোচ, সেখানে অসুখ। সুতরাং আমাদের যুবকের ঘরে সুখ নাই। বাড়ীতে চিন্তা ও ভাব বিনিময়ের সম্ভাবনা নাই। বাড়ীর স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে বধূদিগের সহিত যুবকের আলাপও হয় না ; মাতা ও ভগিনী প্রভৃতি আলাপ্য রমণীদিগের সকলেই অশিক্ষিতা, এমন কি বিষয়ে কথা হইবে, যাহাতে তাঁহাদের শিক্ষা-প্রাপ্ত যুবক মনের সহিত যোগ দিতে পারে ? আমার দৃঢ় বিশ্বাস, পারিবারিক সুখের অভাব, আমাদের দেশের অনেক পুরুষের দুর্নীতির প্রধান কারণ। বাপের বাড়ীতে আমোদ পাইলে, যে রঙ্গভূমিতে ভদ্রলোকের সন্তানেরা প্রকাশ্য ভাবে বারাঙ্গনাদিগের সহিত মিশিয়া আমোদ প্রমোদ করে, সে রঙ্গভূমির ত্রিসীমার মধ্যে কোন ভদ্রলোকের সন্তানকে দেখিতে পাওয়া যাইত না,—সেই রঙ্গ ভূমিকে এত লোকে প্রশ্রয় দিত না। অতএব উভয় স্থলেই পারিবারিক সুখের অভাব, দুর্নীতির একটী কারণ।

তৃতীয় কারণ, বাল্যকালে ধর্ম্ম-শিক্ষার অভাব। অনেকের ধারণা আছে যে,ইংলণ্ডে খ্রীষ্টধর্ম্মের বহুল প্রচার, সেখানকার লোক সুসভ্য ও উন্নত, সুতরাং সেখানে আপামর সাধারণ সকলেই ধর্ম্ম-শিক্ষা পাইয়া থাকে। তাহা নহে। সেখানে সভ্যতার পার্শ্বে বিষম বর্ব্বরতা,—জ্ঞানালোকের পার্শ্বে ঘন নিবিড় অন্ধকার। সেখানকার নিম্ন শ্রেণীর বালক বালিকারা সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্মোপদেশে বঞ্চিত। নিম্নশ্রেণীর অজ্ঞতা কতদূর, তাহার একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন। একবার ইংলণ্ডের এক বিচারালয়ে একটী চমৎকার মকর্দ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল। একটী স্ত্রীলোকের নামে বহুবিবাহের অপরাধে নালিশ হয়। ব্যাপারটা এই ;—একজন মাতাল এক বোতল মদের জন্য আপনার স্ত্রীকে অপর একজনকে দেয়। সে স্ত্রীলোকও আপনাকে দ্বিতীয় ব্যক্তির স্ত্রী জানিয়া তাহার

সহিত বিবাহিত হয়। মাজিষ্ট্রেট যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কার স্ত্রী, তখন সে বলিল;—"আমি আগে ছিলাম প্রথমোক্ত ব্যক্তির স্ত্রী, এখন এই দ্বিতীয় ব্যক্তির স্ত্রী। মাজিষ্ট্রেট জিজ্ঞাসা করিলেন;—"প্রথম ব্যক্তির সহিত তোমার বিবাহ ভঙ্গ হইল কিরূপে?"স্ত্রীলোকটী বলিল—"কেন, সেত আমাকে এক বোতল বিয়ার লইয়া বিক্রয় করিয়াছে। সে রমণী সরল ভাবেই ভাবিয়াছিল যে, এক বোতল সুরার জন্য সে বিক্রীত হইয়াছে এবং তাহার দাম্পত্য সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সেখানকার সামান্য লোকদিগের মধ্যে এতদূর অজ্ঞতা। ইহাদের বালক বালিকা কিরূপ ধর্ম্ম শিক্ষা পাইতে পারে, তাহা সকলেই অনুভব করিতে পারিবেন। এইজন্য কেহ সুখের প্রলোভন দেখাইলেই তাহারা সরল ভাবে বিশ্বাস করিয়া মৃত্যুর মুখে গিয়া প্রবিষ্ট হয়।

আমাদের দেশেও দুর্ভাগ্য বশতঃ বর্ত্তমান সময়ে এই কারণ বিদ্যমান। গৃহের বালক বালিকাকে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা দেওয়া এক প্রকার রহিত হইতেছে বলিলে হয়। প্রাচীন হিন্দুদিগের প্রথা ছিল যে, তাঁহারা গৃহের শিশুদিগকে শৈশব হইতেই ধর্ম্মোপদেশ দিতেন; চাণক্য শ্লোক মুখস্থ করাইতেন, পৌরাণিক কাহিনী সকল বলিতেন। ব্রাহ্মণের সন্তানদিগকে অষ্টম বর্ষে উপনয়ন দিয়াই রীতিমত ধর্ম্মের নিয়ম সকল রক্ষা করিতে হইত। পূর্ব্বে একটী প্রকৃত হিন্দু গৃহের কোন বালকের বয়ঃক্রম যখন ৭। ৮ বৎসর, তখন হয়ত কৃত্তিবাসের রামায়ণের অধিকাংশই তাহার কণ্ঠস্থ থাকিত। মাতা ঠাকুরাণী মুখে মুখে কত পুরাণের কথা শুনাইতেন, রামায়ণ মুখস্থ বলিতেন ও তাহাকে হয়ত মুখস্থ করিতে আদেশ করিতেন। এইরূপে তাহার চরিত্র ও নীতি সর্ব্ব প্রথমে রামায়ণের দ্বারা গঠিত হইত। পিতামহ প্রপিতামহ প্রভৃতি গৃহের বৃদ্ধগণ নিষ্কর্ম্মা হইয়া গৃহে বসিয়া বালকগণকে অতি শৈশবকাল হইতে, এমন কি হাঁটিতে শিখিলেই, কোলে করিয়া মুখে মুখে চাণক্য শ্লোক ও কত স্তব কবচ শিখাইতেন। আমি স্বচক্ষে এমন গৃহ অনেক দেখিয়াছি। এখন দেখিতেছি, বর্ত্তমানের শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের পরিবার হইতে এই সকল সুব্যবস্থা তিরোহিত হইতেছে। লোকে ভাবিতেছেন, কোন ধর্ম্মেই যখন বিশ্বাস নাই, তখন আর ধর্ম্ম শিক্ষা দিব কি? এখন বালক বালিকগণ বিদ্যালয়ে গতায়াত করে, এইমাত্র। তাহাদের ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার জন্য যে পিতা মাতা দায়ী, তাহা আমরা ভুলিয়া যাইতেছি। "ধর্ম্ম বিষয়ে কিরূপ চিন্তা কর" এই কথা জিজ্ঞাসা করাতে এক দিন একটী সচ্চরিত্র সত্যবাদী যুবক এই বলিয়া উত্তর দিল—"ধর্ম্মবিষয়ে কখনও কিছু ভাবি নাই, বাড়ীতে পূজা আদি হইতে দেখিয়াছি বটে, কিন্তু বাবা ও অন্যান্য অভিভাবকগন তাহাতে বিশ্বাস করেন না; সুতরাং তাহাতে আমারও কখনও বিশ্বাস হয় নাই।" এইটী সত্য কথা, আমাদের দেশের এইরূপ হাজার হাজার যুবক ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ হইয়াই বর্দ্ধিত হইতেছে। ইহার ফল যাহা ঘটিতে পারে, তাহাই ঘটিতেছে। এখন আর শোক করিলে কি হইবে? (১) আমাদের যুবকদিগের নীতির উন্নতির উপায় কি (২) পারি-

শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী।

বাসনার উচ্ছ্বাস।

না কেন, সে শিশুর হাসির মর্ম্ম, বাল
হাসি দেখিয়া

মানুষ কি ভাবি-

। তাহার

না, সে বিভিন্ন ছবিতে দেখিতে চা

। মানুষ

মানুষের প্রকৃ

চিন্তিয়া কিছুই ঠিক পাই না;—এ গভীর রহস্যের গভীর মর্ম্ম ভেদ করিতে পারি না।

মানুষ, প্রকৃত প্রস্তাবে যেন মানুষের জন্য নয়;—তুমিও যেন আমার জন্য নও, আমিও তোমার জন্য নই। আর একটা কি যেন উদ্দেশ্য আছে। অথচ তোমার কাছে আমি থাকিতে সুখ পাই, তুমি আমার ধারে বসিতে ভালবাস। কি এক ছবি, কি এক অমৃত-খনি প্রত্যেকের ভিতরে রহিয়াছে, যাহাতে প্রত্যেককে প্রত্যেকের অনুরক্ত করিবেই করিবে। কত পার্থক্য, কত বিভিন্নতা, কত আকাশ-পাতাল প্রভেদ, তবুও স্ত্রীর সৌন্দর্য্যের জন্য স্বামীর হৃদয় ব্যাকুল,—মাতার হাসির জন্য শিশুর মন ব্যাকুল,—শিশুর অস্ফুট হাসির জন্য মাতা লালায়িত। তোমাকে ত প্রকৃত প্রস্তাবে চিনিতে পারিতেছি না—তুমি যখন কোল পাতিয়া আমাকে আলিঙ্গন করিতে চাহিতেছ, তখন তোমাকে স্বার্থের দাস বলিয়া ভ্রম করিতেছি; কিন্তু বল ত ভাই, তবুও তোমার জন্য আমি লালায়িত কেন? তুমিও আমার ভাল ভাব হইতে কত দুরভিসন্ধির অঙ্কুর বাহির করিয়া কত নিন্দা রটনা করিয়াছ, কিন্তু তবুও তুমি আমার সহবাসের জন্য কেন অস্থির? মানুষ যে মানুষের জন্য অস্থির, তাহাতে আর কোনই ভ্রম নাই। তাহা না হইলে পৃথিবী শূন্য পড়িয়া থাকিত,—গৃহ শূন্য, গ্রাম শূন্য,—দেশ শূন্য—নগর শূন্য! মানুষ, মানুষের জন্য লালায়িত না হইলে, কখনই এত কষ্ট যন্ত্রণা সহিয়া, এত বিপদ ভার বহিয়া সংসার পাতিত না। এই অস্থিরতা কেন?—এই ব্যাকুলতা কেন?—কে উত্তর করিবে, কেন?

মানুষের কি লক্ষ্য আছে, কি উদ্দেশ্য আছে, মানুষ তাহা বুঝে না। আমার বোধ হয়, এই যে বৈষম্য, ইহারই মধ্যে সমতা আছে। জ্ঞানালোক সকলকে পৃথক পৃথক বুঝায়; প্রেমান্ধকার সকলকে এক করিয়া মজাইতে চায়। প্রেম, সকলকে এমন করিতে চায়, যেন গাঢ় আঁধারে সকল ঢাকা। আঁধার কি? না—ঘনীভূত ছায়া। প্রেম, সকলকে এক ঘনীভূত ছায়াতে পরিণত করিতে চায়। প্রেমের জন্য সকলেই লালায়িত, সুতরাং বিভিন্ন হইয়াও লোক একত্র, সমত্ব চায়। কিন্তু ছায়ার ভিতরে যে কায়া আছে, একথা জগৎ বুঝে না। আঁধারের ভিতরও জ্যোতি আছে। জ্ঞানে যদি একটু জ্যোতি থাকে, প্রেম-আঁধারে তবে আরো জ্যোতি আছে; কিন্তু ইহা বিজ্ঞান স্বীকার করে না। জ্ঞানে বিভিন্নতা; প্রেমে, একতা—একাকার। একাকারই ছায়া বা আঁধার। পথ-ক্লিষ্ট, রৌদ্র-দগ্ধ পথিক ক্ষুধাকাতর হইয়া যখন শীতল বট-ছায়ায় আশ্রয় লয়,—শূন্যে দেহকে রাখে, তখন কি শান্তি, কি স্নিগ্ধতা, সেই শূন্য, সেই কিছুই নয়, সেই ছায়া প্রদান করে, কে জানে? ঘোর দিগন্ত-ব্যাপিনী, বৈষম্য-নাশিনী, কুল-প্লাবনী আঁধার আসিয়া ঘেরিয়া যখন পৃথিবীতে রাজত্ব বিস্তার করে, তখন অনন্ত-পূজক মানব তাহারই ভিতরে যে কি এক অপূর্ব্ব জ্যোতি দেখে, কে তাহা ব্যাখ্যা করিতে পারে? পৃথিবীর ঘোর বৈষম্যময় নরনারীর মধ্যে বাস করিয়াও মানুষ যে কি সুখশান্তি পায়, কে বুঝে? বিজ্ঞান দর্শনের কথা তবে দূর হউক। এই পৃথিবী, শীতল বট ছায়া। ছায়াকে যে কেবল শূন্য বলে, সে মূর্খ। তুমি ছায়া আমি ছায়া—সকলই ছায়াময়। তোমার ছায়াতে আমার উত্তাপ ঘুচে, আমার ছায়ায় তোমার অশান্তি দূর হয়। তুমি কে, আমি কে?—ছায়াবই

কে মায়া বাড়াইতে পারে ? তোমার তুমিত্ব আমি ব্যাখ্যা করিতে পারি না, আমার আমিত্বও তুমি বুঝ না—কিন্তু তবুও আমরা আছি। যাহা আছে, তাহারই উদ্দেশ্য আছে, তাহাই শূন্য বা কিছুই-নয় নহে। কি আছে, কে আছে, গভীর ভাবে ভাবিয়া দেখ, বুঝিতে পারিবে যে, ছায়ার ভিতরে এক অবিনশ্বর কায়া আছে ;—তাই ছায়াতে মায়া আছে। কেবলই ছায়া ভিন্ন আর কিছুই কি গণনা করিতে পার ? তাহা তোমার অসাধ্য। তুমি তোমার ভাব বই আর কিছুই গণিতে পার না। যাহা দেখিতেছ, উহা যে তোমার দেখারই অনুরূপ, তাহা ঠিক বলিতে পার না ; যাহা শুনিতেছ, তাহা যে তোমার শুনারই মত, তাহাও নিশ্চয় জান না। তুমি যাহা যেরূপ দেখিতেছ, আমিও যে তাহা ঠিক সেইরূপই দেখিতেছি, তাহা তুমি নিশ্চয় বলিতে পার না। তোমার সুন্দর আমার নিকট যে কুৎসিত নয় এবং আমার ভাল যে তোমার নিকট মন্দ নয়, তাহা তুমিও জান না, আমিও জানি না। ভাল মন্দ সকলই মনের একটা অবস্থা ;—পাপ পুণ্য মনের অবস্থা বই আর কিছুই নহে। তবেই দেখ,—সকলই ছায়ার ন্যায়, অবস্থাভেদে, পাত্রভেদে, সময় ভেদে, বায়ু ভেদে, ছায়াই ভিন্ন ভিন্ন কায়া ধরিতেছে,—তোমার ও আমার নিকটে। অথবা ছায়ার ভিতর হইতেই কায়া ফুটিয়া পড়িতেছে। গগনভেদী বটবৃক্ষ না থাকিলে শীতল ছায়া কখনই পৃথিবীর অশান্তি হরণ করিতে পারিত না। সকল ছায়ার পশ্চাতেই কায়া লুক্কায়িত। সেই কায়ার মায়াতেই আমরা ঘুরিতেছি, উঠিতেছি, বসিতেছি। সেই কায়ার মায়াতেই আমরা সংসার সাধন করিতেছি। কায়া ভিন্ন ছায়া নাই—তুমি নাই—আমি নাই ; আমাদের অস্তিত্ব অসম্ভব। কিন্তু কায়া কি ? কে জানে কি ?—ক্ষুদ্র মানুষ কেমনে জানিবে, কায়া কি ? কিন্তু একজন যে আছেন, তাতে সন্দেহ নাই। একজনের, এক কায়ারই ছায়া—এই পৃথিবীর অসংখ্য জীব জন্তু, পশু পক্ষী, ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধরিয়া সমস্ত খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। তবে কিসের অহঙ্কার ? মানুষ যদি কেবলই কায়ার ছায়া, তবে মানুষের অহঙ্কার কিসের ? অহঙ্কার—একমাত্র কায়ার। কায়াকে ভুলিলে যে অহঙ্কার থাকে, তাহা কিছুই নহে,—তাহা নরক,—তাহা অসার। আর রাজাধিরাজ মহারাজ বিশ্বপতির ছায়া তুমি, ইহা ভাবিয়া যদি আত্মাভিমানী হইয়া থাক, হও, আপত্তি নাই। কিন্তু ভাবিয়া দেখিও, তুমি যাঁহার ছায়া, আমিও তাঁহারই ছায়া ;—যে কিছু ভেদাভেদ দেখিতেছ, উহা অবস্থা ও সময়ের ঘোর ফের মাত্র ;—তোমার আমার চখের বা ভাবের দোষ মাত্র। তুমিও যাঁহার ছায়া, আমিও তাঁহারই ছায়া। কিন্তু ছায়াই কায়া নহে, মনে রাখা উচিত। বড় বড় পণ্ডিতেরা এই স্থানে বড়ই ভুল বুঝিয়া গিয়াছেন ;—ছায়াকেই তাঁহারা কায়ার ন্যায় মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা মহাভুল। কায়া ও ছায়া পৃথক। সকল ছায়াই একরূপ,—বটের ছায়া ও হিজলের ছায়াতে বিভিন্নতা নাই ;—সবই অনন্তের প্রতিবিম্ব। ভেদাভেদ, অশান্তি, অপ্রেম, কুজ্ঞান, কুতর্ক, এ সকল গভীর চিন্তাশীলের নিকট কি আর স্থান পায় ?—সেখানে সব একাকার হইয়া যায়।

আমার বড় ইচ্ছা, আমি যে ছায়া, ইহা আমি প্রকৃত পক্ষে বুঝিতে পারি। ছায়াকে যেরূপ লোকে শূন্য বলিয়া মনে করে, আমার বড় ইচ্ছা, আমিও সেই রূপ শূন্য

হইয়া, আমিত্ব ভুলিয়া, পড়িয়া থাকি। তাঁহাতে ডুবিয়া আমার সকলই শূন্য হইয়া যাইবে;—অনন্ত বিশ্ব ছায়াতে বিন্দু-ছায়া মিলাইয়া যাইবে। বাসনা এই, আমার গৃহে যেন সাড়া শব্দ নাই,—শরীরে স্পন্দন নাই,—হৃদয়ে সুখবিলাস নাই,—শোক দুঃখ নাই, ইচ্ছা কামনা নাই, তাঁহাতে আমিত্ব ডুবাইয়া পড়িয়া থাকি। ইচ্ছা এই, সকলের প্রাণে ডুবিয়া—পাতায় পাতায় মজিয়া এমন হইয়া যাই যে,কেহ ডাকিয়াও যেন আমরক্তিময় পৃথকত্ব না পায়। আমি সকলের হইয়া যাইব—আমার নিজের কিছুই থাকিবে না। আমার অস্তিত্বে তাঁহারই অস্তিত্ব প্রচারিত হইবে, আমার তিরোধানে তাঁহারই মহিমা কীর্ত্তিত হইবে। আত্ম-মনকে উড়াইয়া শীতল ছায়া হইয়া বসিয়া থাকি, এই ইচ্ছা। ছায়ার কাজ, পৃথিবীর তাপ-দগ্ধ নরনারীকে কেবল শীতল করা। আমার ইচ্ছা, আমার কাজও তাহাই হউক। আমি করি, আমি ভাবি, আমি উঠি, আমি বসি, এই প্রকার না ভাবিয়া, ভাবিব,—তিনি করান, তিনি ভাবান,তিনি উঠান, তিনি বসান। ভাবিব, তিনি কায়া, আমি ছায়া। ছায়াতে কায়ার জলন্ত ভাব দেখিব; কিন্তু ছায়াকেই কায়া বলিব না। কায়া আছে বলিয়াই আমি-ছায়া আছি, ইহা ভাবিব। কিন্তু ছায়া না থাকিলে কায়া থাকেন না, ইহা কথনই ভাবিব না। এমনই হইয়া যাইতে ইচ্ছা, —কেহ আমার রূপ দেখিবে না, আমরক্তিময় অস্তিত্ব দেখিবে না—আমার শীতল ছায়ার বসিয়া সকলেরই অশান্তি, নিরানন্দ ঘুচিবে—সকলেরই মনে বিশ্বাসের কথা জাগিবে। এ ভবন আনন্দের ভবন হইবে, এ আশ্রম আনন্দময়ের আশ্রম হইবে। আমার জিনিষে সকলেরই সমান অধিকার হইবে। মানব-জন্ম পাইয়া যদি দেবদুর্লভ পরম ধনের জন্য সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিতে না পারিব, তবে কি হইবে? এই অসার জীবন বিনিময়ে যদি সারাৎসারকে গৃহে প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারি, তবে আর কি হইল! তাঁহার জন্য আত্ম-বোধকে যদি ডুবাইতে না পারি,তবে আমার জীবন বৃথা! এ কঠোর সাধনায় দীনবন্ধু সহায় হউন।

নভেল কত প্রকার।

পূর্ব্বে, চরিত্রচিত্রই যে নভেলের মূলসূত্র ছিল,—তাহা বলিয়াছি। এই চরিত্রচিত্র যে সাধারণত তিন শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে—তাহাও বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। শিল্পকৌশল বা কবিত্ব—নভেলের প্রাণ স্বরূপ। এই শিল্পকৌশলের উৎকর্ষাপকর্ষের উপরই নভেলের প্রকৃত উৎকর্ষাপকর্ষ নির্ভর করে, তাহাও উল্লেখ করা গিয়াছে। এক্ষণ নভেল সম্বন্ধে অন্যান্য কথা বলিব।

প্রথমে, নভেলের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিব। সচরাচর নভেলে যে বিষয়ে প্রাধান্য থাকে—তাহা হইতেই নভেলের শ্রেণীবিভাগ হইয়া থাকে। ইহা-ব্যতীত অনেকে ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে বা নভেলের ভিন্ন ভিন্ন মূল অবলম্বন করিয়া নভেলের শ্রেণীবিভাগ করিয়া থাকেন। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি,নভেলে চরিত্র ও বাহ্যজগৎ, এই দুইটীর ঘাত প্রতিঘাতেই নভেলের চরিত্র চিত্রিত হয়। সুতরাং নভেলে চরিত্র

ও বাহ্যজগৎ—দুইটী থাকা আবশ্যক। আবার এই বাহ্যজগৎকে আমরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি। এক ভৌতিক জগৎ, আর এক সমাজ। সুতরাং সকল নভেলেই আমরা এই তিনটী দেখিতে পাইব, ভৌতিক জগৎ, মনুষ্য চরিত্র, আর সমাজচিত্র। এই তিনের সমবায়েই নভেল লিখিত হয়। তবে ইহাদের মধ্যে কখন ভৌতিক জগৎ ও তাহার চিত্রের প্রাধান্য, কখন বা সমাজের প্রাধান্য, আর কখন বা চরিত্রের প্রাধান্য অঙ্কিত থাকে। বলিয়াছি ত, কবি-শিল্পী কখন চরিত্রকে ও সমাজকে বাহ্যজগত মধ্যে ডুবাইয়া রাখেন;—যেন আমরা তাহাদের স্বতন্ত্র সত্বা খুঁজিয়া পাই না,—কি একটা প্রকাণ্ড নিয়ম—একটা অনন্ত সত্য মধ্যে তাহাদিগকে ডুবাইয়া দেন। কেহ কেহ আবার সমাজকেই শ্রেষ্ঠ করেন; সমাজের জন্যই চরিত্র গড়েন—সমাজের জন্যই জগৎ চিত্র করেন, সমাজের মধ্যে চরিত্র ও জগৎ, উভয়কেই ডুবাইয়া রাখিতে যান। আর যাঁহারা উৎকৃষ্ট কবি-শিল্পী, তাঁহারা চরিত্রকেই সর্ব্বময় করেন, এই চরিত্রের গতি, শক্তি ও কার্য্য-প্রণালী দেখাইবার জন্যই সমাজ ও জগৎ চিত্র করেন। এইরূপে শ্রেণী বিভাগ করিলে নভেলকে তিন শ্রেণীভুক্ত করিতে পারা যায় (১) স্বভাব-বর্ণনা-প্রধান নভেল (২) চরিত্র-প্রধান নভেল, (৩) সমাজ-প্রধান নভেল। স্বভাব-বর্ণনা-প্রধান নভেলের সংখ্যা বড় অল্প। সত্য বটে, বাহ্য-জগৎ কবির অনন্তভাণ্ডার,—শান্ত, ঘোর, প্রসন্ন, গভীর, সুন্দর,—এমন কোন ভাব নাই যাহা বাহ্যজগতে প্রকটিত হয় না। অনন্ত আকাশ হইতে ক্ষুদ্রতর বালুকণা পর্য্যন্ত—সকলেই এক এক অনন্ত রাজ্য নিহিত রহিয়াছে,—যে কবি, সেই তাহা দেখিতে পায়। আর এক কথা, জ্ঞান ও বিজ্ঞানবলে স্বভাবের নিয়ম আমরা অনেকটা আয়ত্ত করিতে পারিয়াছি—স্বভাবের অসংখ্য ভাব আমরা ইচ্ছা করিলেই উপলব্ধি করিতে পারি—এই জন্য স্বভাব বর্ণনা কবিদিগের অনেকটা আয়ত্তাধীন। এই স্বভাব বর্ণনার কথা পরে বলিব। কিন্তু তথাপি এশ্রেণীর নভেলের সংখ্যা বড় অল্প। বাঙ্গালায় বোধ হয় মাধবীলতা ব্যতীত আর এ শ্রেণীর নভেল অধিক নাই।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, চরিত্র চিত্রই নভেলের প্রধান অঙ্গ, ইহাই নভেলের মজ্জাস্বরূপ। সুতরাং চরিত্র-প্রধান নভেলই যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তাহা সহজেই বুঝা যাইবে। আমরা পূর্ব্বে চরিত্র চিত্রের কথা উল্লেখ করিয়াছি। দেখাইয়াছি যে, চরিত্র চিত্র সাধারণত চারি প্রকার। আরও বলা হইয়াছে যে, চরিত্রকে তিনভাগে বিভক্ত করা যায়—কতকগুলি চরিত্র বুদ্ধি প্রধান, হৃদয়বৃত্তি বা ইচ্ছা ও কার্য্যশক্তি ইহাদের অপেক্ষাকৃত অল্প মাত্রায় পরিস্ফুট হয়। সেইরূপ কতকগুলি চরিত্র আবার হৃদয়-বৃত্তি-প্রধান, ইহাদের বুদ্ধিবৃত্তি হৃদয়বৃত্তির আধিক্যে অভিভূত থাকে। আর কতকগুলি চরিত্র ইচ্ছা বা ক্রিয়া শক্তি প্রধান—ইহাদের বুদ্ধি ও হৃদয়বৃত্তি ভালরূপ পরিস্ফুট হয় না। সত্য বটে, মনোবিজ্ঞানানুসারে বুদ্ধি হইতেই হৃদয়বৃত্তি উত্তেজিত হয়, আর হৃদয় বৃত্তি উত্তেজিত হইলে তবে কার্য্য করিতে ইচ্ছা জন্মে ও কার্য্যশক্তি আবির্ভূত হয়। তথাপি আমাদের অন্তঃকরণের এই তিন ভাগের মধ্যে একের আধিক্য ও অপ-

রের হ্রাস হয়, তাহা সকলেই জানেন। সুতরাং মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে এ স্থলে সে কথা উল্লেখ করিবার আবশ্যক নাই। হ্যামলেটের বুদ্ধিবৃত্তির অধিক স্ফূর্ত্তি থাকিলেও তাহার কার্য্যকারিণী শক্তির কত অভাব ছিল, তাহা অনেকেই জানেন। ফষ্টেরও প্রায় এই দশা ছিল। বাস্তবিক চিন্তা-জগতে থাকিলে কার্য্যক্ষেত্রে সুচারুরূপে বিচরণ করা যায় না, আবার কর্ম্ম মধ্যে বিশেষ রূপ লিপ্ত হইলে, চিন্তার অধিক স্ফূর্ত্তি হয় না। আর যাহার হৃদয় বৃত্তি উত্তেজিত, মন অভিভূত, বিষয় বিশেষে স্পৃহাবতী, তাহার চিন্তা করিবারও সময় থাকে না—আবার কার্য্য করিবারও অবসর মিলে না। সেই জন্য এই তিনের সামঞ্জস্য রাখিয়া মনের স্ফূর্ত্তি কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায় মাত্র।

এস্থলে বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে, যে সকল চরিত্র হৃদয় বৃত্তি প্রধান, তাহারাই নভেলের বিশেষ উপযোগী। বাহ্য জগতের দ্বারা আকৃষ্ট বা অভিভূত হইলেই হৃদয় বৃত্তি উত্তেজিত হয়। এই আকর্ষণেই বাহ্য জগতের সহিত চরিত্রের ঘাত প্রতিঘাত হয়—এবং এই ঘাত প্রতিঘাত দেখাইয়াই চরিত্রের স্ফূর্ত্তি করা হয়। সুতরাং নভেলের অধিকাংশ চরিত্রই হৃদয় বৃত্তি প্রধান। যে নভেল দেখ, তাহাতে অধিকাংশ চরিত্রই এইরূপ দেখিতে পাইবে। আমরা পূর্ব্বে যে চতুর্থ শ্রেণীর চরিত্রের কথা বলিয়াছি, তাহা সহজেই এইরূপ হৃদয়-প্রধান। অন্যান্য শ্রেণীর চরিত্রেও এইরূপ চরিত্রের চিত্র কিছু অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়।

ইচ্ছা ও কার্য্যকারিণী শক্তি প্রধান চরিত্র একণে সচরাচর নভেলে দেখা যায় না। রোমান্স বা ঐতিহাসিক নভেলে এই শ্রেণীর চরিত্র অধিক দেখিতে পাওয়া যায় বটে। কিন্তু যে সময় হইতে নভেলে তৃতীয় শ্রেণীর চরিত্র চিত্র আরম্ভ হইয়াছে—যে সময় হইতে সংগঠনী শক্তি গুলির স্ফূর্ত্তি করা নভেলের উদ্দেশ্য হইয়া দাড়াইয়াছে, সেই সময় হইতেই এ শ্রেণীর চরিত্র নভেলে অধিক পরিমাণে স্থান পায় না। আমরা এস্থলে রেনল্ড প্রভৃতি নভেল লেখকের কথা ধরিতেছি না; কারণ এ সকল নভেলকে প্রকৃত নভেল বলা যায়, এমন কোন গুণ নাই; তবে ইহাতে এইরূপ চরিত্র চিত্রের অনেকটা চেষ্টা করা হইয়াছে। বঙ্কিম বাবু শৈবলিনীর চরিত্র ব্যতীত এ শ্রেণীর চরিত্র ভাল রূপে স্ফূর্ত্তি করেন নাই।

সে কথা যাউক। এইরূপ চরিত্র ব্যতীত বুদ্ধিবৃত্তি মূলক চরিত্রও কখন কখন নভেলে অঙ্কিত হইয়া থাকে। তবে এইরূপ চরিত্রও নভেলের বেশী উপযোগী নহে। এই স্থলে বলিয়া রাখা উচিত যে, পূর্ব্বে বিলাতে এইরূপ নভেল লেখায় কিছু প্রাদুর্ভাব ছিল। ডিফোর রবিন্সন ক্রুসো প্রভৃতি নভেলগুলি অনেকটা এই শ্রেণীর। একজন লোক অবস্থা বিশেষে পড়িয়া স্বীয় বুদ্ধি বলে যে বিপদে কিরূপ কার্য্য করে, তাহা দেখান কতকটা এই শ্রেণীর নভেলের উদ্দেশ্য। এরূপ নভেলে চরিত্র অপেক্ষা ঘটনার প্রাবল্য আছে সত্য, আবার ঘটনা গুলিও এরূপ যে, তাহা দ্বারা চরিত্রের উপর বড় বেশী ঘাত-প্রতিঘাত হয় না,—নানারূপ (complex) ক্রিয়াও হয় না, তথাপি ইহাতে

চরিত্রের এই বুদ্ধি ও কার্য্য বৃত্তির বিকাশ বেশ দেখান হয়। আজ কাল আর এক জন লেখক এই শ্রেণীর নভেল লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু এগুলিকে বিজ্ঞান বলিব কি নভেল বলিব, সহজে বুঝা যায় না। তবে এ গুলিকে বৈজ্ঞানিক নভেল বলা যাইতে পারে। পণ্ডিত জুল ভার্নের কয়খানি বৈজ্ঞানিক নভেল, রুসোর অনেকটা অনুরূপ; তবে এ স্থলে চরিত্র গুলিতে বৈজ্ঞানিক শিক্ষার সাহায্যেই বুদ্ধি বৃত্তির স্ফূর্তি করা হইয়াছে। আর এক কথা, এ সমস্ত নভেলে নভেলের আকারে বৈজ্ঞানিক সত্য শিক্ষা দেওয়াই প্রধান উদ্দেশ্য, সুতরাং আমরা ইহাদিগকে নভেল মধ্যে ধরিব না। তবে যদি রবিন্সন ক্রুসো বা জুল ভার্নের নভেলগুলিকে একান্তই নভেল বলিতে হয়,তবে বলিয়াছি ত প্রথম গুলিকে বৈষয়িক (practical) আর দ্বিতীয় গুলিকে বৈজ্ঞানিক নভেল বলা উচিত। বাঙ্গালাতে এরূপ নভেল আজিও লিখিত হয় নাই। সুতরাং ইহাদের কথা অধিক বলিবার আবশ্যক নাই।

যে যাহা হউক, এই চরিত্রের বিভিন্নতা জন্য নভেলেরও শ্রেণী বিভাগ হইয়া থাকে। কতকগুলি কার্য্য-প্রধান নভেল—ইহাতেই ইচ্ছা ও কার্য্যকারিণী বৃত্তি প্রধান-চরিত্র প্রধানত অঙ্কিত হয়। কতকগুলি জ্ঞান-প্রধান নভেল, ইহাতেই চরিত্রের বুদ্ধি বৃত্তির বিশেষ স্ফূর্তি করা হয়। আর কতকগুলি চিত্তবৃত্তি প্রধান নভেল—ইহাতে চরিত্রের হৃদয় বৃত্তি গুলি বিশদরূপে পরিস্ফুট করা হয়।

আবার কেহ কেহ চরিত্রকে অন্যরূপ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। এক স্বাভাবিক বা হৃদয় বৃত্তি মূলক চরিত্র, আর এক অস্বাভাবিক বা বুদ্ধি ও কার্য্য মূলক চরিত্র, (natural বা instinctive এবং artificial বা positive)। * তাঁহাদের মতে যে গুলি স্বাভাবিক চরিত্র, তাহারা ঘটনা বিশেষ দ্বারা রীতিমত আকৃষ্ট হইবে—বাহ্য জগতের প্রভাব নিরোধ করিতে পারিবে না। এই সকল চরিত্রই হৃদয়বৃত্তি প্রধান। কেন না, আমরা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বাহ্য জগৎ অনুভব করি, এবং এই অনুভব হইতে নানা কারণে এই সকল অনুভূত বিষয়ের উপর আমাদের মন আকৃষ্ট হয়—না হয় তাহার বিকার উৎপন্ন হয়। এই রূপে মন রঞ্জিত হইলেই, আমাদের হৃদয় বৃত্তি উত্তেজিত হয়; আর এই উত্তেজনার দ্বারা স্বভাবের নিয়ম অনুসারে কার্য্য করিয়া থাকি, এই জন্য, এই সকল স্বাভাবিক চরিত্র হৃদয় বৃত্তি প্রধান ব্যতীত আর কিছুই নহে।

এই রূপে অস্বাভাবিক বা Artificial চরিত্র বলিলে যে উক্ত রূপ স্বাভাবিক উত্তেজনাকে নিবৃত্তি করিতে পারে, তাহাকেই বুঝায়। বলিয়াছি ত এই সকল চরিত্রের নিরোধ শক্তি অত্যন্ত অধিক। মনে কর, পুত্রের প্রতি স্বভাবতই স্নেহ বৃত্তি উত্তেজিত হইয়া থাকে; এখন যদি কেহ এরূপ চরিত্রের থাকে যে, কোন বিশেষ কারণে তাহার এ বৃত্তি উত্তেজিত হইল না, তখন তাহাকে অস্বাভাবিক চরিত্রের লোক বলিব। সাধারণত দেখা যায় যে, এই চরিত্র গুলিই বুদ্ধি বৃত্তি মূলক। কোন্

* পণ্ডিত টেন সাহেব তাঁহার History of English Literature নামক গ্রন্থে এইরূপে চরিত্র বিভাগ করিয়াছেন।

স্থানে কিরূপ কার্য্য করা উচিত বা অনুচিত, ইহা বিবেচনা করিয়া যে কার্য্য করিতে পারে, যে স্বাভাবিক বৃত্তি গুলিকে দমন করিতে পারে,সে চরিত্রে বুদ্ধিই প্রধান, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং এই অস্বাভাবিক চরিত্র বুদ্ধি বৃত্তি মূলক ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই Artificial চরিত্র চিত্রিত করাতে শিল্পের যে কোন রূপ হানি হয়, এরূপ যেন কেহ বিবেচনা না করেন। কারণ যে চরিত্রকে এস্থলে অস্বাভাবিক বলা হইয়াছে, তাহা প্রকৃত অস্বাভাবিক নহে, তাহা প্রকৃত স্বভাবের নিয়মের সম্পূর্ণ অনুযায়ী। সচরাচর আমরা যাহা দেখিতে পাই, এচরিত্র গুলি তাহার কিছু বিপরীত বলিয়া, এ চরিত্র কতকটা অসাধারণ বলিয়া, ইহাদিগকে অস্বাভাবিক চরিত্র বলা হইয়াছে।

সে যাহা হউক, ইহা ব্যতীত চরিত্র গুলিকে আর একরূপে পণ্ডিতেরা বিভাগ করিয়া থাকেন। ইঁহারা বলেন যে, এক-শ্রেণীর চরিত্রের হৃদয় বৃত্তি এতদূর পরিস্ফুট হয় এবং ইহার সহিত তাহার কার্য্যকারিণী শক্তিও এরূপে স্ফূর্ত্তি পায় যে, তাহারা সমাজের বাধা বিঘ্ন কিছুই মানে না, সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া স্বীয় বৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হয়। এ শ্রেণীর চরিত্র কতকটা স্বাধীন প্রবৃত্তি বিশিষ্ট বটে। আবার এদিকে আর এক শ্রেণীর চরিত্র আছে, ইহারা সমাজের দাস—কার্য্যকারিণী শক্তির স্ফূর্ত্তির অভাবে ইহারা বুদ্ধি বৃত্তির প্রভাবে কোন কাজ ভাল বুঝিলেও তাহা করিতে পারেনা। অথবা হৃদয় বৃত্তি উত্তেজিত হইলেও কার্য্যকারিণী বৃত্তির অভাবে তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারে না। সমাজের কঠোর শাসন বলে ইহাদিগকে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং যাহারা সমাজের এই সকল নিয়ম মত কার্য্য করে—স্বাধীন ইচ্ছায় কার্য্য করিতে পারে না, অথবা প্রবৃত্তি হয় না—ইহারা নভেলের উপযোগী উৎকৃষ্ট চরিত্র নহে। তবে সামাজিক নভেলে এরূপ চরিত্র চিত্রের বিশেষ আবশ্যক হয় বটে, তাহা আমরা যথা স্থানে উল্লেখ করিব।

সে যাহা হউক, আমরা অতার বর্ণনা-প্রধান ও চরিত্র প্রধান নভেলের কথা বলিলাম; এক্ষণে সমাজ-প্রধান অথবা সামাজিক নভেলের কথা বলিতেছি। ইহার মধ্যে উদ্দেশ্য মূলক নভেল গুলিই প্রধান। এই উদ্দেশ্য মূলক নভেলের কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সমাজের যাহাতে উন্নতি হয়, তাহাই দেখাইয়া দেওয়া এ সকল নভেলের প্রধান উদ্দেশ্য। সমাজের যে গুলি দোষ তাহা দূর করা,—অথবা সমাজের যাহা আবশ্যক, তাহাই উপযোগী বা দেখাইয়া দেওয়া—এই শ্রেণীর নভেলের প্রধান উদ্দেশ্য। সমাজের দোষ গুলি দেখাইতে হইলে তাহার কুফল এরূপ ভাবে চিত্রিত করিতে হয় যে, সাধারণ পাঠক মাত্রেই তাহার উপকারিতা বুঝিতে পারে। আবার শুধু বুঝিতে পারিলেই হইল না। ইহাদের বিরুদ্ধে পাঠকের মন এরূপ ভাবে উত্তেজিত হওয়া চাই যে, সে দোষ দূর করিবার জন্য তাঁহাদের কার্য্যকারিণী বৃত্তি গুলি বিশেষ রূপে উত্তেজিত হয়। এই রূপ হইলেই উদ্দেশ্য মূলক নভেলের উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইল। ইংরাজীতে Uncle Tom's Cabin নামক নভেল এই শ্রেণীর মধ্যে সর্ব্ব প্রধান। এ নভেল পড়িয়া দাস ব্যব-

সায়ের উপর আমেরিকার 'ইউনাইটেড্ ষ্টেটস্'বাসীদিগের মন এরূপ উত্তেজিত হইয়াছিল যে, তাহারা দাস ব্যবসায় উঠাইয়া দিতে সত্য সত্যই বদ্ধপরিকর হয়—শেষে মহা সমরানল পর্য্যন্ত প্রজ্জলিত হয়; আর সেই সমরের ফলেই তথায় দাস ব্যবসা উঠিয়া যায়। এই রূপেই উদ্দেশ্য মূলক নভেলের সফলতা সম্পাদন হয়। আমাদের দেশে উদ্দেশ্য মূলক নভেল এক খানিও নাই। তবে দীনবন্ধু বাবুর 'নীলদর্পণ' নামক নাটক এই রূপ উদ্দেশ্য মূলক। ইহার সফলতা কতদূর হইয়াছিল, তাহা সকলেই জানেন।

এই রূপে সমাজের যাহা উপকারী, অথচ যহা সমাজে প্রচলিত হয় নাই, তাহার উপকারিতা বুঝাইবার জন্যও অনেক সময় নভেল লিখিত হয়। এ গুলিও উদ্দেশ্যমূলক নভেলের এক অঙ্গ বিশেষ।

এই সকল উদ্দেশ্য মূলক নভেলে চরিত্রের তত অধিক স্ফূর্ত্তি হয় না। আর উদ্দেশ্য-মূলক নভেলে চরিত্র চিত্র করিবারও তত সুবিধা নাই। সমাজ শরীরে চরিত্রকে ডুবাইয়া রাখিতে হয়। সকলেই জানেন, সমাজ শরীরী। ইংরাজীতে ইহাকে Super-organic creation বলে। যেমন একটী একটী পরমাণু লইয়া বৃহৎ পদার্থ উৎপন্ন হয়—যেমন বিন্দু বিন্দু বারি লইয়া সমুদ্র হয়, সেই রূপ একটী একটী মনুষ্য একত্র করিয়াই সমাজ সৃষ্টি হয়। আবার সমাজে মানুষের স্বতন্ত্র সত্তা, তাহার স্বাধীনতা ডুবিয়া থাকে, নতুবা সমাজ সংঘটিত হইতে পারে না। যেমন বহু সংখ্যক ইট, কাট, চুণ, সুরকি প্রভৃতি লইয়া একটা বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মিত হয়, সে অট্টালিকার গঠন, তাহার সৌন্দর্য্য, তাহার বাসোপযোগীতা প্রভৃতি দেখিতে গেলে এক এক খানি ইট বা কাষ্ঠ দেখা সম্ভব হয় না;—সেইরূপ সমাজ চিত্র করিতে গেলে যে এক একটী মানুষ লইয়া সমাজ হয়, তাহা চিত্র করা হয় না। এই জন্য সামাজিক নভেলে চরিত্র চিত্রের তত সুবিধা নাই। বরং উভয় কার্য্য পরস্পর এক রূপ বিরোধী। আবার সমাজ চিত্রিত করিতে হইলে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার বিষয় উল্লেখ করা হয় না—আবার স্বাধীন মানুষ চিত্রিত করিতে হইলে সমাজে তাহার যে অধীনতা, তাহাও চিত্র করা হয় না। সকলেই জানেন, স্বাধীনতাতেই মানুষের স্বাতন্ত্র্য, আর অধীনতাতেই—মানুষের স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়াই সমাজ সৃষ্টি। দেখ, সমাজের রীতি, নীতি, অবস্থা বা কার্য্য প্রণালী চিত্রিত করিতে যদি তুমি কেবল ব্যক্তি বিশেষের যাহা বিশেষ গুণ—অথবা তাহার বিশেষ কার্য্য চিত্রিত করিতে যাও, তবে সমাজের চিত্র করা হইল কই? সমাজের রীতি নীতি, কার্য্য প্রণালী ত সাধারণ রীতি নীতি ও কার্য্য প্রণালী—তাহা সুধু মানুষ বিশেষে নহে, সাধারণে তাহা দেখিতে পাইবে। কিন্তু কোন বিশেষ চরিত্রের বিশেষ অবস্থা, নীতি ও কার্য্য প্রণালী কিছু সমাজের সাধারণ বিষয় হইতে পারে না। আর তাহা হইলেও সে চরিত্রের বিশেষত্ব রহিল কোথায়? এই জন্য সামাজিক বা উদ্দেশ্যমূলক নভেলে চরিত্রস্ফূর্ত্তির বিশেষ সম্ভাবনা নাই।

ক্রমশঃ—

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

স্থানাভাব প্রযুক্ত এবারও পুস্তকাদির সমালোচনা গেলনা, গ্রন্থকারগণ ক্ষমা করিবেন।